MEMOIRS OF JADAVPUR UNIVERSITY

মনের জানালা খুলে,
লেখনীতে ইঞ্জিনীয়ারিং এর প্রাক্তনীরা

আমার মনের কথা
দীপক সেনগুপ্ত

মনের জানলা খুলে এই যে স্মৃতির ইমারত, ইতিমধ্যেই এটি দেশে বিদেশে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। তাই ভরসা করতে ভাল লাগছে, এই ইমারতের মূল এক শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে।

বন্ধু সুব্রত, তপন (গুপ্ত) এবং আরও অনেকের পরামর্শে এই ইমারতটিকে আরেকটু ঔজ্জ্বল্যে ভরিয়ে দিতে এর ভেতরের রচনাগুলির বিন্যাসকে আরেকটু বিষয়ভিত্তিক করার প্রয়াস। উদাহরণ দেবার লোভ সম্বরণ করা গেল না, তাই এই ইমারতের ভেতরে উঁকি দেবার জন্য জানলা খুলেই দিলাম, তোমরা ক্রমানুযায়ী দেখবে

১. মুখবন্ধ
২. প্রসঙ্গে এই সংকলন -- আমার কথা
৩. স্মরণে যাদবপুর - অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
৪. উৎস সন্ধানে যাদবপুর
৫. সমকালে এবং বন্ধুরা
৬. প্রসঙ্গ ডাঃ ত্রিগুণা সেন
  ৬.১ শুরুর কথা
  ৬.২ কিছু অজানা কথা
  ৬.৩ গুরু বন্দনা
  ৬.৪ প্রশাসক ডাঃ ত্রিগুণা সেন
৭. প্রিয় স্যারেরা
  ৭.১ Remembering our dear Prof. from Chem Engg.
  ৭.২ Remembering our dear Prof. from Mech Engg.
  ৭.৩ Remembering our dear Prof. from Elec. Engg.
  ৭.৪ Remembering our dear Prof. from Civil Engg.
  ৭.৫ Remembering our dear Prof. from TeleCom. Engg.
  ৭.৬ Remembering our dear Prof. from CAS
৮. প্রাক্তন অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসকের দৃষ্টিতে যাদবপুর
৯. আমাদের কিছু মিষ্টি-দুষ্টু স্মৃতি
১০. আমাদের হষ্টেল-স্মৃতি -- কিছু দুষ্ট-মিষ্টি কথা
১১. যাদবপুর স্মৃতি –- ডে-স্কলার
১২. যাদবপুরের আরও গল্প
১৩. Memoir (যে পথে নিলে বিদায়)
১৪. Genesis of Blood Donation
১৫. QUIZ CORNER
১৬. প্রসঙ্গ ছাত্র ইউনিয়ান -- আমাদের সমকালের
১৭. From the pen of our Junior Batch
১৮. Conversation Street

বিঃ দ্রঃ : এই সংকলটির রূপায়নে, সম্পাদনায় আর আঙ্গিক- বিন্যাসে -- আমি দীপক। সংকলনটি যদি সবাইকে খুশী করে, তবে সে খুশির ভাগ সবার আর ত্রুটি যদি কিছু থাকে, তার তিরস্কার শুধু আমার একার।

লেখনীতে

সিদ্ধার্থ দত্ত	*প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রাক্তন সহ-উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়*	5, 21, 64, 65, 67, 70, 74, 136
দীপক সেনগুপ্ত	*'৬৩ মেকানিকাল*	6, 14, 27, 31, 35, 43, 50, 57, 60, 62, 71, 72, 77, 80, 108, 120, 124, 127, 130, 132, 136, 139, 143, 190
দেবদাস ঘোষাল	*'৬৫ ইলেট্রিকাল*	11, 135
অঞ্জন বসু	*'৭০ কেমিকাল*	17
শিবশঙ্কর ঘোষ	*'৬৩ মেকানিকাল*	19, 23, 118, 135, 139, 140, 145, 148
প্রফুল্ল রায়	*'৬৩ মেকানিকাল*	27, 73, 121
আশিস দাশ শর্মা	*'৬৩ টেলি কম্যুনিকেশন*	57, 58, 70, 73, 74, 93, 131, 134
দীপেন্দু রাহা	*'৬৩ মেকানিকাল*	71
অলক গাঙ্গুলী	*'৬৩ মেকানিকাল*	42, 48, 75
মানস ব্যানার্জী	*'৬৩ সিভিল*	49, 57, 58, 60, 134
সৌরভ বাসু	*'৬৩ ইলেক্ট্রিকাল*	83, 84
বিশ্বজিত দাস	*'৬৩ সিভিল*	119, 134, 143
কল্যান কুমার দাস	*'৬৩ কেমিকাল*	40, 134, 143

ঁঅরুণাভ চ্যাটার্জী	*'৬৩ ইলেক্ট্রিকাল*	85
ঁসব্যসাচী বাগচি	*'৬৩ সিভিল*	105
ঁঅলক চক্রবর্তী	*'৬৩ কেমিকাল*	33
জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী	*'৬৩ টেলি কম্যুনিকেশন*	131
প্রসুন কুমার দে	*'৬৩ ইলেক্ট্রিকাল*	16, 131, 135
অপূর্ব মুখার্জী	*'৬৩ মেকানিকাল*	132
শঙ্করনাথ চ্যাটার্জী	*'৬৩ কেমিকাল*	74
ডাঃ শ্রীমতী মুক্তি চৌধুরী	*অধ্যাপিকা গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়*	28
তপন গুপ্ত	*'৬৩ মেকানিকাল*	122, 123, 135, 144
সুব্রত দেব	*'৬৩ ইলেক্ট্রিকাল*	102, 134
প্রণব মুখার্জী	*'৬৩ কেমিকাল*	125, 134
সঞ্জীব বাসু	*'৬৩ ইলেক্ট্রিকাল*	135
বরুণ কুমার দে	*'৬৩ ইলেক্ট্রিকাল*	53

অমিত বাসু	*'৬৩ মেকানিকাল*	136
উৎপল সেনগুপ্ত	*'৬৩ ইলেক্ট্রিকাল*	136
সুজিত সেন	*'৬৩ ইলেক্ট্রিকাল*	136
শঙ্কর চক্রবর্তী	*'৬৩ মেকানিকাল*	124, 136
সুজন দাশগুপ্ত	*'৬৫ মেকানিকাল*	125
শেখর বসু	*'৭১ মেকানিকাল*	54
ডাঃ ইন্দ্রজিত চৌধুরী	*'৮১ সিভিল*	159, 168, 170
অনুপ চৌধুরী	*'৭৫ কেমিকাল*	177
শিবানী দাস	*'৬৩ টেলি কম্যুনিকেশন*	75, 129
দেবব্রত রায়	*'৬৩ মেকানিকাল*	156
বীরেশ বিশ্বাস	*'৭৩ ফার্মেসি*	186, 187
এবং		
দীপ্তার্ক দাশ শর্মা	*(পুত্র, আশিস দাশ শর্মা)*	190

মুখবন্ধ

সিদ্ধার্থ দত্ত

প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রাক্তন সহ উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুরের স্মৃতিকথা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিকথার ভান্ডার যে বিশাল, একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এতো এক বিরাট পরিবার। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমন্ধে জানার আগ্রহ থাকাটা ও স্বাভাবিক। চাহিদা কিন্তু ঊর্ধ্বগামী। কারণ পঠন পাঠন হোক বা গবেষণার বিষয়বস্তুর আকর্ষণ হোক কিংবা অন্য আর যে কোন সামাজিক ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ, সব ব্যাপারেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে সামনের সারিতে। প্রতিটি কাজের মধ্যেই পাওয়া যাবে ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার ছাপ। এজন্যই মনে হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বর্তমান ও প্রাক্তন অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী, গবেষক, আধিকারিক এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধু সবাই ভীষণ গর্বিত। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন দুটি ক্যাম্পাস।

কি নেই সেখানে গুরুগম্ভীর ক্লাস, গবেষণাগারের আধুনিক বিষয়ের উপর বিশ্লেষনধর্মী আলোচনা, বিরাট মাঠে সব ধরণের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্যান্টিন ও উত্তাল রাজনীতির বহমান ঢেউ। এমনই আরও কত কি। উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা থাকা তো স্বাভাবিক। আগেও ছিল, এখনও আছে তাই। কি করে ভোলা যায় কত ক্লাব ও তাদের সৃষ্টিধর্মী কাজের কথা। ঝিল পারের হাতছানি তাতো আজও অনেক প্রাক্তনীর হৃদয়কে স্পর্শ করে। ফ্লাইহুইলের ঘুরন্ত স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলা সত্যিই কষ্টকর। স্মৃতি সবসময় বন্ধুর মতো আচরণ করে না। আবার স্মৃতি সততই সুখেরও হয় না। দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারলেই সেটা হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত মূল্যায়ন । বিভিন্ন সময়ের ঘটে যাওয়া কর্মকান্ড নিয়েই তো তৈরি হয় ইতিহাসের উপাদান।

বিভিন্ন সময়ের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী নিয়েই পথচলা শুরু করলো যাদবপুরের স্মৃতিকথা।
উদ্যোগে অবশ্যই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ১৯৬৩-৬৪ র প্রাক্তনীর দল। সংগে আছি আমরা। উদ্দেশ্য অবশ্যই বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাসকে স্মৃতিকথায় বেঁধে রাখা। আপনার ও আসুন। এতো সবে শুরু, কোথায় গিয়ে শেষ হবে আমরা কেউই জানিনা। ভবিষ্যতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনায় এই স্মৃতিকথা সামান্য হলেও অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আবেগ ও উন্মাদনার মাঝে সেটাই হবে উপরি পাওনা।

প্রসঙ্গে এই সংকলন -- আমার কথা
দীপক সেনগুপ্ত

বন্ধু প্রফুল্ল (রায়, মেক্যানীকাল) বল্ল, যাদবপুরের অসংখ্য স্মৃতির অল্প সল্প যদি কিছু কথায় ধরে রাখা যায়! শুরু হ'লো লেখা লেখি। সবই whatsapp এর মাধ্যমে। মূলত লেখার আদান-প্রদান চ'ল্ল আমাদের এই যে ১৯৬৩/৬৪ ব্যাচের যাদব-প্রাক্তনীদের যে ৪৭ জনের group আছে, তাদের মধ্যে। আমরা প্রযুক্তিবিদ, আমাদের কলমের ডগায় সাহিত্য আসে না। বুঝলাম মনের মধ্যে স্মৃতির খোঁজ পাওয়া যতটা সহজ, ততটাই দুরূহ স্মৃতিগুলোকে লেখার ভাষায় রূপ দেওয়া। কিন্তু উৎসাহ আমাদের এই পেশাগত সীমাবদ্ধতাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চল্ল। ভাবনায় এল এই স্মৃতিকথাগুলোকে যদি দুটি মলাটের ভেতর সংরক্ষিত করা যায়!

গ্রন্থায়ন-শুরুর পর বুঝলাম, কাজটি দুরূহ। আমার অযোগ্যতাই বোধহয় সংকলনটির গ্রহনযোগ্যতা-ভাগ্যে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিল!

তবে উৎসাহ পেলাম অনুজপ্রতীম সিদ্ধার্থর কাছ থেকে। শুধু নিজের লেখা দিয়েই নয়, সিদ্ধার্থ অগ্রজ-অনুজ নির্ব্বিশেষে, নিজের পরিচিত যাদবগোষ্ঠিতে উৎসাহ ছড়িয়ে দিয়ে তাদের অনেকের স্মৃতির মালার লেখনী দিয়ে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। সিদ্ধার্থ নিজে যাদবপুরের প্রাক্তনী, প্রাক্তন অধ্যাপক এবং প্রাক্তন সহ উপাচার্য্য। ওঁর কথায় বলি, "আসলে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যতভাবে যুক্ত থাকা যায়, সেটাই ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে ঐ যাদবপুরএ। ছাত্র হিসাবে শুরু, তারপর একে একে গবেষক, অধ্যাপক এবং শেষে প্রশাসক। তাই অনেক সময়েই বন্ধুমহলে ঠাট্টা হয় :

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, সিদ্ধার্থ যাদবপুরে।"

না, সিদ্ধার্থ, একটু ভুল বল্লে, শুধু তুমি নও, যাদবপুরের সব প্রাক্তনীরাই যাদবপুরে সুন্দর।

মনে দুরাশা, মূলত আমাদের এই হোয়াটসয়াপ-গোষ্ঠীর লেখার সাথে সিদ্ধার্থের নিজের এবং কিছু অনুজ যাদব-প্রাক্তনীবৃন্দের যাদব-স্মৃতি দিয়ে গাঁথা এই সংকলনখানি, যাদবপুর-প্রাক্তনীদের কাছে যদি সমাদৃত হয়! ভাষায় সাহিত্যের কৌলিন্য নেই, প্রকাশে আছে অন্তরের প্রতিফলন। এই সংকলনে '১৯৫৯-৬৩/৬৪' র যাদবপুরেরই নিশ্বাস রয়েছে, আর আছে সৌভ্রাতৃত্বের গন্ধ।

দুঃখ, ভুল রয়ে গেল প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে বেশ কিছু বানানে, বিশেষত যুক্ত অক্ষরে। আমি বার বার ঠিক করা দেওয়া সত্বেও, কম্পিউটর-যন্ত্র কিছু কিছু বাংলা যুক্তাক্ষর, নিজের মত করে লিখেছে। এই ভুলগুলির জন্য আমারই সীমাবদ্ধতা দায়ী।

স্মরণে যাদবপুর - অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

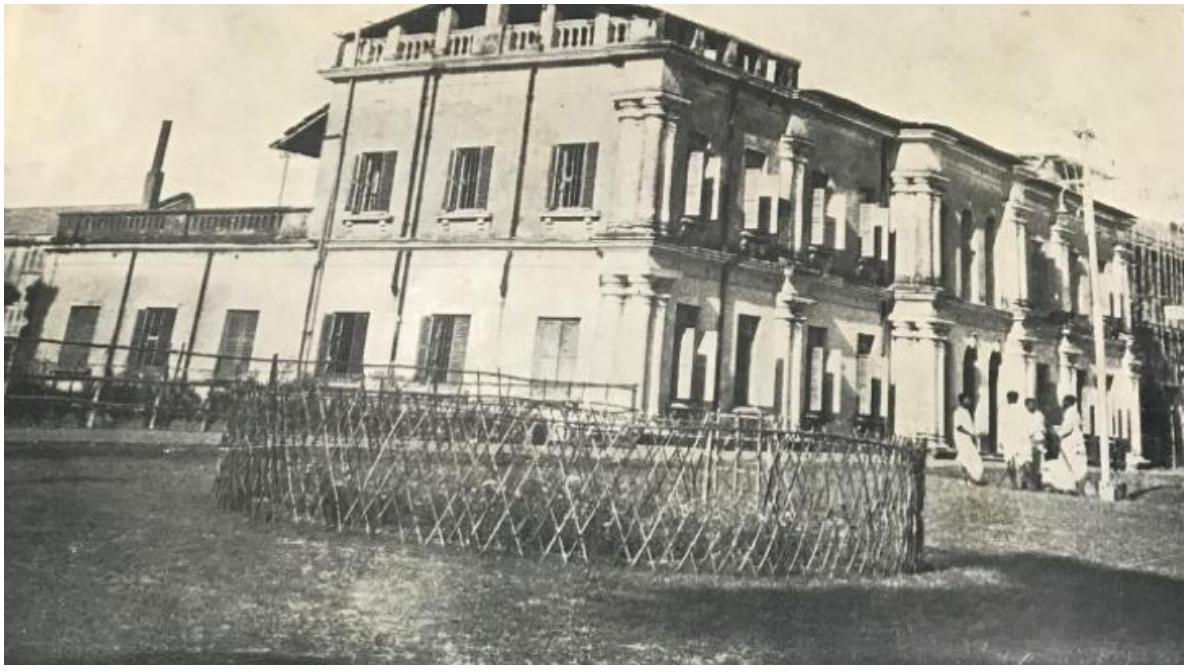

A page from TECH

It was nineteen forty-three when some students felt their hearts vacant while leaving this shrine, this college. They desired to embrace the sweet memories of this few year's stay lifelong in their minds. So a child was born—this booklet. Those invaluable pages bore the imprints of their activities. Turning over the pages after a leng long period they would touch the lights and shades of their college-life.

The same sentiment urged us to publish this issue. At the twilight of our life, 'oft in the stilly night, ere slumber's chain will bind us,' we will ruminate 'the smiles, the tears of boyhood years,' the words of love then spoken.

A page from TECH of 1946

Some came with half-life wear
Some came with 'school-girl cheer,
Some came without sweet-hearts care,
When all we joined the First Year.

With future bright and honours right
Some loved Chemicals at first sight
Others to decide two years late
Elec, or Mech. ? which to take.

For two years we had to study hard
And to keep us always in guard, ---
Hammer and Anvil with Parker Smith
May not pound our brains to bits.

Ag.s, J. T. S. and Surveys not to be seen yet
As on 3 years study Certificate would they get.

To Chems.-the Royal line we call
Though class too small to hold us all;
We did enjoy
Dr. H. L. Roy
As he made the classes 'at-home party'
And taught his lessons with all sincerity.

Then we remember with so much delight
Our classes flashing ont like Neon-Light.
With Guho Saheb in chair -
To rise up - who would dare ?

So for days together we have to run, race riot and roam ---
What are you doing ? BHAI fighting Parker Smith's Gnome !

Then we had so many of Mechanical men
Though strong and stout, but living in a den ;
For Dr. S. C. B. was a man
Who would do whatever one can.
So big and vast was our Fear and Respect
And we had to bend -- as he would us expect

উৎস সন্ধানে যাদবপুর

Jadavpur University
Debdas Ghosal

The Lamp In The Lotus

Time and again we have seen in the human history that great ideas, great institutions, and even great revolutions take place with the collective thoughts and efforts from the leaders of the then societies to pursue a common purpose.

Bengal Renaissance is such a phenomenon that came to a pinnacle at the turn of the 19th Century
during the partition of Bengal by Lord Curzon. The British in Calcutta tried to spread western educational thoughts among the elite in India by creating in the words of Lord Macaulay,
"a class of Indians who would be Indian in blood and colour but western in thought and ideas".

While the Nationalists enthusiastically chose the alternative system of education for the middle class of Bengal, they ridiculed the British Education system as "Goldighir Ghulamkhana" or the slave house of Goldighi, with reference to the lake adjacent to Calcutta University. Fortunately, large numbers of luminaries of that period assembled in Calcutta and about 1500 delegates including Rabindranath Tagore, Aurobindo Ghosh, Raja Subodh Chandra Mullick and Brajendra Kishore Roychowdhury and the idea of the National Council of education was mooted in November 19, 1905. The institute was created and Rash Behari Ghosh was appointed as the first president of the institute. Later on in July 25, 1906, the Bengal Technical Institute was created under the stewardship of Taraknath Palit. Even though the partition of Bengal was the trigger point, there was a pent up need to unleash the cultural and entrepreneurial spirit existed from the beginning of Renaissance of Bengal, Hardly any University of India had the fortune to be blessed by active participation of so many luminaries immediately after the Independence of India after 1947 when the National Council of Education was elevated to the status of the University in 1955 under the leadership of Dr. T. Sen. This is a short prelude for the University but it's unique result of fulfillment of efforts by the multitudes of great minds and the historic thrust continues to propel this National Institute to a present-day top tier position.

Former names	Bengal Technical Institute (The National Council of Education, Bengal) (1906–1955) Jadavpur University (merger in 1955–present)

Our emblem correctly portrays our ideas, mission, and vision by three flamed lamps encircled by lotus petals one hand symbolizing our training, cultivation of imagination, and spiritual

development. Often time, we pride ourselves that we are not materialistically as smart as our counterparts from known institutes but we are unique in our soft approach and refined executions. I had the fortune to work with our Chancellor Dr. T. Sen during my final years as the President of the Border' Union. He used to quip that our alumni association is not brittle. We are like aluminum strands, we bend but we don't break. His word stuck in my mind all along. In the early 70's a large number of our alumni emmigrated like Indians from many different states to USA. We crossed the Seven Seas somewhat with anxiety for unknown and unsure for the future and with excitement for the new continent. It was like migrating to Jhumpa Lahiri's "the third and the final continent". Most of us entered this country through NY and dispersed throughout North East States. A significant number finally migrated to the Washington, D.C. area and settled at the North and South side of the Potomac River. Many of us had family and some of us were single and we use to meet during Durga Puja and Saraswati Puja with the intense desire to discover somebody connected to Jadavpur University. We found a good number of us from Jadavpur University and we naturally felt attracted due to our common bond and culture that we shared while in our Alma mater.

In the summer of 1985, we formed the Jadavpur Alumni Association in the presence of Dr. Sushil Das Gupta. This function was full of spontaneity and exuberance we felt that we created a large family of our own away from our home. Our Alumni started taking leading roles in cultural and social activities, at the same time maintaining an amicable relationship with other Indian immigrants and ethnic societies in this continent.

Each year Jadavpur University Alumni Association is celebrating two functions: a summer picnic and Bijoya Sammellan and at times we came up with a newsletter highlighting local and home campus news. Like any organization, Jadavpur University Alumni Association has gone through some ups and
downs due to leadership changes, meanwhile we celebrated Platinum Jubilee of our university

Many of our alumni have become cultural entrepreneurs and gave excellent leadership in Banga Sammelan in major cities on the East Coast.

The lamps in the lotus, glow with eternal purity in the core of petals and it will have some flickers as we face some bumps along the way but will never extinguish. We need to encourage our young alumni to join and share our vision and aspiration on how we can build a family of many with attitude to help each other especially at the context of our aging, I'm very sure most of us have overcome the basic need of life through grace of God due to education that we received from our Alma mater.

Hope we can return a part of the bounty back to our home campus and a part to our aging alumni in the spirit of 3 flamed lamps in the lotus petals.

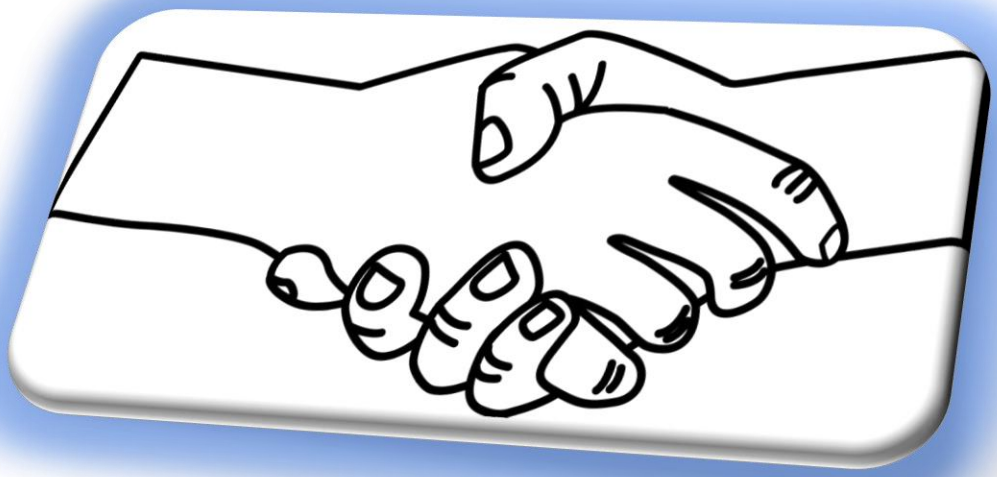

সমকালে এবং বন্ধুরা

স্মৃতির ইমারত
দীপক সেনগুপ্ত

স্মৃতির ইমারত - স্মৃতি দিয়ে গড়া,
তার কিছু সুখের, কিছু মনে দেয় পীড়া ।
এমন অনেক স্মৃতি হয়
যে স্মৃতি শুধুই সুখের নয়,
স্মৃতি ধরে মারো টান,
লেখা হোক অফুরাণ।

তখন আমাদের সময়টা
আমাদের কৈশোরের শেষটা,
কত স্বপ্ন, জেদ -- করব সত্যি
সে ছিল '৫৯ থেকে '৬৩-৬৪,
হ্যাঁ, সে দশক ছিল শত্তর
গমগম ছিল যাদবপুর চত্বর ।

একটাই পরিচয় -
ক্লাশ আর সত্যেনদা-ক্যান্টিনময়,
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র,
পড়া আর আনন্দ - একমাত্র ।

নতুন নতুন বন্ধুর সাথে
হ'ল পরিচয়,
একের সাথে অনেক মিলে
সব অভিন্ন হৃদয় ।

স্যারেদের লেকচার -
সাথে ক্লাশকাটা আকছার।
সেশনালের ঠ্যালাতে
মাদারের খোঁজেতে
টেবিলটেনিস আর ফুটবল ক্রিকেটে,
কিংবা ডিবেটের সভাতে
যৌবনের ছোঁয়াতে
উইন্ডমিলের হাওয়াতে
সে সব যায় না গো ভোলা
মনে সব দিয়ে যায় দোলা ।

দেখতে দেখতে সময়টা
কেমন করে গেল চলে!

ডিগ্রী শেষ করে -
চলে গেল যে যার গন্তব্য স্থলে ।

দূরে দূরে সব অবস্থান,
হারিয়ে গেল যোগাযোগ -
তৈরী হ'ল ব্যবধান ।

আজ আমরা অবসরে,
কেউ কাছে কেউ দূরে ।
স্মৃতি ক'রে রোমন্হন,
সবাই আমরা আপনজন ।

সবার কথা মনে আসে,
মনটা যেন শূন্যে ভাসে ।
চলে গেছে বেশ কয়েকজন,
হবে না কখনও সে শূন্য পূরণ ।

তপন, প্রভাত, অরুণাভ -
ব্যাথা দিতে মনে ভাসে অহরহ,
বিশু, প্রিয়, চন্দন
রঞ্জন দুজন আর নন্দন,
সব শেষে প্রশান্ত আর অলক।
প্রিয় বন্ধুরা কালের কপোলতলে,
কষ্ট হয় তাদের স্মৃতি মনে হ'লে ।

মনে আসে সবটাই,
প্রার্থনা একটাই -
যারা আমরা এখনও আছি,
যেন থাকি কাছাকাছি,
তাঁর আশীর্ব্বাদে সুস্হ,
কথা-হাসি-গান এ নিয়েই ব্যস্ত ।

স্মৃতির ইমারতে আমাদের বন্ধুরা

প্রসুন দে

স্মৃতি খুব সুখে র আবার দঃখেরও বটে।
এই স্মৃতি নিয়ে মোরা আছি সকলে।
কোথা মোর বন্ধুরা আশিস (বোস), পল্লব
অনুপম, অচিন্ত -- কোথা গেল সব?
মনে পরে বিজন আর মনোরঞ্জন,
দাশগুপ্ত রঞ্জন আর দরকার রঞ্জন!
ভুলি নাই সুবিমল, বিজন - তোমাদের,
বিজন আর গৌতম ঝা, বন্ধুরা আমাদের।
পরে প্রভাত, ইন্দ্রনীল!
বহু যুগ হয়ে গেল রাম মুখার্জির।
কোথা গেল প্রিয়ব্রত আর দীপক ঘোষ ভাই!
হারাধন চলে গেছে, কোন খবর নাই।
অরুণাভ চলে গেল -- আলো আর নাই।
যত ভাবি যারা সব ছেড়ে গেছে চলে
এটাই জগতের নিয়ম, সান্ত্বনা পাই মনে।

এরা সব ইলেকট্রিকাল, স্মরণে আছে প্রয়াত বন্ধুরা, অন্য ডিসিপ্লিনের,
মন ভাল নাই, লেখনি চলেনা তাই,
আমরা এখনও আছি, এ গল্প শুধুই যে যাদবপুর ''৫৯-'৬৩/৬৪ বাচের।

যাদবপুরের ক্যানভাসে

অঞ্জন বসু

তোমার বৃষ্টি ভেজা আঁচল
তোমার চোখ ভরা কাজল
সে তো আমার কল্পনা
সে তো আমার সৃষ্টি।

আকাশেতে শুকতারা
আমি কেন দিশাহারা
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি
যাদবপুরের ঝিলপাড়ে
কিছু প্রেম গড়াগড়ি যায়
নিস্তব্ধ অতীত কবিতায়

কতোদিন খুঁজেছি তোমায়
যাদবপুরের পুরোণো
কফি হাউসের নীচে
কাশীদার কবিতার বুক স্টলে
'দেয়ালা' আর 'নহবৎ'-এর ভীড়ে
এইট্ বি বাস স্ট্যাণ্ডে
হিন্দুস্তান সুইটসের পাশে
স্বপ্নময় ফুলের দোকানে

আজও আমি দাঁড়িয়ে থাকি
একা স্থবির....
পেয়ালাতে ডবল হাফ চা
নিয়ে ভেজিটেবল চপের
গন্ধে সত্যেনদার ক্যান্টিনে
পুরোনো বন্ধুদের অপেক্ষায়..

হারিয়ে যাওয়া জীবনের কাছে
একবার নতজানু হয়ে
সূর্যাস্তের মুখোমুখি
একটু সোহাগি ফাউ চাইতে।

প্রসঙ্গ ডাঃ ত্রিগুণা সেন

শুরুর কথা
শিবশঙ্কর ঘোষ

জানা যায় অষ্টমগর্ভের সন্তানরা নাকি অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কথা আমরা জানতে পারি শুধুমাত্র বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে শ্রী গোলকনাথ সেন ও সুশীলা সুন্দরী দেবীর অষ্টম তথা সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ডাঃ ত্রিগুণা সেন (জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৫, মৃত্যু ১১ জানুয়ারি ১৯৯৮) মহাশয়কে দেখার বা তার সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য এমন অনেকেরই হয়েছে, যাঁরা আজও জীবিত আছেন। ত্রিগুণা সেন মানেই চ্যালেঞ্জ। বিত্তশালী পরিবারে জন্ম হলেও তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন স্বচ্ছলতার প্রভাব থেকে দূরে থাকতে। মনেপ্রাণে ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। স্কুলে পড়ার সময়েই সংকল্প নেন দেশ-মাতৃকার শৃঙখল মোচনের জন্য সারাজীবন কাজ করে যাবেন। ১৯২১ সালে শিলচর সরকারী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে একরকম অজ্ঞাতবাসে চলে আসেন কলকাতায় এবং বাসা বাঁধেন একটি অখ্যাত মেসে। নিজের ভাগ্নেকে খুঁজে বার করতে ওই সময়ের নামকরা I.C.S মামা শ্রী গুরুসদয় দত্তকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত জেদী ছেলেটি কোনওরকম সাহায্য নিতে রাজী হয় নি। বয়োঃজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি প্রতিষ্ঠিত শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বদলে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গলের 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট'এ ভর্তি হলেন। আসলে যাদবপুরে ইনস্টিটিউটের এই হোষ্টেলে বেশ কিছু দেশভক্ত ছেলেরা থাকতো, যেটা ওনাকে আকৃষ্ট করে। পরবর্তী কালে এদের অনেককেই আন্দামানে বন্দী থাকতে হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারি, গোপীনাথ (মোহন) সাহা একটা রিভলবার নিয়ে এই হোষ্টেল থেকেই বার হয়ে পার্কস্ট্রিট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে যান টেগার্ট সাহেবকে মারতে।

১৯২৬ সালে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন। ১৯২৯ সালে বিনয়কুমার সরকারের উৎসাহে যখন জার্মানি যান ডক্টরেট করার জন্য তখন তিনি যাদবপুরের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে কাজ করছেন। জার্মানি গেলেন ডক্টরেট করতে, কিন্তু চুপচাপ থাকতে পারলেন না, ইউনিয়ন করা শুরু করলেন—ছাত্রেদের নেতা হলেন। সেখান থেকে ভারতে বিপ্লবীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে লাগালেন। পরবর্তিকালে এইরকম বেশ কিছু বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। যেমন, যাদুগোপাল মুখার্জী, অতুলকৃষ্ণ ও অমরকৃষ্ণ ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, হরিকুমার চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, মতিলাল রায়, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, বীণা দাশ, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি।

১৯৩২ সালে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। পরীক্ষার ঠিক আগে একটি ফর্ম-এ ছাত্রদের কাছে Nationality জানতে চাওয়া হয়েছিল। ভারতীয় ছাত্রদের লিখতে হ'ত 'British Indian Subject'. কিন্তু উনি বলেছিলেন, "No, I am an Indian, plain & simple. Neither more nor less'. ভারতীয় সহপাঠীরা বুঝিয়েছিলেন যে শুধু এই কারণেই হয়তো বা ডিগ্রীটা আটকে যেতে পারে, কিন্তু অনড় ত্রিগুণা সেন মোটেও বিচলিত হননি।

ডাঃ সেন ডিগ্রী নিয়ে ভারতে ফিরলেন ১৯৩৩ সালে। কিন্তু জার্মানীতে পড়ার সময় বিপ্লবী কার্য্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তখনকার ব্রিটিশ সবকার তাঁর ওপর কড়া নজর রেখেছিল, এমনকি একসময় বন্দীও করে রাখে। ছাড়া পাবার পর বাংলায় ঢুকতে নিষেধ করে দেওয়া হল। এই সময় দক্ষিণ ভারতের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পেয়ে,সেখানে যোগ দিতে যাবার সময়, শুধুমাত্র বিমান বদল করার জন্য বাংলায় ঢোকার অনুমতি চাইলে তাঁকে বলা হলো :

"No, you are not allowed to pass through Bengal". এরপর আসামে থাকাকালীন তিনি ইনসিওরেন্স এজেন্সির এজেন্টের কাজ করেছেন, ট্যাক্সি চালিয়েছেন, নলকুপ তৈরি করেছেন, ডিব্রুগড় ওয়াটার ওয়ার্কস-এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

অবশেষে ১৯৪৩ সালে ডঃ সেনের ওপর থেকে বাংলায় প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফেসর বিনয়কুমার সরকারের আগ্রহে, চ্যালেঞ্জ প্রিয় মানুষটি Special Administrative Officer হ'য়ে

যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগদান করেন। সারা বাংলায় তখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের হাহাকার, কলেজের অবস্থা খুবই করুণ, পাওনাদারদের আনাগোনা ছিল নিয়মিতভাবে। ১৯৪৩ সালের এই অবস্থা থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত Bengal Technical Institute বা পরবর্তীকালের College of Engineering and Technology কে 'ইউনিভার্সিটি স্ট্যাটাস' এ আনতে
গিয়ে স্যার বেশ কিছু দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন যা অনেক সময় নিয়ম মেনে হয়নি। ইউনিভার্সিটির আইন সভার অনুমোদন ছাড়াই ডাঃ সেন ১৯৪৪ সাল থেকেই ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। Convocation করা হলো দীক্ষান্ত-ভাষণ দিয়ে গেলেন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী প্রফেসর সত্যেন বসু। সঙ্গে ছিলেন প্রেসিডেন্ট রূপে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে তিনি আরও একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করলেন। Convocation হলো দুবার প্রথমবাব ভাষণ দিয়ে গেলেন ডাঃ জন মাথাই, আর দ্বিতীয়বার এলেন পণ্ডিত নেহেক। সদ্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়া, সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু যখন convocation-এ এলেন, তখন আর ডিগ্রী দেওয়া বে-আইনী কে বলবে? একজন শুভানুধ্যায়ী এসব দেখে বল্লেন, 'Dr. Sen, you will be sued, মতো মাকে একদিন জেলে ধরে নিয়ে যাবে।' উত্তরে ডা সেন হেসে বললেন, 'Sir, I do not care anything, I care for my students only.' অনেকদিন পর, অত্যন্ত প্রিয় এক সহকর্মীকের (অরুণ কুমার গুপ্তকে) একদিন একা পেয়ে বলেছিলেন, আমি অনেক সময় নিয়ম মেনে কাজ করিনি। তার জন্য তোমরা আমায় দোষ দিতে পার। কিন্তু সব কাজ নিয়ম মেনে করতে গেলে যে শেষ করতে পারতাম না! করে ফেলেছি, দেখ আজ তত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যাদের জন্য করেছি, আজকে তারা কত বড় হয়েছে। ওদের দেখলে বুক ভরে উঠে। তিনি জানতেন ঠিক কতদূর পর্যন্ত নিয়ম মানা যায়। ১৯৬৬ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ডাঃ ত্রিগুণা সেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়া কাটিয়ে ডাঃ সেন তখন মাত্র দু-মাস অবসর জীবনযাপন করছেন, ঠিক সেই সময় বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির অগ্নিগর্ভ পরিবেশ আয়ত্ত্বে আনতে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ একদিন স্যারকে বললেন, "ডাঃ **সেন, তোমার মত দক্ষ ও বিচক্ষণ** ব্যাক্তি দেশে থাকতে ঐতিহ্যশালী এই বিশ্ববিদ্যালয় কি বন্ধ করে দিতে হবে? তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ না, যদি এটাকে **বাঁচানো যায়**!" রাষ্ট্রপতির অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে ডাঃ সেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব নিতে পৌঁছে গেলেন বারাণসীতে। নতুন কর্মভার বুঝে নিয়ে, নিজের উদ্ভাবনীশক্তি প্রয়োগে করে, প্রতিভাবান যাদবপুরের এই প্রাক্তন উপাচার্য্য BHU কে রাস্তায় নিয়ে আসতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র পাঁচ মাস।
এরপর ডঃ রাধাকৃষ্ণণের পরামর্শে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে দিল্লী নিয়ে গেলেন মন্ত্রী করে। শিক্ষামন্ত্রী থাকার পর, তিনি যখন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও রসায়ন মন্ত্রী হলেন, তখন আরও একবার তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রের নমুনা দেখা গেল। ভোটের আগে পার্টিফাণ্ডে অন্যায়ভাবে টাকার যোগান না দিয়ে তিনি নিজেই মন্ত্রীত্ব থেকে সড়ে দাঁড়ালেন। স্বেচ্ছায় মন্ত্রীত্ব থেকে সরে গেলেও, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আগের মতনই মধুর ছিল বরাবর। ১৯৭১ সালে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম পরামর্শদাতা। প্রথম দিকে ইন্দিরা গান্ধী মানতে রাজী ছিলেন না যে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা যথেষ্ট প্রস্তত এবং ভারতের সাহায্য পেলে তারা স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হবে। এই সময় প্রধানমন্ত্রীর সামনে প্রমাণ তুলে ধরার জন্য ডাঃ ত্রিগুণা সেনকে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে যেতে হয়েছিল। একবার তো এমন এক সাংঘাতিক কাণ্ড করেছিলেন যেটা কাগজে-কলমে লেখা যাবে না -- একদম অকল্পনীয়। ঠিক এই ঘটনার পরই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।
প্রণমি তোমারে হে মহান আচার্য্য।

(এটা পুনঃপ্রকাশিত হল। প্রথম প্রকাশ -- সমাজ শিক্ষা ৬৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা ৪ ডিসেম্বর, ২০১৯)

কিছু অজানা কথা

1. Siddharta Datta

যাদবপুর ও তার প্রথম উপাচার্য ত্রিগুণা সেন –
জার্মানি ১৯৩০-৩১। মিউনিখের একটি রেস্তরাঁয় খেতে আসতেন নিরামিষাশী হিটলার। সস্তায় ভাত-ডালের আশায় ভারতীয় ছাত্রদেরও সেখানে আনাগোনা। ভারত ও আফ্রিকার ছাত্রদের তিনি ঘোর অপছন্দ করেন জেনেও এক দিন রেস্তরাঁয় বসে ভারতের এক গবেষক-ছাত্র তাঁকে বলেন, ''আমরা যা রোজগার করি তার সবটাই এখানে খরচ হয়, তাতে কিন্তু আপনাদেরই লাভ।'' পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ওই তরুণ ভারতীয় গবেষক-ছাত্র তখন বিদেশি ছাত্রদের সংসদের সভাপতিও বটে। ১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথের জার্মানি সফরের সময় তাঁরই উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় 'চিত্রাঙ্গদা', নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন ওই ছাত্রনেতা স্বয়ং!

স্টুডেন্ট কার্ড দেখিয়ে সস্তায় জিনিসপত্র কেনা তখন বিদেশি ছাত্রদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে জার্মানিতে। এক বার এক হিটলারপন্থী জার্মান ছাত্রনেতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, তাঁর নেশাগ্রস্ত অবস্থার সুযোগে, ভারতীয় গবেষক-ছাত্রনেতাটি তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন ওই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে। স্টুডেন্ট কার্ড ফের চালু হল বিদেশিদের জন্য। সেই ছাত্রনেতাই পরবর্তী কালের ছাত্রদরদি ও গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ত্রিগুণা সেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিগুণা সেনকে নিয়ে একটি মৌখিক ইতিহাস প্রকল্পের সূত্রে এমন বহু অজানা কাহিনির সন্ধান পেয়েছিলাম, যার কিছু কিছু স্থান পেয়েছে সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রকাশিত লেসনস ইন লিভিং, স্টোরিজ় ফ্রম দ্য লাইফ অব ত্রিগুণা সেন বইটিতে। ওই প্রকল্পে অংশ নিতে গিয়ে আমার বার বার মনে হয়েছে, ত্রিগুণা সেনের জীবনের খোঁজে এমন অনেক গল্প উঠে আসছে, আজকের ভারতে উচ্চশিক্ষা নীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার প্রসঙ্গে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

যেমন হিউম্যানিটিজ় চর্চার বিষয়টা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক পীযূষ সোমের কাছে শুনেছিলাম, কী ভাবে ত্রিগুণা সেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষকদেরও সমাজতত্ত্বের বই পড়তে উৎসাহিত করতেন যাতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানে মানবমনের সংবেদনশীল কারবারি হয়ে উঠতে পারেন। পঞ্চাশের দশকে যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রদের জন্য 'মডার্ন ওয়ার্ল্ড' নামে ইতিহাসের মডিউল বা পাঠ-একক তৈরি করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার ছাত্ররা বাংলা সাহিত্য পড়তেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ইংরেজি প্রফুল্ল গুহ ও সংস্কৃত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর কাছে। পেশায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শঙ্কর সেন আমাকে বলেছিলেন, ১৯৮৬ সালে তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে আসেন, তখন প্রতি দিন সকালে এক বার করে আর্টস আর সায়েন্স বিল্ডিংগুলোর দিকে যেতেন কারণ প্রথম উপাচার্য তাঁকে আলাদা করে বলেছিলেন, ''তুমি আর্টস আর সায়েন্সকে একটু নজর দিয়ো।''

ত্রিগুণা সেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলেন ১৯২৬ সালে। চল্লিশের দশকে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন ওই প্রতিষ্ঠানেরই উত্তরসূরি যাদবপুরের কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং

অ্যান্ড টেকনলজি-র, ১৯৫৬-য়, যা থেকে উদ্ভব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রবর্তিত ওই ইনস্টিটিউটে কারিগরি বিদ্যা চর্চার পাশাপাশি হিউম্যানিটিজ় চর্চার ওপর ছিল বিশেষ জোর। শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এখানেই যাদবপুরের একটা বড় তফাত ছিল। ইতিহাস, দর্শন, ভাষা-সাহিত্য, ও শিল্পকলা বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন বহু বিশিষ্ট মানুষ। মনে করা হত, ছাত্ররা যখন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোবেন তখন তাঁরা যেন সমাজসংস্কৃতি সচেতন মানুষ হয়ে বেরোন। ত্রিগুণা সেন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশ বছরে তার দায়িত্বে ছিলেন, তখন সেই ধারাকেই নানা ভাবে পুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি কলা বিভাগের ছাত্রীছাত্রদের জন্যেও চালু করেছিলেন 'এভরিডে সায়েন্স' নামক একটি বিষয়। সত্তরের দশক থেকে ক্ষীণ হতে হতে এই ধারা এখন বিলুপ্ত বলা যায়।

সারা বিশ্বে যখন হিউম্যানিটিজ়ের বিষয়গুলো উপেক্ষিত, কলা বিভাগগুলো আর্থিক দৈন্যে ভুগছে, কারিগরি ও ম্যানেজমেন্টের ছাত্রীছাত্রদের তুলনায় হিউম্যানিটিজ়ের ছাত্রীছাত্র ও শিক্ষকদের নিচু নজরে দেখা হচ্ছে, কারণ তাঁদের টাকা রোজগারের ক্ষমতা কম, তখন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বর্ষীয়ান অধ্যাপকরা, যাঁরা আজ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির সঙ্গে উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত, ত্রিগুণা সেন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আক্ষেপ করছেন : আজকের পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ারদের অধিকাংশেরই সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, ক্লাসরুমে যে সমস্যার ফর্মুলা আলোচিত হয়নি, নিজে ভেবে তার তল অবধি পৌঁছতে শেখেননি তাঁরা।

যে সময় ত্রিগুণা সেন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন, তখন দেশ জুড়ে আইনকানুন পাল্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটা আজকের মতো রাষ্ট্রের কাছে বাঁধা রাখা হয়নি! বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় উদ্ভাবনী চিন্তার মূল্য এবং স্বাধীনতা ছিল। ত্রিগুণা সেন নানা ভাবে তার সদ্ব্যবহার করেছেন। দু'একটা উদাহরণ দিই।

পঞ্চাশের দশকের শেষে অসম থেকে ও ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক কারণে পড়া-ছেড়ে-চলে-আসা ছাত্রীছাত্রদের তিনি সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে নিতেন এমন ভাবে যাতে তাদের একটা বছর নষ্ট না হয়। নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শকে তিনি কখনওই এমন কোনও কাজে অন্তরায় হতে দেননি যা ছাত্রদের ভাল রাখবে। ত্রিগুণা সেন নিজে প্রথম যৌবনে বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন, তার পর জার্মানিতে ফ্যাসিবিরোধী বিদেশি ছাত্র সংসদের নেতা এবং পরবর্তী কালে দিল্লিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সদস্য। কোনও দিনই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। কিন্তু ডাক্তার অরুণ সেন যখন 'স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম' শুরু করেন, তখন সেই হোমের গায়ে কমিউনিস্ট তকমা লেগে থাকা সত্ত্বেও উপাচার্য হেল্‌থ হোমের কাজকর্ম দেখে বুঝেছিলেন যে তাঁর ছাত্রীছাত্রদের স্বাস্থ্যের খাতিরে 'স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম'-এর ইউনিভার্সাল মেম্বারশিপ থাকা দরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের! শুধু তা-ই নয়, কলকাতার মেয়র হিসেবে তাঁর কার্যকালের শেষ দিনে, খানিকটা বিধান রায়ের অমতেই, ত্রিগুণা সেন মৌলালির মোড়ে 'স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম'-এর জন্য বরাদ্দ করেছিলেন জমির আবেদন!

১৯৬৭ সালে তিনি প্রথমে হন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী এবং ১৯৬৯-তে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। ১৯৭২ সালে যখন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে আসেন, তখন তাঁকে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধী। ত্রিগুণা সেন 'না' বলেছিলেন এই যুক্তিতে : ''আমার গায়ে এখন পুরোপুরি একটা রাজনৈতিক দলের তকমা সেঁটে গেছে। যেখানে যাব, সেখানকার ছাত্ররা আর আমায় বিশ্বাস করবে না!''

আজ আমরা শিক্ষাঙ্গনকে ছাত্র-রাজনীতি প্রভাবমুক্ত করা নিয়ে অনেক কথা বলি। কিন্তু আজকের দিনে এ রকম উত্তর বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদদের মুখে মাঝে মধ্যে শোনা গেলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রীছাত্রদের সম্পর্ক আদৌ কিছু পাল্টাত কি না, সেটা নিয়ে ভাবার দরকার আছে।

2. Shibshankar Ghosh

অরুণবাবুর যাদবপুর প্রীতি

পাশের বাড়ির ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ুয়া এক দাদাকে দেখে একটি ছেলের শখ হয়েছিল সেও ইঞ্জিনীয়ার হবে। I.Sc. পরীক্ষার পর, বয়সে তরুণ ও নামে অরুণ, এই ছেলেটি প্রতিবেশী দাদাকে ধরল শখ মেটাবার জন্য। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে দাদাটি একদিন অরুণকে নিয়ে গেলেন তার কলেজ যাদবপুরে। রেকর্ড অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিরল কেশ সৌম্য চেহারার ভদ্রলোককে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে দাদা বললেন, "উনি আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ ত্রিগুণা সেন, ওনার কাছে গিয়ে প্রণাম করে নিজের ইচ্ছার কথা জানাও। যে কথা সেই কাজ, অরুণ চলল প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা
বলতে। কাছে যেতেই স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কি চাও?" চেহারায় এবং কথায় কি যেন এক অদ্‌ভুত আকর্ষণ ছিল। ছেলেটি কালবিলম্ব না করে উত্তর দিল, "স্যার, এখানে পড়তে চাই।' কতদূর পড়াশুনো করেছে জেনে নিয়ে স্যার বললেন, "যখন ভর্ত্তি হবার সময় হবে তখন এসো। এরমধ্যে অবশ্য ভাল করে চিন্তা করে নাও এখানে পড়বে কি না।
প্রায় তিন মাস পরে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের শেষ যাত্রায় প্রণাম জানাতে অরুণ দাঁড়িয়েছিল গড়িয়াহাটের মোড়ে। হঠাৎ কিছুটা দূরে ডাঃ সেনকে দেখতে পেল। কাছে গিয়ে নমস্কার জানাতে, তিনি অরুণের পিঠে হাত রেখে বললেন, "তুমিই কিছুদিন আমার কাছে এসে বলেছিলে না, যাদবপুরে ভর্তি হতে চাও? কি ঠিক করলে, পড়বে তো? তাহলে চলে এসো।" অরুণ চমকে উঠল এবং অভিভূত হয়ে গেল এই ভেবে যে একদিন মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য এক অচেনা ছেলেকে দেখে এখনও তাকে মনে রেখেছেন? কি অসাধারণ এই মানুষটি! তখনই সে মনে-প্রাণে ঠিক করে ফেলল যেখানে এরকম প্রিন্সিপ্যাল আছেন সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও পড়বে না।
গড়িয়াহাটের সেদিনকার ঘটনাটা তরুণটির মনে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে ১৯৪৮ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার পরও সে যাদবপুর ছাড়তে পারেনি। ঐ বছরই AKG হয়ে তিনি যাদবপুরেই শিক্ষকতায় যোগদান দেন। দীর্ঘ ২৪ বছর শিক্ষকতার পর, ১৯৭২ সালে রেজিস্ট্রার পদে যোগদান দিয়ে শ্রী অরুণ কুমার গুপ্ত আরও ১৬ বছর যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে সেবা করেন চাকুরী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

সদ্য পিতৃহারা বিভ্রান্ত ছাত্র

১৯৪৮ সাল। ইঞ্জিনীয়ারিং এর শেষ পরীক্ষার মাত্র এগারদিন আগে পিতৃ-বিয়োগ হ'ল মেকানিক্যাল বিভাগের এক ছাত্রের। ছেলেটি খুবই ভেঙে পড়ে। বই-এর সঙ্গে কটা দিন একদম সম্পর্ক ছিল না - মনে মনে একরকম ঠিক করে ফেলেছিল পড়া ছেড়ে দেবে। এই সিদ্ধান্তটা জানাবার জন্যই প্রচণ্ড রোদে খালি পায়ে, কুশাসন নিয়ে কলেজে গিয়ে ডাঃ ত্রিগুণা সেনের চেম্বারে ঢুকে পড়ে। স্যার তখন মাথা নীচু করে কিছু লিখছিলেন। মিনিট দুই পরে, মাথা তুলে ছাত্রটিকে দেখেই বললেন, "তোমাদের এ কি অবস্থা!" তারপর সব শুনে পাশে টুলে বসিয়ে সস্নেহে অনেক উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে তরুণটির মন চাঙ্গা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার প্রথম দিন হলে গিয়ে ছেলেটির পিঠে হাত রেখে বলে এলেন, "মন শান্ত করে পরীক্ষা দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সেদিনকার তরুণ ও বর্তমানের অশীতিপর বৃদ্ধ ভদ্রলোক দক্ষিণপূর্ব রেলের বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ পদে সৎ ও নির্ভীক ভাবে কাজ করে এখন অবসর জীবন উপভোগ করছেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে বয়সের ভারে আজকাল অনেক কিছু ভুলে গেলেও, ভুলতে পারেন নি সেদিন টুলে বসে শোনা স্যারের দেওয়া উপদেশ ও উৎসাহ বাণী, যেগুলি ওনার জীবনের এক পরম প্রাপ্তি।

সার্টিফিকেট বিহীন ছাত্র ভর্তি

স্যারের কাছে কোন অনুরোধ এলে চট্ করে তিনি কাউকে বিমুখ করতে পারতেন না। অবশ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার আগে, অনুরোধকারীর চেহারাটা একবার পরখ করে নিতেন তার গভীর দৃষ্টি দিয়ে। তিনি যদি একবার মনে করতেন Candidate সাহায্য পাবার যোগ্য তাহলে নিয়ম-কানুন বিশেষ মানতেন না। তাঁর এই দুর্বলতার কথা সারা ভারতের লোকে জানত। দেশভাগের পর একটি পাঞ্জাবী ছেলে এসে সরাসরি ডাঃ সেনের সঙ্গে দেখা করে বলল সে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছে এবং তার একান্ত ইচ্ছে যাদবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বে। তার কাছে কোন সার্টিফিকেট ছিল না, সমস্ত ছেড়ে এসেছে পাকিস্তানে। ছেলেটি জানাল সুযোগ দেওয়া হলে সে ভবিষ্যতে ভাল ইঞ্জিনীয়ার হয়ে যাদবপুরের নাম উজ্জ্বল করবে। ডাঃ সেন ফোনে প্রভোষ্ট এবং Mechanical এর H.O.D প্র. গোপাল সেনকে বললেন, "একটি ছেলেকে পাঠাচ্ছি, ফার্স্ট ইয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তি করে নাও।" গোপাল বাবু একটু কিন্তু কিন্তু করলে তিনি বলেছিলেন, ওকে ভর্তি করে দিলাম, যা পয়সা-কড়ি লাগবে সে সব পরে দেখা যাবে। এখন তুমি দেখ -- ও চলবে কি না।" গোপাল বাবু অগত্যা তাকে ভর্তি করে নিলেন।
এই ছেলেটি পরবর্তী কালে ভারত সরকারের অধীনে একটি সরকারী সংস্থার উচ্চতম পদের দায়িত্বভার নিপুন ও সুষ্ঠুভাবে সুচারুভাবে সম্পাদন করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে ডাঃ ত্রিগুণা সেন নিজের দায়িত্বে তাকে সেদিন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সুযোগ করে দিয়ে কিছু ভুল করেননি। সুযোগ পেলেই তিনি গর্বের সঙ্গে প্রচার করতেন, তিনি যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।।

মন্মথ বাবু চিকিৎসা

কলেজ অফ ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেকনলজি, যাদবপুরের একজন প্রবীণ ইনস্ট্রাক্টর একবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসায় সাম্ভাব্য খরচের অঙ্ক দেখে তাঁর দুশ্চিন্তা যায় বেড়ে। এইরকম সময় একদিন ডাঃ ত্রিগুণা সেনের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে এসে মন্মথ বাবুর্চিখানা কাছে হাজির হলেন কলেজের দারোয়ান। তিনি জানালেন স্যার এগুলি পাঠিয়েছেন চিকিৎসার জন্য। প্রবীণ মন্মথবাবু জানতেন কারুর কাছে টাকা সাহায্য চাওয়াটা ডাঃ সেন খুব অপছন্দ করতেন, সেইজন্য নিজের প্রয়োজনের কথাটা ওনার কানে তোলার সাহস পান নি। অথচ আজ বাড়িতে বসেই, বিনা আবেদনে, কেমন করে টাকাটা ঠিক সময়মত ওনার হাতে পৌঁছে গেল? আসলে ডঃ সেন প্রতিটি সহকর্মীর খোঁজ খবর রাখতেন নিছক ভালবাসার টানে, আর প্রয়োজন মনে করলে নিজের
বেতন থেকে নিঃশব্দে তাদের অর্থ সাহায্য করতেন, যেটা উপকৃত ব্যক্তিটি ছাড়া অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন না।

অবশ্য পরবর্তীকালে কলেজের দুর্দিনে, মাস্টারমশাইদের মাইনে বন্দোবস্ত করতে যখন নিজের স্ত্রীর গয়নাগুলি বন্ধক রাখেন, তখন কয়েকজন খুব ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, "মহৎ লোকের সঞ্চয় মেঘের মত পরকে দান করার জন্য।"
সহকর্মীদের এরকম আলোচনা এক বর্ষীয়ান বিপ্লবীর কানে গেলে, তিনি হেসে বলেন, "তোমরা ত্রিগুণাকে আর কতটুকু জান? ওকে তোমরা শুধু যাদবপুরের চত্বরেই দেখেছ। এর বাইরেও যে ও কত লোকের কত রকমভাবে উপকার ক'রে যাচ্ছে, সেটা কাক-পক্ষীও টের পায় না। কোন্ বিপ্লবী সম্প্রতি মারা যাওয়ায় তার পরিবারের এখন কি অবস্থা, বা কোন্ ছেলের বিদেশে পড়তে গিয়ে কি কি অসুবিধা হচ্ছে এ সব তথ্য ত্রিগুণার নখদর্পণে এবং প্রয়োজন মত সাহায্য ঠিক সময়েই অযাচিতভাবে পৌছে যায় সঠিক জায়গায়।

সাহায্যপ্রার্থীনী মহিলা

সালটা ছিল ১৯৬৩। একজন মহিলা একটি ৬/৭ বছরের ছেলের হাত ধরে এসে দাঁড়ালেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডঃ সেনের কোয়ার্টারের সামনে। একতলার এই বাসস্থানে কোন দ্বাররক্ষী ছিল না এবং দরজাটা ছিল খোলা । দরজায় উঁকি দিতেই, ভেতর থেকে আওয়াজ এলো "কি চাই? ভেতরে আসুন।" মহিলা ভেতরে ঢুকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, "আমি বড় বিপদে পড়েছি – আমার স্বামীর T.B. হয়েছে, অর্থাভাবে ছেলে দুটির পড়াশুনো বন্ধ, আমি নিজে কোনও রোজগার করি না – এ অবস্থায় আপনি যদি কিছু সাহায্য করেন!" ডাঃ সেন জানতে চাইলেন কি ধরণের সাহায্য তিনি আশা করেন। মহিলা তিরিশটা টাকা চাইলেন। স্যার তখন বললেন, "টাকা দিয়ে কাউকে সাহায্য করা আমি পছন্দ করি না।" মহিলা তখন বললেন, "আমি শুনেছিলাম আপনি খুব দয়ালু, তাই অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম।" ডাঃ সেন এর উত্তরে বললেন, "এককালীন তিরিশটা টাকা আপনার কি উপকারে আসবে? বার বার কতজনের কাছে এরকমভাবে টাকা চাইতে যাবেন? আপনি তো লোকের কাছে টাকা চাওয়াটা বৃত্তি হিসাবে নিতে পারেন না - আর সেটা উচিতও নয়। অনেক রকমভাবে আপনি সাহায্য পেতে পারেন, যেমন T,B, হাসপাতালে আমার জানাশুনো আছে, যাদবপুর বিদ্যাপীঠে আপনার ছেলেদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এমনকি কিছু পুরোনো বইও যোগাড় হয়ে যাবে। তবে আমি খুশী হব, আপনি যে সব কাজ জানেন, তাই দিয়ে যদি নিজের চেষ্টায় কোন উপার্জনের বন্দোবস্ত করতে পারেন - ধরুন বাড়িতে বড়ি বানিয়ে এখানে নিয়ে এলে স্টাফদের বলতে পারি সেগুলি কিনে নিতে। এইরকম আরও কিছু ভাবা যেতে পারে।"

মহিলা শান্ত হয়ে সব শুনে নিয়ে বললেন, "আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন। এখন বুঝতে পারছি প্রকারান্তরে ভিক্ষাই জীবিকা হিসাবে নিতে যাচ্ছিলাম। স্যার, আমি ভাল রান্না করতে পারি, একটু দেখবেন আপনার জানাশুনা যদি কেউ কাজ দেন - অবশ্য আমি নিজেও চেষ্টা করবো ।" ডঃ সেন খুশী হয়ে বললেন, "এই তো চাই, দেখবেন ভবিষ্যতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না, আমি সব সময় আপনার পাশে থাকব। " যাবার সময় মহিলাকে প্রচণ্ড উজ্জীবিত মনে হল।

স্বামী প্রেমেশানন্দের চিকিৎসা

১৯৬৭ সালে স্বামী প্রেমেশানন্দ অসুস্থ অবস্থায় বেনারসের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ছিলেন। ঐ সময়ে বেনারস শহরের সব চাইতে ভাল ডাক্তার ছিলেন BHU-তে। একবার স্বামীজীর কষ্ট খুব বেড়ে গেলে তাঁকে ঐ ডাক্তারবাবুকে দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যোগাযোগ করে জানা গেল ভাইস-চ্যান্সেলারের অনুমতি ছাড়া ডাক্তারবাবু ইউনিভার্সিটির বাইরে রোগী দেখতে যেতে পারেন না। স্বামী গহনানন্দজী সহজে হেরে যাবার পাত্র নন—উনি সোজা পৌঁছে গেলেন ভাইস-চ্যান্সেলারের অফিসঘরে। লাল-আলো জ্বালিয়ে ঘরের ভেতর তখন চলছিল ইউনিয়ন সংক্রান্ত একটি জরুরী মিটিং। মহারাজ ঠিক করলেন অপেক্ষা করবেন। নিরুপায় হয়ে PA. ভদ্রলোক ওনার নাম লেখা Slip-টি নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন মিটিং এর মধ্যেই। PA. ভদ্রলোক ফিরে আসার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ ত্রিগুণা সেন। এসেই অভিযোগ করলেন, "কি এমন প্রয়োজন যে আপনার নিজেকে আসতে হ'ল ?" মন দিয়ে সব শুনে মহারাজকে গাড়িতে তুলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" এই সময় মহারাজ লক্ষ্য করলেন ডাঃ সেনের পায়ে চটি বা জুতা কিছু নেই। জানতে চাইলেন পা খালি রাখার কারণ। উত্তর পেলেন, "আপনি অপেক্ষা করছেন, আর আমি জুতো পরতে গিয়ে কি করে সময় নষ্ট করতে পারি!"

স্বামী প্রেমেশানন্দজীকে সেবার বাঁচানো না গেলেও, ডাঃ সেনের ব্যবহারটুকু রামকৃষ্ণ মিশনের পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ কখনই ভুলতে পারেননি।

যাঁদের বদন প্রসন্ন, হৃদয় দয়ায় পূর্ণ, যাঁদের মুখে সুধাভরা কথা,
যাঁদের কাজ পরোপকার করা, কে না তাদের সম্মান করে?

গুরু বন্দনা

1. দীপক সেনগুপ্ত

আমরা তো কত মণীষীর জীবনী পড়ি। যাদবপুরে পড়তে গিয়েই আমাদের প্রথম মণীষী দর্শন হয়। আমরা গর্ব্বিত ও ভাগ্যবান যে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্ন্যধ্যে আসতে পেরিছিলাম। তিনি ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য্য।

ত্রিগুণা-প্রণাম।

2. Prafulla Ray

প্রণমি তোমায়
১৯৫৯ সালে I.Sc পাশ করে যাদবপুরে ভর্তি হলাম। Direct admission. আমার I.Sc র রেজাল্ট খুব ভাল ছিল। আর তখন যাদবপুরে কোন entry exam ছিল না। I.Sc র নম্বর (Physics,chem maths) + interview. আমার high letter mark ছিল বলে ডাইরেক্ট এডমিশন পেয়েছিলাম মেকানিকাল এ।
সেই যাদবপুর! যেখানকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আজ আমি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এতবছর সুনামের সাথে পড়ালাম।
সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। দুজন মহান পুরুষের কথা জানাব।তাঁরা আছেন আমার হৃদয়ের ভিতর যে হৃদয় আছে সেই খানেই।
স্বনাম ধন্য মহান ঋষি ডঃ ত্রিগুণা সেন, Vice Chancellor Jadavpur University. আরও একজন। আমার পরম আরাধ্য মহান ঋষি, ছাত্র দরদী অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন। প্রোভোস্ট, হেড মেকানিকাল এবং পরবর্তী কালে Vice Chancellor, JU.
আজ কাল রাজনীতি করাটাই যেন শিক্ষা জগতের মাপকাঠি। তখন ছিল না। ১৯৫৯/১৯৬৩ সাল পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলন দেখিনি।
আগে বলেছি আমি তখন প্রথম বর্ষের ছাত্র। ডঃ ত্রিগুণা সেন তখন Vice Chancellor. আমার পরম সৌভাগ্য তাঁর খুব কাছে আসতে পেরে ছিলাম। আমার এ কাহিনি আজকের দিনে বিশ্বাস করা কঠিন। তবু সত্যি।
শুনেছিলাম তাঁর দরজা ছাত্রদের কাছে ছিল অবারিত। আমি নিজেও তার প্রমান পেয়েছিলাম। তাঁর অফিসের বাইরে বসা পিওন কে বলা ছিল কোন ছাত্র দেখা করতে চাইলে এবং তখন ঘরে কেউ না থাকলে ছাত্রকে যেন ভিতরে আসতে দেওয়া হয়।
আমি একবার আমার এক বন্ধুর পরামর্শ মত তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। অনেক ভয় আর আশঙ্কা নিয়ে। আমি আমার I. Sc র রেজাল্টের জন্য full free studentship পেয়েছিলাম। বন্ধু বলেছিল তোর রেজাল্ট খুব ভাল। তুই DPI Scholarship এর জন্য দেখা কর।
সেই মত খুব ভয়ে ভয়ে ওনার ঘরে গেলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম। কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। উনি বসতে বললেন। কেন এসেছি, কি দরকার জিঞ্জাসা করলেন। আমি বললাম আমি full free student ship পেয়ছি। আমি I.Sc তে Physics, Chem, Maths এ ৮৫%/৯০% পেয়েছি। কিন্তু DPI Scholarship পাইনি। উনি আমার ফ্যামিলি র কথা মন দিয়ে শুনলেন। বাবা কি কাজ করেন ইত্যাদি। তার পর বললেন,"দেখ আমি এ ব্যপারে কি করতে পারি? তবে তুমি তোমার নাম,রোল নম্বর, ডিপার্টমেন্ট লিখে রেখে যাও। দেখি কি করা যায়।" আমি তখন ওনার ঘর থেকে বের হতে পারলে বাঁচি।

তারপর যা ঘটলো, তা আমার জীবনের সবথেকে স্মরনীয় ঘটনা,যা আমি আজও ভুলতে পারিনি।পারবও না কোন দিন।
দুদিন পর কলেজ নোটিশ বোর্ডে দেখি আমার ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ cancelled. খুব ভয় পেয়েছিলাম। আর একটা নোটিশ বোর্ডে দেখলাম আমাকে DPI Scholarship দেওয়া হয়েছে। আমি আজও বিশ্বাস করতে পারি না একজন Vice Chancellor একটি 1st yr student এর কথা শুনে,মনে রেখে খোঁজ খবর নিয়ে এমন কাজ করতে পারেন! এই মহান ঋষিতুল্য মানুষটি পরে আমাদে শিক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রতিটি ছাত্র তাঁকে ভালবাসতেন। তিনি যাদবপুর কে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। সেই শিক্ষায় আজকের আমি, আমি হতে পেরেছি।
প্রণমি তোমায় হে মহান ঋষি ত্রিগুণা সেন।

শেষে আর একজনের কথা। ছাত্রদরদী, ঋষিতুল্য অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন। সকলের প্রিয় গোপালবাবু।
Oxford-educated Engineer.আমাদের মেকানিকাল এর হেড। পরে Vice Chancellor.
ধুতি পড়ে আমাদের ক্লাস নিতেন। ওনাকে দেখে আমার Sir Ashutosh Mukhopadhyay র কথা মনে পড়তো আপাত গম্ভীর, রাশভারি মানুষটির ভিতরে বয়ে চলতো স্নেহ ভালবাসার ফল্গু ধারা।
এমন ছাত্র দরদী মানুষ আমি আর দেখিনি আমার জীবনে। ছাত্রদের তিনি নিজের ছেলের মতই দেখতেন। প্রচন্ড বকাবকি করতেন পড়াশুনা না করলে। বলতেন তোমরা বাইরে খারাপ ব্যবহার করলে সবাই বলবে গোপাল বাবুর ছেলেরা করেছে! কিন্তু যত রাগই করুন, যত চীৎকারই করুন পরীক্ষার ফলের উপর তার কোন প্রতিফলন হত না। আমি বার বার তার পরিচয় পেযেছিলাম। তাঁর বড়ছেলে প্রসুনদা আমাদের এক ক্লাস উপরে পড়তো। প্রসুনদা যখন যে ক্লাসে পড়তো উনি সেবছর সে ক্লাসে পড়াতেন না। পেপার সেটও করতেন না। আমার অনেক কাছ থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

এমন মহান ঋষি কে প্রান দিতে হ'ল আততায়ীর হাতে। তাঁর কোয়াটারের সামনেই। তাঁর statueর সামনে গেলে আমার কান্নার বাঁধ ভেঙ্গে যায় আজও।
ক্ষমা কর আমাদের। হে মহান ঋষি ছাত্রদরদী অধ্যাপক গেপাল চন্দ্র সেন।
প্রণমি তোমায়।

3. Dr. Mrs. Mukti Chowdhury

(স্বর্ণযুগের যাদবপুরের সোনার মানুষ ডাঃ ত্রিগুণা সেন সম্পর্কিত স্মৃতিচারণা। এই স্মৃতি চারণাটি আমাদের কোনও বন্ধুদের নয়, এটির একটি প্রাক্ কথন আছে। আমাকে এই লেখাটা পঠিয়েছে বন্ধু পার্থ।
প্রথমে পার্থকেই উদ্ধৃত করি :

"ঘটনাটা ডাঃ শ্রীমতী মুক্তি চৌধুরীর প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা থেকে উধৃত। মুক্তিদেবী আসামের কটন কলেজে শিক্ষকতা করতেন ও ১৯৯৯-২০০০ সালে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। মুক্তিদেবী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারাশঙ্করের ওপর গবেষণা করে ডক্টরেট হন । কিভাবে সেটা স্যারের (ডাঃ সেন) সাহায্যে শুরু হয়েছিল, তার বিবরণ মুক্তিদেবী লিখেছেন পরবর্তী কালে, তাঁর "টালা পার্ক, লাভপুর রেলস্টেশন ও তারাশঙ্কর' শীর্ষক প্রবন্ধের শুরুতে। প্রবন্ধটি শুরু হয়েছিল ড: ত্রিগুণা সেনকে নিয়ে ডাঃ মুক্তি চৌধুরীর অসামান্য এক স্মৃতিকথায়, এটি প্রকাশিত হয়েছিল নামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা, বৈশাখী ২০১৪-২০১৫ বিশেষ তারাশঙ্কর সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩১)।" দীপক

এবার শুরু ডাঃ মুক্তি চৌধুরীর লেখায় স্মৃতি-চিত্রন

গবেষণার পরিকল্পনা নিয়ে ষাটের দশকে এই ছাত্রীকে সসংকোচে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। সুদুরবাসিনীর এই অধ্যয়ন স্পৃহা চরিতার্থতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন যখন প্রতিকূল বিবেচিত হল, তখন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুকুমার সেন ও অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাক্ষিণ্য লাভ সত্ত্বেও আমার কাছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকর্ষণ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। অতএব, বিদ্যায়তন পরিবর্তনের বাসনায় ছিল এই নতুন উদ্যম। অবশ্য এখানেও নেপথ্য সহযোগিতা ছিল অনেকের, বিশেষ করে উপাচার্য ডা: ত্রিগুণা সেনের। এই নিবন্ধের উপক্রমণিকায় অবিস্মরণীয় এই ঘটনার উল্লেখ না করলে নিজের পক্ষেই এই অপরাধের ভার বহন সহজ হবে না।

গবেষণা সংক্রান্ত বিধিনিয়ম সম্পর্কে অবহিত হতে যেদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয়ে গেলাম, সেদিন কলা বিভাগের ডিন অসীম কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন। জনৈক সদাশয় কর্মচারী অভিভাবক সুলভ মমতায় আমাকে উপাচার্য ডাঃ ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরামর্শ দিলেন। এমন বিশ্রুতজনের সামনে দাঁড়াবার আগ্রহ থাকলেও ওই বয়সে নানা ভয় ভাবনা ও জড়তায় তা আয়াসসাধ্য মনে হচ্ছিল না। কিন্তু অবিলম্বে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাওয়ার তাড়নায় কষ্টেসৃষ্টেও খানিকটা সাহস সঞ্চয় করেছিলাম।

সেদিন অপরাহ্নের জল ছবিটি ছিল বড়াই ব্যতিক্রমী। দ্বিধা-সংশয়-কবলাক্রান্ত আমি আষাঢ়ের মৃদুবর্ষণ মাথায় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যখন ডাঃ ত্রিগুণা সেনের বাড়ির বারান্দায় পা রাখলাম, চেয়ারে বসে কেউ তখন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মুখের সামনেই কাগজ তাই চেহারা ছিল অদৃশ্য। তবে পায়ের শব্দ শোনা মাত্রই কাগজ সরিয়ে প্রশ্ন করলেন,

- "কাকে চাই?"

- "আমি উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

– "বসো, বলো কী ব্যাপার?"

এবারে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আমার উদ্দেশ্য জানালাম। আমি যেহেতু গুয়াহাটির কটন কলেজে অধ্যাপনা করি এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, তাই কলকাতায় না থাকলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার অনুমতি পাচ্ছি না। অথচ চাকরি ছেড়ে আসাও সম্ভব নয়। এই সমস্যা হওয়ায় এখানকার নিয়ম কানুন জানতে এসেছি। সবিনয়ে বললাম, – "ডিন মহাশয় ছুটিতে থাকায় আপনাকে বিরক্ত করতে হল। মার্জনা করবেন আমাকে।" তিনি আমার কুণ্ঠা দূর করে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললেন "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতে কিছু হয়নি।" তারপরই একটু ভেবে নিয়ে উপাচার্য জানালেন - "আমার এখানে এ ধরনের কোনো নিয়ম আছে বলে মনে হয় না। হ্যাঁ – তবুও এই বিষয়ে অসীম দত্তের সঙ্গে একবার কথা বলে নেওয়া ভালো।"

আমার কলেজের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে আসছিল, ফলে বেশিদিন এখানে থাকা সম্ভব নয়। তাই এবারে নিয়মকানুন জেনে নিতে পারলে যে খানিকটা স্বস্তি হত এবং একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, একথাও

খুলে বললাম তাঁকে। তিনি পরম শুভানুধ্যায়ীর মতোই আমার সমস্যার আশুসমাধানের চেষ্টা করে বললেন – "এক কাজ করো, আজই অসীম দত্তের বাড়ি চলে যাও না কেন? ভবানীপুরের নন্দন রোডে থাকেন উনি।"

আমি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তখনই অসীম দত্ত মহাশয়ের কাছে যেতে মনস্থির করলাম। বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে না নামতেই "দাঁড়াও তো একটু" বলেই উপাচার্য মহাশয় দ্রুত ঘরের ভেতরে চলে গেলেন এবং নিমেষের মধ্যেই আবার বেরিয়েও এলেন, হাতে একটা রিঙসুদ্ধ চাবি। বাড়ির কাছেই পার্ক করে রাখা ছিল একটা গাড়ি, তিনি ঝটপট গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিঙে হাত রাখলেন। তারপর গাড়ি চালিয়ে এনে আমার সামনে থামলেন। বললেন - "উঠে এসো ঝটপট" আমি বিস্ময়-বিমূঢ়। প্রবল আপত্তি আমার, – "না, না — আমি একাই যেতে পারব, ঠিক খুঁজে বের করে নেব। আর ঐ তো – সামনে গেলেই কত বাস।" উপাচার্য সস্নেহে বললেন – "আরে বাবা, কোথায় সেই গৌহাটি থেকে এসেছ। কলকাতার রাস্তাঘাট ভালো করে জানা নেই। তায় আবার বৃষ্টি। খানিক পরে সন্ধ্যেও হয়ে যাবে, একা একা কোথায় খুঁজে বেড়াবে অসীমের বাড়ি ? এসো, এসো" |

এই আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা আমার ছিল না। তাই লজ্জায় শরমে মরে গেলেও গাড়িতে বসতে হল। যেতে যেতে আমার দেশ-বাড়ি, বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজনেরও সংক্ষিপ্ত খবর নিলেন। ভবানীপুরের নন্দন রোডে পৌছে দূরে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললেন - "ওই যে বাড়িটা দেখছ তো? এবার সোজা চলে যাও। যদি আবার কোন সমস্যা হয়, তবে আমার কাছে চলে এসো। বিষয়টি যে আমার জানা আছে অসীম দত্তকে তা-ও বলে দিও।

আমাকে নামিয়ে উনি ফিরে গেলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেদিনের ওই বিকেলটা যেন আমার কাল্পনিক সেই স্বর্গের নন্দনকাননের অপরূপ বিভায় ঝলমল করে উঠল। ভারতের কীর্তিমান যশস্বী পুরুষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কারিগর ডাঃ ত্রিগুণা সেনের মতা বরেণ্য ব্যক্তি অচেনা এক মেয়েকে তাঁর বাৎসল্যের ছায়ায় কীভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এ যুগে হয়তো তা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাচার্যের এমন নির্বিচার স্নেহ সিঞ্চনের নজির আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের পর অদ্যাবধিও আমি এমন অভিনব দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইনি।

সৌজন্যে পার্থ প্রতীম রায়

প্রশাসক ডাঃ ত্রিগুণা সেন

1. দীপক সেনগুপ্ত

বন্ধু প্রফুল্ল সবাইকে অনুরোধ করেছিল, সবাই যেন যাদবপুর নিয়ে কিছু কথা, অবশ্যই নিজের স্মৃতির ভান্ডার থেকে।
লেখার ব্যাপারে আমার নিজের অদক্ষতা আমার নিজেকেই ভীষণ পীড়া দেয়, তো তোমরা তো bore হবেই। এতৎসত্বেও ভাবছি, তোমাদের কলম ধরার কাজটাকে আমি কিছুটা এগিয়ে দেই আমার অপটু হাতের ছোঁওয়া দিয়ে। এর সাথেই সবাইকে অনুরোধ, তোমরাও তোমাদের নিজেদের যাদবপুর-স্মৃতিকথা আমাদের সকলের সাথে শেয়ার কর।

একটি ঘটনা, যতদূর মনে পড়ে আমাদের যাদবপুরের দ্বিতীয় বর্ষের জীবনকালে।
যে সময়ের ঘটনা, সে সময়ে একটা ছাত্র-অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল আমাদের সেমিষ্টার পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন তথাকথিত অব্যাবস্থা নিয়ে। আমাদের কিছু ছাত্রনেতা সিধ্যান্ত নিল রেক্টরের দরজার সামনে বিকেল পাঁচটার পর থেকে অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে। আমাদের মত অনেককেই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সেই বিক্ষোভে অংশ নিতে হল।
বিক্ষোভ শুরু হল, সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হল, কিন্তু ছাত্র বিক্ষোভে কতৃপক্ষ বধির রইলেন।
হঠাৎ দেখতে পেলাম রাত ১২টা নাগাদ আমাদের সকলের প্রিয় সত্যেনদা তাঁর সেই চিরপরিচিত পোষাকে অর্থাৎ ধুতি-ফতুয়াতে, স্ফীতোদর ভুড়ি দুলিয়ে ক্যান্টিনের দিক থেকে আমাদের দিকে আসছেন। আমাদের প্রতি তাঁর রোষকষায়িত দৃষ্টি হেনে, সত্যেনদা সটান রেক্টরের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমরা অবাক, রাত্রির এই মধ্যযামে আমাদের বিক্ষোভ-কণ্ঠ তখন স্তিমিত; উল্টে সত্যেনদার এই হঠাৎ-আগমনের হেতু আমাদের নতুন চিন্তার কারণ হল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, অল্প কিছু পরেই সত্যেনদা রেক্টরের ঘরের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুখে স্পষ্টতই বিরক্তি, আমাদের প্রতি আবার তাঁর রোষকষায়িত দৃষ্টি। কিন্তু এবার শুধু দৃষ্টি নয়, সাথে গর্জনও। চরম বিরক্তির স্বরে সত্যেনদা বল্লেন, "হুঁউ, তোমাদের জন্য আজ আমার রাতের ঘুম উড়ে গেল। তোমরা নাকি অভুক্ত, আর ক্ষিদেপেটে নাকি কোন আলোচনা হয় না। তাই আমার প্রতি স্যারের হুকুম, আমার ভাড়ারে চাল-ডাল-আলু-ডিম যা আছে, তাই ফুটিয়ে তোমাদের পিণ্ডি গেলাতে হবে। তা বাবারা, অনেক তো হল, বলি কি, এবার না হয় কিছুক্ষণের জন্য একটু ক্ষান্ত দাও আর আধঘন্টা পর, ক্যান্টিনে এসে সবাই একটু ভাতে-ডালে সেদ্ধ খেয়ে এসো, তারপর আবার তোমাদের বিক্ষোভ-টিক্ষোভ নতুন করে শুরু ক'রো, কেমন!"
আমরা বিস্মিত, আমরা বিমুঢ়, আমরা হতবাক। বলা বাহুল্য, সেদিন রাত একটার পরে রেক্টরের সাথে ছাত্রনেতাদের আলোচনা ফলপ্রসুই হয়েছিল এবং পরের দিন থেকে আন্দোলন ফান্দোলন সব তুলে নেওয়া হল, আমরা আবার সুবোধ বালকে পরিণত হলাম।

আজকের দিনে বা প্রেক্ষিতে এই মহান শিক্ষাব্রতী ছাত্রদরদী, পরম শ্রদ্ধেও, সর্ব্বজনপ্রিয় শিক্ষাগুরু, আমাদের একান্ত আপন, একান্ত প্রিয় সেদিনের রেক্টর, ডাঃ. ত্রিগুণা সেনের প্রতি রইল আমার বিনম্র সশ্রদ্ধ প্রণাম।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, উত্তাল ছাত্র-আন্দোলনের কারণে ২০১৪ সালের ১৫ই-১৬ই সেপ্টেম্বরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন VC ডাঃ অভিজিত চক্রবর্তী, Pro V.C. ডাঃ সিদ্ধার্থ দত্ত এবং প্রশাসনিক কর্ত্তা-ব্যক্তিরা ঘেরাও হয়েছিলেন। ঘেরাওয়ের মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যে, প্রায় মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ ডেকে পুলিশের লাঠ্যৌষধিতে ঘেরাও ভাঙা হল। এই অবসরে বলে রাখি, যাদবপুরের আশ্রমিক আর

নান্দনিক পঠন-পাঠন-আবহে লালিত Pro V. C সিদ্ধার্থ দত্ত পুলিশের লাঠির সাহায্যে আন্দোলন ভাঙার আধুনিক রীতিতে বিমর্ষ হয়েছিলেন এবং সুদক্ষ প্রশাসক হওয়া সত্বেও Pro VC র দায়িত্বভার পরিত্যাগ করেছিলেন।
যাদবপুরের ছাত্রাবস্থায় অভুক্ত ছাত্রদের মুখে অন্নের ব্যাবস্থা করে ছাত্র-আন্দোলন প্রশমিত-করা-চোখে আন্দোলন দমনে পুলিশের লাঠির ঘায়ে ছাত্র-আন্দোলন দমন করার ঘটনা তাঁর যাদবপুরের উত্তরাধিকারকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছিল।

2. Prafulla Roy

বন্ধু সকল,
দীপকের তাড়া খেয়ে যাদবপুরের স্মৃতি। এখানেও মানুষ ডঃ ত্রিগুণা সেন এর আর একটা দিক। যারা ঐসময় JU Main Hostel এ থাকতো তাদের হয়তো মনে পড়বে। ঘটনার সুত্রপাত ওখান থেকেই।
১৯৬১/৬২ হবে। মেন হষ্টেল এর কিছু ছেলে, যখন রিক্সাওয়ালা দের একটা প্রসেশন যাচ্ছিল, তখন জোরে জোরে জোক করেছিল। বলেছিলে রিক্সাওয়ালা দের আবার প্রসেশন, ওদের আবার দাবী মানতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।
ওরা সোজো ত্রিগুণা সেন এর কাছে নালিস জানায় ছাত্রদের নামে। তারপর যা ঘটল আজকের দিনে চিন্তাই করা যায় না।
ত্রিগুণা সেন urgent notice দিয়ে ঐ সব ছাত্রদের তাঁর কাছে আসতে বলেন। এবং যাদবপুরের সব ছাত্রদের Assembly তে ডাকা হ'ল। রিক্সাওয়ালা রাও এল। ত্রিগুণা সেন ঐ সব ছাত্রদের বললেন রিক্সাওয়ালাদের কাছে ক্ষমা চাইতে। ওরা মাথা নিচু করে ক্ষমা চাইল। রিক্সাওয়ালারা চলে গেলে তারপর উনি বললেন তোমাদের জন্য আজ আমি গর্বিত। একদিন ছিল যখন বেথুন এর মেয়েরা প্রেসিডেন্সির ছেলেদের গলায় মালা দিত। আজ দিন বদলে গেছে। অনেক চেষ্টার পর তোমাদের যাদবপুর আজ সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছে। আজ বেথুন, ব্রাবোর্ণ এর মেয়েরা যাদববপুরের ছেলে খোঁজে। তোমরা আমার গর্ব। তোমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব।
আমি আজও ভুলতে পারি নি সেদিনটার কথা। আজকের দিনে বিশ্বাসই করা যায় না।
প্রণমি তোমায় হে মহান ঋষি।

3. Dipak Sengupta

প্রবল জলোচ্ছাসের মত কয়েক হাজার শ্রোতার কণ্ঠনাদকে কি প্রবল ব্যক্তিত্বের জাদু দিয়ে কয়েক মুহূর্তে স্তব্ধ করা যায়, উদগত বিশৃঙখলাকে কিছুমাত্র সময়ের ব্যাবধানে সুশৃঙখল করা যায়, সে ঘটনার নায়ক ডাঃ ত্রিগুণা সেন।
আদর্শ প্রশাসক ডাঃ সেন ছিলেন স্বমহিমায় ভাস্বর।
অনুষ্ঠানে ছিলেন এক জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। কিন্তু আসর জমল না, প্যান্ডেল জুড়ে শুরু হল গুঞ্জন। বেশীক্ষন এই অনুষ্ঠান চল্ল না। এরপর শিল্পী হিসেবে ঘোষিতা হলেন এক বিখ্যাত মহিলা শিল্পী। মধ্যরাতের একটু আগে উগ্র সাজ, ঠোঁটে মোটা লিপস্টিক, চোখে মোটা কাজল, গালে রুজ্, ঈশৎ স্থুল বপু, গান শোনার আগে থেকেই হাততালি শুরু, গুঞ্জন বেড়ে কোলাহল, প্যান্ডেল ক্রমশ অশান্ত, শিল্পী গান গাইতে বসলেন, কোলাহল উচ্চগ্রামে পোঁছাল, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আয়ত্ত্বের বাইরে যাবার উপক্রম। ঠিক এ রকম একটা পরিস্থিতিতে মঞ্চে প্রবেশ করলেন ডাঃ ত্রিগুণা সেন। ঋষি সুলভ চেহারা, বিরাট জনতাকে সন্মোহিত করার যাদু, নিজের ওপর অগাধ আস্থা আর জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মাইক হাতে নিয়ে উপস্থিত উদ্দাম জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বল্লেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসেবে

আপনাদের আমি একটা কথাই বলতে চাই, আপনারা আমাদের সন্মানিত অতিথি। আমার ছেলেরা আপনাদের আমন্ত্রন করে সসন্মানে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি আশা করবো, আপনারা এমন আচরণ করবেন, যাতে আমার ছেলেরা আপনাদের মত সন্মানিত অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা করার সুযোগটুকু পায়। এই সংগীতানুষ্ঠান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব। এখনও অনেক স্বনামধন্য শিল্পী তাঁদের অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় রয়েছেন। আশা করবো আপনারা শান্ত হবেন, আসুন আপনাদের মর্য্যাদার সংগে সামঞ্জস্য রেখেই, আমরা আপনাদের মর্য্যাদা রক্ষা করি!" চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলাম একজন ঋষিতুল্য অধ্যাপক-প্রশাশক এবং এক বিপর্যয় রোধে তাঁর প্রশাশনিক দক্ষতার ম্যাজিক। প্যান্ডেলজোড়া কোলাহল শান্ত হল। এই হলেন আমাদের পরমারাধ্য অভিবাবক ডাঃ ত্রিগুণা সেন।

Dr. Triguna Sen and freedom fighters.

Alok Chakraborty

[Alok has been one of our most dear friends. The present article is reprinted form his Memoir Diary on our Friend, Philosopher and Friend. Dr. Triguna Sen, as a token of homage to our dear friend Alok.

- *Dipak]*

Note: In the write-up, TS indicates Dr.Triguna Sen.

TS had always been a true patriot and also an ardent freedom-fighter by heart, actively and passively. This was evident in many of his administrative activities of JU. He used to carry highest concern and regards towards the freedom fighters even after the independence of our country and even during his stint in the Central Ministry. An example - once I (Alok) got a letter from TS expressing his desire that he would like to visit Rishikesh for 3 days. His stay was arranged in our Guest House. TS was accompanied by Swami Prakashananda of Ma Anandamoyee ashram. Their mission of visit was to confirm a news report of death of one Ms. Bina Bhowmick (Das), the ardent freedom fighter., as this very name had been haunting him. He came all the way to Rishikesh, in spite of his very busy schedule, only to find out whether she was the same Bina Das, who fought with them for the independence of our country. He was shocked profoundly to know that the same freedom-fighter Ms. Bina Das did pass away. Such was his ardent passion for the freedom-fighters.

Comments on this section

Pranab Mukherjee:

ড: ত্রিগুণা সেনের সম্পর্কে যত বলা যায় মনে হয় কিছুই বলা হলনা - এতো বড় মাপের মানুষ। আমরা সত্যিই ধুব ভাগ্যবান ওনার সান্নিধ্যে এসে। আশ্চর্য স্মরনশক্তি। যাদবপুর থেকে পাশ করার বছর চারেক পরে সস্ত্রীক বেনারস বেড়াতে গিয়ে স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম যখন উনি বেনারস হিন্দু উনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর। ওনার সস্নেহ আলিন্গন ও আশীর্বাদ ভুলবনা।
আর তথনই স্যারের সন্গে কথোপকথনে মনে হয়েছিল উনি আধ্যাত্ম-বাদে খুব মনোনিবেশ করেছেন বা করতে যচ্ছেন।

Prafulla Roy:

- খুব সুন্দর লাগল প্রিয় ঋষি ডঃ ত্রিগুণা সেনের কথা পড়ে। উনি শেষ বয়সে মা আনন্দময়ীর শিষ্য হন।
  আর যাদবপুরের বিশ্বকর্মা পুজো, Blue earth workshop, গিরীণদা - সব চোখের সামনে ভেসে উঠল। কি এক নষ্টালজিয়া।
  সবাই কে বলছি যার যা মনে পড়ছে সব লিখে জানাও। আমি সবকিছুই কপি পেষ্ট করে আমার ফেসবুকের পাতায় দেব। যেখানে আমার বন্ধুরা পড়ে খুব খুসি হয়। তোমাদের নামগুলো ভাল করে লিখে দিও।

- খুব ভাল লাগছে সবার স্মৃতিচারণ। লিখে যাও। উপভোগ করছি। সত্যেনদার ক্যান্টিন ছিল ল্যাব, হোমওয়ার্ক, ড্রয়িং টোকাটুকির ফ্যাক্টরি। আমি হষ্টেলে থাকতাম। তবু কিছু বন্ধুদের জন্য যেতে হ'ত।
  সেসব কথা মনে পড়ে।
  অধ্যাপক হেমগুহ র আপাত গম্ভীর মুখের ভিতর একটি স্নেহের ফল্গু দেখার সুযোগ হয়েছিল। সব জানাব।

Our Jadavpur days

Dipak Sengupta

আবার যাদবপুর, হ্যাঁ স্বর্ণযুগের যাদবপুর।

PART - 1

In 2nd year, we used to have a subject, known as 'Principles of Electrical Engineering'. Our teacher had been Prof. Mriganka Mohan Kar, popularly known as Ma Ma Kar. To some of us, the subject appeared to be abstract and the principled lecture on Principles of Electrical Engineering of Ma Ma Kar was generating unprincipled 'funda' in our brain. As a relief, therefore we thought of planting a comic-relief valve in one of Ma Ma Kar's classes. It was customary, in the beginning of the class, attendance of the students used to be noted by Sir Ma Ma Kar through the process of monotonous roll-call and he used to tick the presence of the students, without lifting his head.

Our stream-mate Subimal had had the habit of inserting both of his hands inside both of his pant-pockets and scratching his groins, seemingly deriving pleasure out of this act. We were five friends, with ingenious brain-wave, having a brilliant idea to deal with this habit of Subimal, the idea of the relief-valve.
We five thought Prof. Ma Ma Kar's class would be the ideal platform to plant the comic-relieve valve and commission the pilot project.

It was one such class of Prof. Ma Ma Kar. As usual, Sir was taking the roll-call. Synchronised act of Subimali's reflective habit and the particular moment of Ma Ma Kar's roll call-exercise for Roll No. 96 (Subimali's roll no. was 96), was thought to be the opportune moment to execute our plan.The process went like this:

Ma Ma Kar, '90!' 'Yes Sir', Came the reply.

Ma Ma kar did not lift his head, '91! 'Present Sir'. A shout from a student.

'92!' - Present please.

'93!' - Present Sir.

Ma Ma Kar, '96!' - "Dhole Sir!",
Collective response from at least 5 voices. The resonant frequency of the collective thud from so many students reverberated the lecture room.

This time Ma Ma Kar looked up and shouted again, "Roll 96!"

Subimal stood up, but there wss simultaneous chorous "Dhole Sir," once again the decibel level, due to resonant frequency of the high-pitched response, went beyond the tolerance level of Ma Ma Kar.

Ma Ma Kar was more astonished than annoyed, asked in stern and admonishing voice "What is this 'Dhole Sir' business?"

Our leader waited for this opportunity. From one of the back benches, in gentle steps, he marched straight up to our Sir and showed him a small container of ointment, "স্যার,এটাই ঢোল।'
Utterly astononished,
Sir was burning in rage.
Sir, "তোমরা কি ঠাট্টা করছো আমার সাথে? ঢোল কি জিনিস?"
Our leader, looking at Subimal, "ঐ যে সুবিমল!"
Sir became furious" কি? সুবিমল!ঢোল! আমি আমি আমি কি তোমাদের ঠাট্টার পাত্র?" Sir was so furious that he uttered the word 'আমি' thrice.

Most innocently and innocuously our leader replied, "আমরা স্যার চাঁদা তুলে সাড়ে ছ আনা দিয়ে ট্রেনের হকারের থেকে দাদের মলম কিনে এনেছি, স্যার, এটা আমরা আপনার হাত দিয়ে সুবিমলকে present করতে চাই। এটাতে সুবিমলের প্যান্টের পকেটগুলো তাড়াতাড়ি ফুটো হবে না, আর ওর হাতও বেশী নোংরা হবে না।"

Subimal in anger became violent, our Sir in rage burnt and whole class turned into a loud laughter.

However, the outcome of our treatment was very effective in Subimal , since the container-induced shock-producing high voltage DC current prevented Subimal from his further act of frequent scratching from inside of his pant-pockets.

Note : For obvious reason, the name of our friend is a fictitious one.

PART - 2

আমার স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু তাহলে যাদবপুরের প্রাণপুরুষদের হৃদয়ের উপলবদ্ধিতে আনতে কিছু বাকী থেকে যেতো।
আমরা দলে ছিলাম পাঁচজন, অমর, তপন (ঘোষ) প্রভাত, সন্দীপ আর আমি দীপক। আমাদের নামে সোজাসুজি complaint চলে গেল একেবারে খোদ রেক্টরের কাছে। আরও দুটো ক্লাশের পর আমাদের পাঁচ জনের ডাক পড়ল। ভয়ে আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। আমরা পাঁচজন কেউ কারোর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। কম্পিত পায়ে কাঁপুনি-ধরা বক্ষে উৎসর্গীকৃত ছাগশিশুর মত আমরা ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে রেক্টরের ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখি রেক্টর ডাঃ ত্রিগুণা সেনের পাশের চেয়ারেই বসে আছেন আমাদের প্রভোষ্ট স্যার গোপাল সেন। যদি আমাদের পায়ের তলায় ধরণী দ্বিধা হ'ত, আমরা বোধহয় বেঁচে যেতাম। ডাঃ সেন পাশে বসা গোপাল বাবুকে বল্লেন, "তোমার এ সব ছেলেদের ভাল করে

চিনে রাখ।" তারপর ফিরলেন আমাদের দিকে। মোটা চশমার কাঁচ ভেদ করে দুই স্যারের দুজোড়া মর্মভেদী চোখ যেন আমাদের আপাদমস্তক জরিপ করছে। আমাদের হাঁটুতে হাঁটুতে কম্পনের আওয়াজ নিজেদেরই কর্ণগোচর হচ্ছে। থম্ থম্ করা মুখ থেকে নির্গত জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমাদের একেবারে সম্বিত-হারা করে দিল। ডাঃ সেন তাঁর রায় ঘোষণা করলেন, "তোমরা কলেজের শৃঙখলা ভঙ্গ করেছ। তোমাদের একবছরের জন্য suspend করা হল। তোমাদের নাম, ইয়ার, রোল্ নম্বর লিখে রেখে যাও। কালকে প্রথম পিরিয়ডের সময়ে এসে তোমাদের suspension order নিয়ে যেও।" স্যার এবার গোপাল বাবুর দিকে ফিরলেন, "তোমার department থেকে না হয় একবার পাঁচজন engineer কম বেরোবে।" আমরা বাহ্যজ্ঞান রহিত, চোখ ভরা জল আর বুক ভরা শূন্যতা নিয়ে রেক্টরের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমরা সব day scholar ছিলাম। এর পর আমরা কি করে নিজের নিজের বাড়িতে ফিরলাম, কি করে দুঃস্বপ্নের রাত কাটালাম আর কি করে পরের দিন সময়মত কলেজে এলাম, আজ আর সে কথা মনে পড়ে না বা করতে চাই না। আমরা ফাঁসির আসামী, দন্ডাজ্ঞা তো নিতে হবেই। বুকে পাথর চেপে আমরা স্যারের ঘরে ঢুকলাম। আবার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। "এই যে তোমরা, বাড়ীতে জানিয়েছ তো তোমাদের শাস্তির কথা?" সেই বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর, "নাও, তোমাদের Suspension Order পড়ে নাও, তারপর সই করে recieve করে নাও।" বজ্র-নির্ঘোষ আদেশ। ঝড়ের সময় গাছে যেমন কাঁপুনি আসে, আমাদের হাতে পায়ে তার থেকেও বেশী কম্পন, ঠক ঠক করা হাত দিয়ে আমরা শাস্তির আদেশ-নামা খুললাম। এ কি, এ? অনেক বড় বিস্ময়, ক্ষণিকের জন্য চোখে অন্ধকার, আমাদের অশ্রুর বাঁধের উৎস ভেঙে চুরমার। চোখের জলে বুক ভিজলো। আমাদের শাস্তিনামায় লেখা ছিল, প্রতিটি লাইন মনে নেই, তবে ভাবার্থটা অনেকটা এই রকম

Jadavpur fraternity respects each one's self ego, protect yours and others'. Keep the fraternity flag flying up. You all are proud member of one family. Promise me good conduct here-after and you are excused.

চোখ তুলে তাকাবার অবস্থায় আমার কেউ ছিলাম না। আমরা বোধহয় সজ্ঞানেই ছিলাম না। হঠাৎ কানে এলো, যেন কত দূর থেকে শুনতে পেলাম, স্যার বল্লেন, "যাও, গোপাল বাবুর কাছে, তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও।"

অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল আমাদের স্থির পদক্ষেপে স্যারের দরজায় পৌঁছাতে। আমরা পাঁচজন দুরু দুরু বক্ষে গোপাল বাবুর কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ালাম। স্যার গম্ভীর মুখ তুলে আমাদের তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। যা বলে ছিলেন, তার মর্মার্থ অনেকটা যেন ছিল, "লজ্জা করে না তোমাদের, সবার সামনে এমন কি ক্লাশে স্যারের সামনে নিজেদের বন্ধুকে এ ভাবে ছোট করতে? পেছনে লাগা এক জিনিষ, আর এভাবে নিজেদের বন্ধুকে অপমান করা আরেক জিনিষ। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একবছরের suspension এর ভয়াভয়তা, এক রাতেই মর্মে মর্মে টের পেলে তো? যাও, যাকে অপমান করেছিলে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ক্লাশে যাও। No suspension, তোমাদের কেবল মাত্র ভয় দেখানো হয়েছিল। যাও এখন।" জড়বৎ হতবুদ্ধি আমরা কোনমতে স্যারকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। ভাবছিলাম একি স্বপ্ন, না কি সত্যি!

এই আমাদের গুরু, এই আমাদের শ্রদ্ধেও প্রণম্য গুরুকুল, এই আমাদের গর্ব্বের, আমাদের স্বপ্নের যাদবপুর, এই আমাদের যাদবপুরের শিক্ষা। আমরা ভুলিনি, ভুলতে পারিনা।

যাদবপুরের পতাকা বহন করেই চলেছি।

Comments on above:

Dipendu : এই লেখা মর্ম স্পর্শী। এর তুলনা নেই । আমরা সত্যি ভাগ্যবান । Our teachers, Provost, Rector, all were believers in students' brotherhood, bonding, trust , faith and respect for each other. Three cheers and a big salute to you for sharing this.

Ashish : সত্যি অপূর্ব। এরকম কত ঘটনা জড়িয়ে আছে আমাদের যাদবপুরে জীবনে। তুই কি সুন্দর ভাবে এক একটা ফুল তুলে আনছিস অনায়াসে।।

Prasun : YOUR MEMORIES, FROM "SWARNO JUGER JADAVPUR",PART 1 & 2" DARUN DARUN !! AMAR 1ST YR E DU BAR RESPECTED PROVOST SIR GOPAL SEN ER OFFICE THEKEY TOLOB ASHEY FOR DISCIPLINARY ACTION. AREK BAR 2ND YR E HOSTEL SUPER SIR ŕJ C SARKAR HOSTEL ROOM E ESHEY !! SAI INCIDENTS O EXP PART 3, POREY LIKHBO. BECHARA SUBIMAL !!

প্রিয় স্যারেরা

Friends, Philosophers and Guides

Remembering our dear Prof. from Chem Engg.

Prof. Dilip Kumar Dutt
Kalyan Kumar Das

Late Prof. Dutt was born on 1.9.1920 in Kolkata. After graduating in science from Presidency College, Kolkata. He obtained his bachelor Degree in Chemical Engineering from NCE Bengal (Jadavpur University) in 1943 and joined NCE Bengal as Lecturer. In 1948, he obtained M.S. Degree from Carnegie Institute of Technology, U.S.A. and served the alma mater for years. Prof. Dutt nurtured the dept. as Head for 20 years and retired from services in 1985 man of startling moral Principles and popular teacher, Prof Dutt dedicated his life in teaching, research and related activities in Chemical Engineering education in India. He was one of greatest teachers that Jadavpur University has ever produced. He left for heavenly abode 17.8.2011 at the age of 91 years.

A few instances of his helping the students - Once Alok Chakrabarty 63'B.Ch.E. met him in his house in late '80s and mentioned to him that he would be visiting Orient Paper Mills for some official work. He immediately told that he knew Mr. Sripati Mishra (Sr. V.P) quite well and gave Alok a letter for Mr. Mishra. Mr. Mishra was very courteous and arranged for Alok's visit in the Plant and stay in their guest house,

Our friend Chandan Mukherjee '63 B.Ch.E, once met Prof Dutt and told him that he has left his cosy job at National Test House and joined Godrej Soaps in Calcutta. He was extremely happy and enquired about the new assignment. When told that that he was posted in their Marketing Dept. Prof Dutt screamed - "Tumi sheshe Pheriwala hoye gele" (তুমি শেষে ফেরিওয়ালা হ'য়ে গেলে!). To him, being a true Engineer meant working In the Plant or R&D.

Later, Chandan was engaged in erecting a Vegetable Oil Project in early eighties. At this time Prof. Dutt was extremely helpful to him being virtually honorary consultant. He never did mind Chandan's ignorance of the subject at times and extended his best advice and guidance. Finally, the Plant got erected and produced refined edible oils.

These were some of the instances when this Professional, gentle colossus quietly helped his students in their service-life.

Prof. N.K. Bose
Kalyan Kumar Das

Reminiscence of a great Teacher
Prof. N K Bose (Niras Kumar Bose), a great teacher of Chemical Engineering Deptt. He used to teach Chemical Process Principles, one of the fundamental subjects in Chemistry Engg. This is basic of Chemical Engg
and one of the toughest one. Prof. Bose taught this subject so lucidly and amiably that everyone in the class was spellbound and virtually there was no absenteeism in his class. He taught us in First Year but we kept contact throughout our CET carrier.

Rightly he was rewarded to establish Chemical Engineer. Dept in Calcutta University which he most successfully implemented.
To commemorate his contribution in field of Chemical Engineering, Calcutta Regional Center of Indian Institute of Chemical Engineers organises Annual Memorial Lectures.
All of us of Chemical Engineering Dept. are highly indebted to him.
Sasraddha Pronam.

Remembering our dear Prof. from Mech Engg.

Prof. Bibhu Charan Mukherjee

Aloke Ganguly

Having undertaken a journey down memory lane to reach our treasure-house of '63 era to pick up few gems to share with all.

Professor Bibhu C. Mukherjee was unique in many ways including his impeccable drawings on black boards, sectional as well as isometric, and fluent elucidation of machine design, I.C. engine and theories hydraulic machines. But he was also known for his unusual take on several other things. For example, on one occasion, he delivered his judgment on an A0 size assembly drawing of a final year project that both the design and drawing were good but the centre line of the huge assembly drawing ought to be shifted by half an inch, since the presentation was not symmetrical. The concerned student almost fainted. However, a smart friend of his suggested trimming the drawing sheet by half an inch from the other side to restore symmetry, to the satisfaction of Bibhu Babu.

On another occasion Bibhu Babu was taking a class on the top floor of Aurobindo Building when a marriage procession with bands, gongs and a whole host of musical instruments started slowly moving along the Station Road, raising the decibel level beyond tolerance. Bibhu Babu stopped his lecture and started pacing up and down impatiently till the cacophony subsided.

A flippant student remarked: What heavenly music, Sir! Pat came the rejoinder, "Indeed. But it is heavenly, only when it stops."

Once a number of final-year mechanical engg. students approached Professor Gopal Sen to register a protest against the whims of Bibhu Babu, Professor Sen summarily dismissed them. His advice was that they would turn out to be successful engineers in life, if only they could copy Bibhu Babu's gait and style of walking. What Professor Sen meant, was obviously that Bibhu Babu was every inch a hard core, pragmatic engineer.

Sometimes even today I close my eyes and see that fleeting image with Grecian features and hear the distant staccato of leather sole, pounding the corridors of our alma mater in measured steps. Not many that I know of, could command that awe and respect.

প্রিয় স্যার বিভু চরণ মুখার্জী

দীপক সেনগুপ্ত

[1]

মানস, বিভুবাবু স্যার বোর্ডে ড্রয়িং করছিলেন লিখেছো, সে সব ড্রয়িং তো engg. সংক্রান্ত, pipe line, pressure gradient বা velocity gradient etc. Bernoullis' theorem এর application কে চাক্ষুস করাবার জন্য। প্রসঙ্গত Cine Club এর film এর কথাও তো লিখলে।

আর এতেই মনে পড়ল B.C.M কে নিয়ে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা। বিভুবাবু একদিন আমাদের design class এ বল্লেন, "মনে রেখো free-hand drawing টাও খুব important, তাতে proportion জ্ঞান বাড়ে, দেখ", এই বলে তিনি যা করলেন, তা মনে করে আজও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। তিনি board এর দিকে সম্পুর্ণ পিছন ফিরে অর্থাৎ সামনে আমাদের দিকে মুখ করে, হাতে চক্ নিয়ে ডান হাত টাকে পেছনে নিলেন, আর সেই postureএই board এ একটা single line sketch আঁকলেন। আমরা boardএ দেখলাম শ্মশ্রুসম্বলিত রবীন্দ্রনাথের মুখের একটি নিখুঁত contour.

কাল নিরবধি, জীবন বহমান, তবুও আমাদের মনের মণিকোঠায় 'কালের কপোলতলে" আজও অম্লান Prof. B.C.M এর ধ্যান-গম্ভীর মুখ খানি, যাঁর পরিধানে পাটভাঙা সাদা প্যান্ট আর সাদা বুশসার্ট আর ঈশৎ বিষণ্ন উদাস দুটি চোখে বহুদূর প্রসারিত দৃষ্টি।

[2]

স্মৃতিতে বিভু বাবুর IC Engine এর একটি ক্লাশ। বিভু বাবুর দুর থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসা খট্ .. খট্ .. খট্ জুতোর আওয়াজ, immaculate dressing code - শীতকালে সাদা শার্টের ওপর কালো স্যুট, গলায় single knot Tie, পোষাক সব প্রতিদিন পাটভাঙা, ঋষি তুল্য গম্ভীর মুখ মন্ডল, অপূর্ব ইংরাজী বাচনভঙ্গী, এ সমস্তই আমাদের, মানে ছাত্রদের মনে এক মন্ত্রের মুগ্ধতা আনত। অর্ধ্ব শতাব্দী বেশী পার করে আসার পরও, আমাদের মনের মধ্যে বিভু বাবু আজও শুভ্র সমুজ্জ্বল।

স্যার Differential বোঝাচ্ছেন। বিভু বাবুর একটা বিশেষত্ব - তিনি ক্লাশে ইংরাজীতে লেকচার দিতেন। ইংরাজী ভাষা কত সুন্দর, তা আমরা বুঝতে শিখলাম তাঁর প্রতিটি ক্লাশ-লেকচারে, with his eloquent speaking with choicest words.

সেদিন শুরু করলেন, "My dear students, to-day I will take you to Differential. But before I talk about Differential, let me tell why Differential. It is of prime importance to know, why Differential! 'Why Differential' এ একটু জোর দিলেন। একটু থেমে, বোর্ডের দিকে ফিরলেন। এর পর তিনি free hand এ প্রায় ৫০০ মি. মি ডায়া'র একটা circle আঁকলেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, খালি হাতে একটা নিখুঁত বৃত্ত। কম্পাসে আঁকা বৃত্তের সাথে কোন তফাৎ নেই। আর তার পাশে সমান্তরাল ভাবে প্রায় ৩০০ মি. মি ডায়া'র আরেকটি concentric circle. দুটো Centre line আঁকলেন। খালি হাতে আঁকা, মনে হয়, ডান হাতেই drawing instruments সব set করা আছে। নিখুঁত straight line আর circle। এবার তিনি আমাদের দিকে ফিরে বল্লেন, "See, I have drawn a ring and now, on this ring I shall be placing a Car, with 4 of its wheels on the ring." এই কথা বলে তিনি গাড়ির একটা নিখুঁত isometric আঁকলেন, যার চাকা চারটি ঠিক circular ring এর ওপর place করা। এবার আবার ফিরলেন আমাদের দিকে, বলতে থাকলেন, "Now suppose, the Car is moving along this ring. কখনও ডানহাত খানি পেছনে board এ drawing এর ওপর, আবার প্রয়োজন মত সামনে, বলতে থাকলেন, so to say, the Car is negotiating a circular track and, in the process, the car has made a complete rotation. Now, consider the circumference of the outer and inner ring. Obviously, the outer ring has a bigger circumference than the inner one. Hence, you see, the outer wheels, which move along the outer ring, traverse a greater distance, equalling to the length of the bigger circumference, than the inner wheels, which move through the distance, equalling to the

circumference of the inner ring. You see, differential distances have been covered by the outer wheel and inner wheel in the same time, and hence, velocity being the function of time, the necessity of Differential in a car."
আমরা মন্ত্রমুগ্ধ, চোখের সামনে দেখতে পেলাম গাড়িটি যখন বৃত্তাকারে ছুটছে, বাইরের চাকার আর ভেতরের চাকা আলাদা গতি নিয়ে চলছে।
এই ছিল বিভু-বাবু-যাদু, যাঁর চলন, বলন, কথন এবং বাচনভঙ্গী এখনও আমাদের মনে হীরের দ্যুতির ঝলক আনে।

হে অতীত, তুমি কথা কও, কথা কও, কোন কথা কভু হারাও নি তুমি, সব তুমি তুলে লও, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও।

Remembering B.C.M
Biswajit Das

Remember BCM was explaining turbine runner and was drawing on blackboard the runner in isometric view with multicolour chalk. He described as how water flow moves the runner and converts potential energy to kinetic energy with very high efficiency and that runner when coupled with generator produces electricity. The basic of Hydroelectric power.
That is etched in my memory and that made me to decide my next part of life. Between offers of Indian Rly, Indian Army, Border Road Organisation and Jaldhaka Hydro Electric Power Project, I grabbed the last one and my life changed. In Roorkee when I was doing my Post Graduation in Hydro Power, image of Bibhu Sir came to my mind when I prepared and submitted my Project paper. World renowned Civil and Hydropower Professors Dr Jai Krishna and Dr Bharat Singh while interviewing me asked who guided me to write the Report? I narrated BMC. They told me that it will be kept in Library for reference and Guidance of research work. I was elated but did pranam to Bibhu Sir by dedicating his name in my project paper to him. Pranam again to BCM Sir.

Remembering Prof. B.C. Mukherjee
Manas Banerjee

Jadavpur Professor Bibhu Charan Mukherjee (BCM) class cholche. Bernoulli's equation/ theorem porachhen. Amra montro mugdho hoye sunchi. Ki sundor explain korchen. Mukhe bole jachhen abar drawing kore dekhachhen. Hothat theme gelen. Bollen tomra keu Cine club er member? Kal ekta film dekhlam khub bhalo laglo. Keu hoyto ei bisoye kichu bolechilo amar mone nei. Tarporei abar bollen write down. Bolar somoy kothay full stop dite hobe setao bollen. Ekta problem dictate korlen. Poroborti kale ami ME thesis ebong PhD thesis Hydraulics er oporei korechilam onar obodan er oporei vitty kore. Onake amar onek shroddha janai.

প্রণাম ডাঃ রজত চক্রবর্ত্তী
দীপক সেনগুপ্ত

ওরে প্রফুল্ল, তুই এ কি সর্ব্বনাশ করলি আমার। আমি আর কত স্মৃতির ঝাপি নিয়ে বসি!
আমাদের আরেকজন শিক্ষক-গুরুর কথা মনে পড়ছে - ডাঃ রজত কুমার চক্রবর্ত্তী। আমাদের যাদবপুর জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আমরা মেক্যানিকালরা, নিজের নিজের careerএ যে যেখানে পৌঁছেছিলাম, তার অন্যতম কারিগর আমাদের অতি প্রিয় Dr. R.K.C. মানে রজত বাবু, এ কথা আমরা যদুবংশীরা অত্যন্ত গর্ব্বের সংগে স্বীকার করি। আমাদের engineering জীবনের পথ চলার যে technicality আর technique, তাতে বিভু বাবু ঢেলেছেন romanticism আর রজত বাবু মিশিয়েছেন rhythm.
আমাদের সৌভাগ্য ছিল দুটো নীরস subject এর প্রফেসর হিসেবে রজত বাবুকে পাওয়া - Theory of Machines আর Technical Dynamics. রজত বাবু আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে খুলতে লাগলেন Mechanism আর Machine elements এর মহাকাব্যকে। conceptualisation থেকে শুরু করে machine elements এর ভেতরে ঢুকে, তাদের মধ্যেকার বিভিন্ন force, stress, তিনটে planeএ সেই সমস্ত stressএর resolution, action, পারস্পরিক সম্পর্ক - এই জটিল ব্যাপারগুলো রজত বাবু যেন ছবির মত করে এঁকে ফোটাতে লাগলেন আমাদের চোখের সামনে। abstract modern art নয়, portrait এর মত পরিচিত ও সহজে চিনতে পারার মত করে একটা জগত তৈরী করতে থাকলেন সব যন্ত্রাংশের ভেতরকার নাট্, বল্টু, রিভেট, বিয়ারিং আর বিভিন্ন গীয়ারের কলাকৌশল নিয়ে। আমরা শিখলাম rigid body র অনুগল্প, inversion of Mechanism এর গল্প, axial force আর shear force এর কবিতা, torsion আর torque এর প্রেম কাহিনী, bending moment আর bending stress এর সৌহার্দ্য, এমনই আরও কত কি! shear stress, bending stress, distribution of bending stress along neutral axis, neutral axis আর centre of gravity র তফাৎ, oblique plane এ force distribution এ সমস্ত আর আমাদের ভয় দেখাতে পারলো না। আর এই আপাত নীরস বিষয়গুলোকে উপস্থাপনার নৈপুণ্যে, কথায় কথায় উদাহরণ আর metaphor এর প্রয়োগ-কুশলতায়, কথার সরসতায় আর সদা-প্রফুল্ল হাস্যমুখে, Dr. R.K.C আমাদের সামনে বিষয়-জটিলতার গভীরে ঢোকার প্রবেশ-দরজা উন্মুক্ত করে দিতেন। আমার সৌভাগ্য, engineering এর ছাত্র হয়ে ঢোকার স্বর্ণ-জয়ন্তীতে আরেকবার নতুন করে রজত বাবুর সঙ্গ পাবার আর তাঁর পদপ্রান্তে মাথা নত করার সুযোগ পাবার জন্য রাজত বাবুর নিজের হিসেবে তখন তিনি ৯৪ অতিক্রান্ত। কিন্তু সেই ঋজু একহারা চেহারা, চশমার ফাঁকে সেই বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু বয়সের ভারে ঈষৎ ক্লান্ত দুটি চোখ, মুখে সেই মৃদু হাসি। কোমরের হাড়ের dislocation এর জন্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। আমাদের স্বর্ণ-জয়ন্তীর উৎসব উজ্জাপিত হয়েছিল NCE, Bengal এর ইন্দুমতী সভাগৃহে। রজত বাবু সেদিন সভাগৃহের ভিতর পনের মিনিটেরও বেশী সময় দাঁড়িয়ে থেকে, তাঁর সমস্ত পুরোণ ছাত্রদের একে একে পরিচয় নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলেন।
বুঝি অনুমানে, তোমরা bore হচ্ছ। আর বেশি লিখব না। নিজের মধ্যেও তাড়াতাড়ি শেষ করার তাগিদ আসছে। বলছিলাম রজত বাবুর metaphor এর যাদু। সম্ভবত ২০১২ সালের কথা। আমি তখন কলকাতার একটা Engineering Company তে Consultant হিসেবে কাজ করছি। আমাদের স্বর্ণজয়ন্তী উৎসবের পরে রজত বাবুর সংগে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলাম। এই রকম এক সময়ে, আমাদের Company র একটা Technical problem নিয়ে ল্যাজে গোবরে হচ্ছিলাম। একটা Heavy Machinery সাপ্লাই করা হয়েছিল Bokaro Steel Plant এ। এই mobile Machine টির সঠিক অপারেশনে সমস্যা হচ্ছিল। মনে হ'চ্ছিল, এ সমস্যার একটা সহজ সমাধান রয়েছে, কিন্তু সমাধানটি অধরাই থেকে যাচ্ছিল। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, সমস্যাটা নিয়ে রজত বাবুর দ্বারস্থ হই। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। ফোনে রজত বাবুকে সমস্যাটির কথা খুলে বল্লাম। রজত বাবু মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। শুনে তিনি

হেসে বল্লেন, "দীপক, আমার বয়স কত হয়েছে জানো? ৯৬ পার করলাম। আমি সেই কবেই yield point cross করে plastic deformationও পার করে এসেছি, breaking point এ পৌঁছাবার অপেক্ষায়। এই সব solution tolution তো elastic zone এ যারা আছে, তাদের জন্য। কি বলি, বলত!" সত্যিই তো, আমরাই তো এখন চিন্তায় স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছি, পিতৃস্থানীয় শিক্ষকের কাছে এখনও Technical Consultancy চাইলাম! যাই হোক, বুঝলাম কথার যাদুতে,, রসের যোগানে আর technical metaphor এর ব্যাবহারে রজত বাবু তখনও অত্বিতীয়। কি অবলীলায় তিনি Elasticity র theory বোঝালেন! কিন্তু আমার পক্ষে এই বয়সে আরেকবার technical সমস্যার কথা বলে রজত বাবুকে বিব্রত করা মোটেই ঠিক হয় নি। কিন্তু না, আমাদের ওপর রজত বাবুর আশীর্বাদ তখনও নিঃশেষ হয় নি। পরের দিন রজত বাবু আমাকে বিস্ময়ে অভিভুত করে, নিজেই ফোন করলেন। বল্লেন, "তোমার সমস্যার এ রকম একটা সমাধান মাথায় এল, চেষ্টা করে দেখো।" সমাধানটা একটু বুঝিয়ে দিলেন।
বলা বাহুল্য, সেই সমাধানের সূত্র ধরেই আমার Company সেদিন Bokaro Steel Plant জয় করেছিল। এর পরে রজত বাবু আর বেশি দিন আমাদের মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে এখনও তাঁর নিত্য আসা যাওয়া।
আজ আমার স্মৃতির মালায় গাঁথা ভালবাসা আর শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁকে নিবেদন করে ধন্য হলাম।

Compliments to Dr. Rajat Chakroborty
Dipendu Raha

দীপক, তোমরা ভাগ্যবান, এরকম এক অসাধারণ ব্যাক্তির সান্নিধ্য কতদিন পেয়েছ । 50 বছরেরও বেশি দেশছাড়া এই অভাগাদের সেই সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ কোথায়? Last দেখলাম, Golden Jubilee তে। কি স্নেহভরা চোখে তাকালেন যখন প্রণাম করলাম । আমার জীবনে যতজনের সান্নিধ্যে এসেছি, রজত স্যার, RKC ই সবার ঊর্ধ্বে। ইন্দ্র (ME 63) lucky, He along with Shibu (ME 63) was able to see him just days before he passed away. I was planning to go along with Indra; however, it didn't materialize.

Homage to Prof. Madhusudhnan Sen Gupta
Dipak Sengupta

স্মৃতি 'বয়ে চলে যায়'
'ছোট্ট আমার পানসি তরী, বয়ে চলে যায়,
সঙ্গে কে কে যাবি আয়।'

বন্ধু প্রফুল্ল আমায় বইয়েই দিল। আমি এখনও বয়ে চলেছি, আমি যাদবপুরাক্রান্ত।
আজ আসর আলো করে আমাদের Mechanism এর শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মধূ সুদন সেনগুপ্ত এবং তাঁর কিছু মধুর বচন। অসম্ভব ভাল এবং ছাত্রদরদী এই শিক্ষক, আমাদের যত না শিক্ষক, তার চেয়ে বেশী ছিলেন বন্ধু। তাঁর ফেলে আসা দেশ পূর্ব্ববঙ্গ, মাঝে মধ্যে স্যার আমাদের ক্লাশে পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা অবলীলায় ব্যাবহার করতেন।
স্মৃতি এখনও অমলিন। ঈষৎ ভারী শরীর, চোখের কোলদুটি ফোলা ফোলা, সম্ভ্রম উদ্রেককারী রাশভারি চেহারার গঠন, স্যার ক্লাশে ঢুকলেই আমাদের মনটা খুশীতে ভরে উঠতো।

গল্পের ছলে তিনি আমাদের Rigid body র definition পড়ালেন, আমরা শুনলাম, আমরা আক্ষরিক অর্থেই পড়াশুনা করলাম। 'হাতের কনুই থেকে তোমার আঙুলের ডগা পর্যন্ত মাপো,, মাপটা note করো। এবার একটা পাটকেল নাও। পাটকেল বোঝ? কথায় আছে না ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়! সেই আর কি?" রসিকতায় নিজেই হাসলেন, তারপর বল্লেন 'ঢিলের বদলে পাটকেলও নিতে পারো, তবে যাই নাও, সেটাকে শক্ত সুতো দিয়ে বাঁধো। এবার, তোমার কনুই কে center করে, সুতোয় বাঁধা পাটকেলটি মাথার ওপরে ঘোরাও। অনুভব কর তোমার হাতের কনুই একটা centrifugal force তৈরী করছে, আর তোমার আঙুল দিয়ে কনুই পর্যন্ত একটা centripetal acceleration আসছে। অর্থাৎ, তোমার হাতের মধ্যেই Force এর আনাগোনা চলছে। এইবার থামো। হাত থেকে পাটকেলটা নামাও। হাত সোজা করে আরেকবার কনুই থেকে আঙুলের ডগার মাপ নাও। দেখবে, আগের মাপ আর এখনকার মাপ -- দুটোই সমান। এখন আমি যদি বলি তোমার কনুই থেকে একেবারে সোজা করে রাখা আঙুলের ডগা একটা rigid body, তাহলে তোমরাই বল rigid body র definition কি হল!" তিনি বোঝালেন, "ধর ঘড়ির কাঁটা। চিন্তা কর, কাঁটা যতই ঘুরুক, কাঁটার মধ্যে যে কোন দুটো বিন্দু সব সময় সম দূরত্বেই থাকবে। তাই ঘড়ির কাঁটা হইল একটা rigid body। বোজ্জো?"
এ ভাবেই আমরা Rigid body কে চিনতে শিখলাম।
Mechanism কাকে বলে বোঝাতে গিয়ে বল্লেন, "Mechanism হ'ল কয়েকটা rigid link এর assembly, যেখানে link গুলো এমন ভাবে নিজেদের মধ্যে connect করা থাকে যে একটা link অন্য linkকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে বা slide করতে পারে। এখন মনে কর তুমি যে কোনও একটি link এর মধ্যে গতির সঞ্চার করলে, ধর না হয় rotational গতিই দিলে, তাহলে সেই গতি অন্য link গুলোতে একরকম constrained আর predictable গতির সৃষ্টি করবে, এটাই হল Mechanism." Board এ এঁকে বোঝালেন Slider Crank Mechanism। আর এই Slider Crank Mechanism এর রহস্য আর এই সূত্র ধরে বোঝালেন degree of freedom কি বস্তু, ছাত্র জীবনে 1st degree of freefom এর বাইরে যেতে নিষেধ করলেন। এমনই বড় মাপের শিক্ষক, যিনি এ ভাবেই জীবনকে কারিগরি বিদ্যার সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন। কি অনায়াস ছিল তাঁর পাঠন-কৌশল।

আমাদের পড়ানো হল Inversion of Mechanism কি বোঝায়। যে কোন একটা link কে fix করে, বাকী তিনটে link এর চলন কেমন হয়, এই link গুলোর কি কি নাম, যেমন একটি হল Crank, অন্য দুটো হল Connecting Rod আর Coupler, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা জানলাম 4 bar linkage কেন? Reciprocating motion থেকে Rotating motion, যেমন গাড়ির Cylinder থেকে Worm Shaft এ অথবা Locomotive এর Cylinder থেকে Wheel এ, আর তার উল্টটাও অর্থাৎ Rotating motion থেকে Reciprocating motion, যেমন Pump আর Hydraulic Jackএ, ইত্যাদি আপাতদৃষ্ট automation আর কি! আমরা শিখলাম Quick Return Mechanism এর রহস্য, Slotted Bar আর Slider block এর সংমিশ্রনে ধীর গতিতে Working Stroke আর পরবর্ত্তীতে, গতি অনেকটা বাড়িয়ে Return Stroke।

থাক, তত্ত্ব দিয়ে স্মৃতি-চিত্রন আর ভারী করবো না। শুধু পরিশেষের কথা বলি, আক্ষরিক অর্থেই স্যারের ক্লাশে আমরা তন্ময় হ'য়ে পড়া-শুনা করতাম। অর্থাৎ 'পড়া' এবং 'শুনা', তিনি পড়াতেন আর আমরা শুনতাম। তিনি পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় বলতেন, "তোমরা তো মেক্যানীকাল ইঞ্জিনীয়র হইবা, নতুন নতুন প্রডাক্ট তৈরী করার দায়িত্বে থাকবা। মনে রাখবা, প্রডাক্ট তৈরী করার দুইটা stage আছে। প্রথমটা হইল design অনুযায়ী বাজার থিকা যাবতীয় প্রয়োজনীয় material কেনা, তারপর workshop এ গিয়া design অনুযায়ী একটা একটা কইরা component fabricate করা, nut, bolt, washer, ইত্যাদি গুছায়ে হাতের কাছে রাখা -- এই সব আর কি! আর দ্বিতীয় stageটি হইল, এই সমস্ত part গুলা ঠিকঠাক assembly, testing, commissioning ইত্যদির দ্বারা finished product এ পরিণত করা। প্রথম stage টি হইল 'raw

material' , যাকে বলিস তোরা 'কাঁচা মাল' আর দ্বিতীয়টি হইল 'finished product' যাকে বলিস 'তৈরী মাল'।" বলা বাহুল্য, ক্লাশে এরকম লেকচারে হাসির বন্যা বইত। স্যারও আমাদের সাথে মুখ টিপে হাসতেন। আমরা বুঝতাম এই রকম লেকচারই স্যারকে M.S.G থেকে 'মাল সেন'এ রূপান্তরিত করেছিল।

এবার বলবো, আমাদের বৃহত্তরে জীবনে প্রবেশের প্রাক্কালে M.S.Gর দুটি সুদূর-প্রসারী কর্মজীবনের সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত অতি মূল্যবান দুটি উপদেশ --- আজকের, আগামী দিনের এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রতি জনের চাকরী-জীবনের এক মহামূল্যবান জীবন-বেদ। এই দুটি তত্ত্বকথা আমার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল, বন্ধুবর কানাই দাস চৌধুরী '63 M আমাকে মনে করাল। ধন্যবাদ কানাই।

প্রথম উপদেশ :

Inclined plane এ কারোরে তেল দিবা না, কোন লাভ নাই। কাজে উন্নতির জন্য সর্ব্বদা boss এর flat horizontal plane এ তেল দিবা।

ত্বিতীয় উপদেশ :

মনে রাখবা Boss is always right. এর অন্যথা হইলেই তুমি গ্যাছো!

দীর্ঘ চাকরী জীবনে Sir এর এই দিক্-দর্শনকারী উপদেশ দুটি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি।

তাঁরই স্মৃতি দিয়ে গাঁথা মালা আজ তাঁকেই বিনম্র শ্রদ্ধায় অর্পণ করলাম।

Prof. Nirendra Nath Chaterjee and Prabhas De

1. Aloke Ganguly

[I]

NNC had been one of our the most popular and highly regarded teachers. The incidents, as they accrued more than half a century back, are recalled below with deep reverence to our friend, philosopher guide professor Nirendrs Nath Chakravorty. These down memory lane action-replays are presented only to catch up with some witty moments, we used to have in our college days and must not be misconstrued as arrempts of showing of any sign of obliquity or disrespect to our beloved Prof. NNC.

Professor Nirendra Nath Chatterjee (NCC) had two things in common with the then US Presidet John F. Kennedy. One was his towering height and the other, his brazenly nasal intonation. The latter was a source of entertainment to his students. In fact Debuda, after suffering from a nasal fracture in a hockey match, meticulously avoided any direct conversation with NNC, lest his distorted voice should be misconstrued as an intentional mimicry.

Thare was one Pranab Das, our dear friend, in mech engg., who was popularly known as 'Aristo', There is an alusion to this name as well. Whereas all of us were struggling to buy slide rules for Rs. 80 (remember calculator had not been born yet), Pranab happily got a gift of a dazzling Aristo slide rule from his maternal uncle, settled in UK, by clearing VPP charges of Rs. 5.50 only

This 'Aristo' had a couple of interesting interactions with NNC. In a design project, instead using compasses, he had joined vertical and horizontal lines by hand and the fillets did no blend properly. Predictably, NNC detected the slip with ease and asked for an explanation

'Aristo' meekly justified, সময় মত জমা দেবার জন্য fillet আর chamfering গুলো হাত দিয়ে এঁকেছি, স্যার।
NNC quipped: তাঁহলে বাঁকি ড্রয়িং কি পাঁ দিয়েঁ এঁকেছ?

On another occasion, this same 'Aristo' presented a design project to NNC. During viva voce, NNC pointed to a transmission shaft and asked, "Key কঁয় প্রকার?"
Aristo mentioned about sunk keys, feather keys, tangential keys, woodruff keys etc.
NNC interjected: "Woodruff keys ! বাঃ, where are they used?"
'Aristo' confidently replied that woodruff keys were used in woodworking.
NNC ridiculed, "তাঁহলে saddle key দিঁয়ে কি ঘোঁরায় চাঁপে?"

[II]
Our respected Sir, Sri Prabhas Dey
There was one Shri Prabhas De, popularly known as Pagla Dey, who used to conduct our practical classes in the old Machine Shop situated to the south of Blue Earth Shop. There were several stories about him doing the round those days. One such story runs as follows:

Pagla dey passed his engineering supposedly as a classmate of Dr. Satish Bhattacharya, joined some company as an apprentice. In that factory a generator was being run and though the ammeter showed appropriate readings, surprisingly, there was no output voltage. All the engineers assembled and various possible causes and suggestions were exchanged. Still there was no solution and although current was developed, there was no voltage which left everybody totally foxed. When things were about to be abandoned, Pagla Dey requested permission to look into the problem. He studied the situation and asked for an umbrella. When made available, he promptly held the umbrella open over the generator and lo and behold! the voltmeter promptly registered full voltage.
The chief engineer congratulated him and sought to know the secret. Triumphantly Pa gla Dey explained that flux was leaking into the atmosphere which he successfully cut off by shielding with an umbrella!

Epilogue

No wonder JU has produced a whole lot of very innovative engineers.

2. Manas Banerjee

Though Professor NNC didn't take any of our classes in Civil Engineering, he was a member of my PhD committee. During my viva, he and Professor BN Chanda asked me some critical questions based on my external examiner of USA. But I remember after my presentation and viva is over. Prof. NNC came forward and congratulated me.

শ্রদ্ধেও প্রফেসর গোপাল সেন

দীপক সেনগুপ্ত

অমর, অমর নাথ ভট্টাচার্য্য, আমাদের পাঁচ বন্ধুর অন্যতম বর্ণময় চরিত্র। সদা হাস্যময়, সুরসিক আর প্রাণবন্ত উচ্ছল অমর। অমরের ready with আর smartness এর পরিচয় আগের ঘটনাতে লিখেছি। আর এখন পরিচয় করিয়ে দেবো আরেকটা অমরের সাথে। এই অমরের কথা না জানালে ওর প্রতি আমার স্মৃতি তর্পণ শেষ হবে না। আজ স্মৃতিতর্পন দুটো পর্বে।

প্রথম পর্ব

আগেই বলেছি, মাঝে মাঝে আমাদের আড্ডার ভেনু কলকাতার বিভিন্ন রেষ্টোরাঁতে হত। বলদেব ছিল main sponsor, আর আমরাও পারলে আমাদের সাধ্যমত contribute করতাম। লক্ষ্য করা গেল অমরের কাছ থেকে গত বেশ কিছু আড্ডাতে কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। চেপে ধরাতে জানতে পারলাম, অমর নাকি প্রতিদিন কলেজে আসার পথে একজন জীর্ণ শীর্ণ, প্রায় খেতে না পাওয়া মানুষকে প্রতি দিনের পকেট খরচা দিয়ে টিফিন খাইয়ে, তারপর শিয়ালদার বাসে ওঠে, আর সে জন্য প্রতিদিনই ওকে বাড়ি থেকে মিনিট দশেক আগে বেরোতে হয়। সত্যিই একজন অজানা অচেনা দুঃস্থ লোকের জন্য প্রাণ-কাঁদা অমরের এ পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। প্রণোচ্ছল অমরের মধ্যে একটা কত বড় মন লুকিয়ে আছে, তার পরিচয় পেয়ে আমরা নতুন করে ওর প্রতি মুগ্ধ হলাম।

এর কিছুদিন পরে দেখলাম, অমরের মুখটা কেমন যেন শুকনো শুকনো। ওর উজ্জ্বল মুখের হাসিটাও আগের থেকে ম্লান। কি হল? অনেক চাপাচাপির পর, অমরের কাছ থেকে জানতে পারা গেল ওর সেই প্রভাতী- বন্ধুর TB হয়েছে। যার খাবার পয়সা নেই, তার কিনা রাজ-রোগ! গত দুদিন ধরেই তার নাকি জ্বর। লোকটি এণ্টালির কাছে কোন এক সর্দ্দারের গ্যারাজের একধারে রাতের আশ্রয় পেয়েছিল। ওর জ্বর আর কাশি দেখে,ওই সর্দ্দারজী তাঁর পরিচিত কোন ডাক্তারকে দিয়ে X-ray করায়, তাতেই টিবি ধরা পরে। এরপর সর্দ্দারজীও তাকে আর তার গ্যারাজে থাকতে দিতে নারাজ। আর সেটাই এখন অমরের চিন্তা। প্রণব বুদ্ধি দিল : চল্, আমরা গোপাল বাবুর কাছে যাই!

তা, যেমন ভাবা, তেমন কাজ। স্যারের কাছে যেতে যদিও আমাদের বুক কাঁপে, তবুও স্যারের ফ্রী টাইম দেখে, দরজায় টোকা দিয়ে আমরা স্যারের রুমে ঢুকেই গেলাম। স্যার আমাদের বিরাট মহীরুহ, তার ছায়াটুকু আমরা পাই, কড়া শাসনের আড়ালে ওই মোটা গ্লাসের ভেতর যে চোখদুটি, তার স্নেহের পরশও আমরা অনুভব করি, কিন্তু কাছাকাছি যাবার সাহস পাই নি কোন দিন। স্যার মুখ তুল্লেন, জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর, "কি চাই, ক্লাস নেই?"

একটু সামলে কথা বলতে গিয়েও বলদেব তোত্ লালো, "আ আ আছে স্যার। অমর আপনাকে একটা কথা বলতে চায়, স্যার।"

"অমরের কি মুখ নেই, introduction তোমার কেন?" স্যারের গলা নিরুত্তাপ।

বলদেবের ঠ্যালা খেয়ে অমরের যেন সম্বিত ফিরল। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে অমর রিহার্সাল দেওয়া কথাগুলো বলেই ফেল্ল।

কিছুক্ষণ তাঁর হিমশিতল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পর্যায়ক্রমে আমাদের দিকে নিবদ্ধ হল। তাঁর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হল। গলা আরও কঠোর। তারপর মন্দ্রসপ্তকে তিনি বল্লেন, "ও, এই জন্য তোমরা ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে আমার কাছে এসেছ! যাও, ক্লাশে যাও।'

স্যারের রুম থেকে আমরা বেরিয়ে বাঁচি। অমর তো বেরিয়েই হম্বিতম্বি, " বলেছিলাম না, স্যারের কাছে এ ব্যাপারে কিছু লাভ হবে না? মানলি না আমার কথা! চল্, এখন ক্লাশে চল্।"

দ্বিতীয় পর্ব

পরের দিন টিফিন টাইমে বলদেব আর অমরের ডাক পড়ল গোপাল বাবুর ঘরে। আমরা ভয়ে কাঁটা। গতকাল স্যারের ঘরে বলদেব আর অমরই মুখ খুলেছিল। তাই শাস্তির খড়্গ বেছে বেছে ওদের দুজনের ওপরেই? সাজা ঘোষণার আগেই ওদের মুখ চুন। আজ্ঞাবাহী ওরা দুজনে এগিয়ে গেল, মনে হ'লো ওদের পা-দুজোড়া ওদের বশে নেই। বাকী আমরা তিনজন চুপ করে বসে রইলাম। কতক্ষণ? জানিনা। ওরা ফিরলো। কিন্তু এ কি! ওদের মুখের হাসিই যেন বলে দিল আমাদের সমস্ত আশঙ্কা ভুল, যদিও ওরা গম্ভীর থাকার চেষ্টা করছে। আমাদের আর উৎকণ্ঠায় না রেখে কিছুক্ষণ পরে বলদেবই মুখ খুল্ল। বল্ল, "স্যার আগামী কাল সকাল ১০টায় TB Hospital এ গিয়ে স্যারের নাম করে Dr. Sil এর সঙ্গে দেখা করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। স্বপ্নবাক স্যার এর বেশি কিছু বল্লেন না। ও হ্যাঁ, স্যার আরও বলেছেন এরপর ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন রাখতে হবে, এমন কি স্যারের সাথেও এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলা যাবে না।" আমরা গোনীয়তা রক্ষার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।
K.S. Roy TB Hospital ঢোকার গেট স্টেশন রোডের বাঁ দিকে, আমাদের university gate এর কিছুটা আগে। পরদিন আগের ট্রেনে যাদবপুর পৌঁছে ঠিক সকাল ১০ টায় ডাঃ শীলের সাথে দেখা করা হল। উনি প্রথমেই বল্লেন, "আমি গোপাল স্যারের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, ওঁর কথা আমার কাছে বেদবাক্য, আজ আমি যা, এ সব ওনারই জন্য। তোমাদের সব রকম সাহায্য করার নির্দ্দেশ আমার ওপর, বল, তোমাদের কি সমস্যা?" সব শোনার পর উনি বল্লেন, "Patient কে না দেখে তো, আমি কিছু বলতে পারবো না। তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে Patient কে ভর্ত্তি করতে হতে পারে। তাতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। আমার আণ্ডারে ২ টো ফ্রী বেড আছে, তার একটা গতকালই খালি হয়েছে। সে রকম হ'লে, আমি ভর্ত্তি করেই নেব না হয়!" বেড ফ্রী হলে কি হবে, ভর্ত্তি হতে এবং তারপর আনুসংগিক চিকিৎসার খরচা যে অনেক? আমরা স্বভাবতই শংকিত। কিন্তু না, একজন অদৃশ্য নেপথ্যাচারীর আশীর্ব্বাদী হাত আমাদের মাথার ওপর। ডাঃ শীল চিকিৎসার খরচের ব্যাপারে আমাদের আশংকার কথা শুনে বল্লেন যে ওটা আমাদের চিন্তার ব্যাপারই নয়। সব দায়িত্ব এ ব্যাপারে ডাঃ শীলের। এখন আমাদের কর্তব্য শুধু পরদিন বেলা ১১টা নাগাদ রুগিকে নিয়ে আসা।
পরের দিন যথা সময়ে অমর আর বলদেব ট্যাক্সি করে এন্টালী থেকে যাদবপুরে patient কে নিয়ে আসে, ট্যাক্সি- ভাড়া অবশ্যই কেয়ার অফ বলদেব। আর আশংকা মতই রোগীকে ভর্ত্তি করে নেওয়া হল।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। অমর মাঝে মঝে patient কে দেখতে যেত। কিন্তু আয়ু তার ফুরিয়েছিল। দীর্ঘ দিনের অনাহারে আর অপুষ্টিতে তার প্রাণশক্তির কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। একদিন সকালেই অমর খবর দিল তার প্রভাতী-বন্ধু সেদিন প্রভাতেই বিদায় নিয়েছে।

আমার কথা।

আমার ঘটনার দুটো পর্ব্বের দুজন নায়ক।
প্রথম ঘটনার নায়ক অবিসংবাদিত ভাবে আমাদের প্রিয় বন্ধু অমর। শুধু প্রাণোময় উচ্ছল, আর প্রবল witty ই নয়, অমর ছিল আমাদের মন ভাল করার instant recipe, ছিল মেধাবী আর serious. আর এ সবের মোড়কে অমর সযত্নে রেখে দিয়েছিল একটা সোনায় বাঁধানো সংবেদনশীল মন। এ ব্যাপারে অমরের যে সব নানা ঘটনার কথা ঘনিষ্ঠভাবে জানি, তার মধ্যে শুধু একটাই লিখলাম, এর বাইরেও আমরা দেখেছি কত দুস্থ অনাথ নিরন্ন মানুষকে অমর সাধ্য মত বা অনেক সময় সাধ্যের বাইরে গিয়েও কি ভাবে আড়ালে থেকে নীরবে সাহায্য করে গেছে!
আজ অনেক বছর হল, অমর অমরলোকবাসী।
কিন্তু অন্যের কষ্টে ঝাপিয়ে পড়া অমর, তার জীবনের প্রায় শেষ লগ্নে খুবই কষ্টে পড়েছিল।

আমরা যাদবপুর, সৌভাতৃত্বের শিক্ষা আমাদের। অমরের ব্যাথার সাথী আমরা হতে পেরেছিলাম। সহপাঠী বন্ধুরা আমরা, ব্যাচ নির্ব্বিশেষে সবাই, অমরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা শুধু সহপাঠীই নই, আমরা সমব্যাথীও, এটাই যাদবপুরের শিক্ষা, এ আমাদের স্বর্ণযুগের যাদবপুর। এ স্মৃতি আমাদের সুখস্মৃতি।

দ্বিতীয় পর্ব্বের নায়ক নিঃসন্দেহে আমাদের শ্রদ্ধেও স্যার, গোপাল বাবু, একজন সুজন, সল্পবাক,সুশিক্ষক। গাম্ভীর্য্যের আড়ালে এক নিঃশব্দ ছাত্রদরদী মহান ঋষি, পাদপ্রদীপের আলো থেকে স্বযত্নে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা, শিক্ষণ এবং প্রশাসন, সব বিভাগেই উৎকর্ষতার প্রতীক। তাঁর আলোয় আলোকিত অনেক ছাত্রই আজ পৃথিবীর নানা প্রান্তে আলো ছড়াচ্ছেন। ছাত্র হিসাবে আমরা তাঁর স্নেহচ্ছায়া অনুভব করেছি। আর একবার, মাত্র একবারই আমরা পাঁচজন তাঁর গাম্ভীর্য্যের খোলসের আড়ালে মানবদরদী মানুষ গোপাল সেনকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলাম। যে কথা গর্ব করে গলা ফাটিয়ে সবাইকে বলার মত, তখন গোপনীয়তার শপথে আমাদের পাঁচজনের বাইরে আর কারোর সাথে সে কথা ভাগ করে নিতে পারিনি, এখন আর সে শপথ রাখার দায় আমার নেই। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে অমর নেই, তপন নেই, বলদেবও সম্ভবত নেই, আর প্রণব থেকেও নেই। এখন আমার একার পক্ষে এ শপথ বয়ে নিয়ে যাবার মত শক্তিও নেই। তাই আজ এ স্মৃতি সবার সাথে ভাগ করলাম।
গোপাল বাবুর স্মৃতি আমাদের কেবলমাত্র গর্বের নয়, গোপাল বাবুর হত্যার ঘটনাও গোটা যাদবপুর-ছাত্রসমাজের এক কলঙ্কজনক স্মৃতি। চোখের জলে মনে প্রশ্ন জাগে, তাঁর কি এ ধরণের পরিণতির কোন প্রয়োজন ছিল?
প্রণমি তোমায়, হে মহান ঋষি, আজ আমরা অবনত মস্তকে বিনীত, ক্ষমাপ্রার্থী। তুমি ক্ষমাশীল মহান ঋষি, ক্ষমা কর, আমাদের তর্পণ গ্রহন কর।

Remembering our dear Prof. from Elec. Engg.

Prof. Hem Chandra Guha – As we saw him

Barun Kr. De

Professor Hem Chandra Guha was popularly known as "Guha Sahib" in the Jadavpur University Campus and amongst Alumnus. The dhoti-kurta clad person resembles a perfectly respectable aristocratic Bengalee gentleman in appearance distinguished by his discipline, habit, communication skill and smartness with that of an orthodox British national.

When we joined the University in the summer of 1959 our innocent, immature young minds wanted to see more the Chair of our own Electrical Engineering Department. At that time Guha Sahib was also the Dean of Engineering & Technology of the University. He was, however, more accessible to us as Dean than as Chair of the Department of Electrical Engineering. He was a handsome, reserved, firm and well mannered executive.

From 5th semester till 8th Semester, we came into direct contact with Guha Sahib. During this time he taught us subjects like Electric Power Transmission, Electric Power Distribution and special paper on Switchgear and Protective Devices. Guha Sahib's class lectures on Electric Power Transmission became most interesting with the problem sum taken from real life case study in the drawing of 66KV overhead line from Warangal. In the last semester, Prof. Guha taught us the subject titled Switchgear and Protective Devices.

During this time Guha Sahib's behavioural pattern towards the students seemingly changed from an authoritative administrator to an emotional, loving and caring elderly guardian trying to give a final shape to our career. An example would suffice to understand his emotion and loving care towards the students. Byomkesh Chakraborty (now deceased) was slapped by Prof. Guha in the classroom for not being able to solve a problem. Byomkesh was terribly depressed and frustrated and vowed not to come to college any more. Prof. Guha observed his absence for next two/three days, asked his friends about the reason for absence but failed to gather any information. Thereafter he walked up to KMR's office, collected Byomkesh's address, rushed to home to find out what went wrong. Prof. Guha unconditionally apologised for his behaviour and could pursue Byomkesh to come to the college from the next day. Such was the fatherly figure, Prof. Guha.

Today, more than five decades later engineering graduates of 1963-64 pass outs are paying a timely respect to our dear Prof. H.C. Guha.

It is my firm belief that Guha sahib silently altered our attitude, inculcated discipline and leadership quality amongst us besides reinforcing our morale and character. These traits helped us to serve our society since last 50 years. Guha Sahib is continuously renewed through us.

একজন দরদী মানুষের স্মৃতিচারণ, প্র. হেম চন্দ্র গুহ -- সত্যিকারের বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-প্রদর্শক

শেখর বসু

ছেষট্টিতে যাদবপুরে পড়তে এসে পাঁচ বছরে অনেক বড় মানুষদের দেখেছি যাঁরা শুধু অধ্যাপণায় নন, আপাত গাম্ভীর্যতার আড়ালে এক ছাত্র দরদী মানুষের পরিচয় দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। তেমনি একজনের আজ স্মৃতিচারণ করছি, অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ এবং তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। আমরা যখন পড়ি সে সময়টা খুব অশান্ত ছিল। খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি, যুক্তফ্রন্ট ইত্যাদি নিয়ে বেশ টালমাটাল অবস্থা। গুহ সাহেব তখন উপাচার্য। য়ুনিভার্সিটিতে প্রায়ই গন্ডগোল লেগে থাকত, সে ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে হোক বা বাইরের লোকের সঙ্গে ছাত্রদের ভেতর থেকে। মুহুর্মুহু বোমা পড়ছে, বাইরে পুলিশ এসেছে তারা ভেতরে ঢুকতে চায়। এইসব ক্ষেত্রে সবসময় দেখেছি গুহ সাহেবকে অকুতোভয়ে সামনে এগিয়ে যেতে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে। কোনো অবস্থাতেই কখনও পুলিশকে ভেতরে ঢুকতে দেন নি।

গুহ সাহেব ইলেকট্রিকাল বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন, সেখান থেকে উপাচার্য হন। ছাত্রদের সবসময় ভালো রেফারেন্স টাইপের বই পড়তে বলতেন। আমাদের তখন ইলেকট্রিকাল পাঠ্যে 'থেরেজা' সাথী যা উনি পছন্দ করতেন না। খেলা ধুলাতেও খুব উৎসাহ দিতেন। শুনেছিলাম জিম করার জন্যে টাকা চাইলে কখনও ফেরাতেন না। চাইতেন পড়াশুনার সাথে সাথে যেন ছেলেরা ব্যায়াম করে এবং শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখে।

এবার গুহ সাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতার কথা বলে শেষ করবো। প্রথম বছর প্রথম সেমিস্টারে দুটো সাপ্লি পেয়েছিলাম, পড়াশুনো না করলে যা হয়। এখনকার কথা জানিনা, তখন সাপ্লির পরীক্ষা হতো গরমের ছুটিতে। কোনো কারণে সেবার পরীক্ষার ফী ঠিক সময়ে দিতে পারিনি, ডেট চলে গেছে। যখন ফী জমা দিতে গেলাম কিছুতে নেয় না। এখন উপায় ? অনেক কাকুতি মিনতির পর জানলাম উপাচার্য যদি সম্মতি দেন তবেই একমাত্র ফী জমা দেয়া যাবে। গুহ সাহেব তখন গ্রাউন্ড ফ্লোরে উইংসের দিকে বসতেন। গেলাম ওঁর ঘরে। তখন অত কড়াকড়ি ছিলনা আর ছুটির জন্য ভিড়ও কম ছিল। উনি পুরো শুনলেন তারপর বললেন চিফ কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশনের কাছে যেতে।

এখন মনে নেই চিফ কন্ট্রোলার কে ছিলেন, কিন্তু আমি যেতেই তিনি মার্ মার্ করে ভাগিয়ে দিলেন। কিছু বলার নেই, একে ফেল করেছি তারপর ফীও সময়মতো দেই নি, গালাগাল তো খাবই। এদিকে আমার তো সঙ্গিন অবস্থা। দুটো সাপ্লি থাকলে ইয়ার লস হবে, সেই সঙ্গে বন্ধ হবে লোন স্কলারশিপ এবং আমার পড়াও। তখন বয়সও কম, দস্তুরমতো কাঁদছি। এই অবস্থায় আবার গুহ সাহেবের ঘরে গেলাম। উনি আমায় দেখে আর কোনো কথা নয়, কাগজটা নিলেন আর সাইন করে দিলেন। আজ সত্তর বছরে পৌঁছে যখন ফিরে দেখি, তখন এনাদের মহানুভবতায় সত্যিই আপ্লুত হই|

অনেক বছর পরে গড়িয়াহাটে একবার বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরছিলাম তখন গুহ সাহেবকে রাস্তায় দেখি। তেমনি টান টান ঋজু চেহারা, ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরনে। আমরা প্রণাম করাতে খুশি হলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। দুঃখ হয়, আজকালকার দিনে ছাত্র মাস্টারমশাইদের এরকম সম্পর্ক বোধহয় আর নেই, বিশেষত আমাদের প্রিয় যাদবপুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

Remembering our dear Prof. from Civil Engg.

Prof. Karunamoy Roy

Abhin Chatterjee

I first saw Prof. Karunamay Roy, head of the Deptt. of Civil Engineering at Jadavpur in our days at the time of my admission interview there in the year 1959. His sharp features and very bright eyes behind specs, attracted me. As civil Engg Course was my first preference he asked me most of the questions, not too tough, during the interview and I got through. We had our first brush with him only a few days after commencement of our First Year Session when one day all of us were called in his chamber and each given a large-sized yellow Report Card. He told us that these cards, duly filled in, would contain our Progress Reports from First to Fourth year of our Academic Records and the Reports in totality will be taken into consideration
assessments in the Final year. We were stirred a bit!

Prof. Roy did not take any of our classes in the first & Second year - but we could always feel his silent presence around us. With the large Drawing Hall and a Lecture Theatre nearly adjacent to his chamber in the first floor of the Civil Building, students would dare not to make noise or raise a row even if a Professor would be sometimes late in arriving in the class. A silent cold stare from him would be sufficient to still the boys - such was his personality.

He taught us Design of Structures (Paper I & II) in our 3rd & 4th year. He also guided us directly in our Design Practicals i.e. Sessional Classes in those two years. He would often set for us unconventional innovative Project assignments - which used to be of much importance in the Practical field. He taught us in the 3rd year the graphical method of solving a Design Problem for a Masonry structure which was an interesting and easier alternative and quite useful in the practical field. We took this lession to heart for application in future. The trend of solving unconventional, innovative Project Assignments continued in our Final year too.

What was his method of Teaching in the Theoretical classes? Simply original, unconventional and innovative. He would not directly recommend any specific Book by any particular Author-or, for that matter, any Indian Author. He preferred Books by Foreign Authors or Experts. He would advise us to collect some such Books, make deep study and prepare your own notes to tackle problems. He did not prefer to dictate "notes" or distribute "cyclostyled" notes in the class as he thought that easy availability of ready-made notes" amounted to "Spoon Feeding" and an impediment to development of "Independent Thought Process". He preferred that the students should have a probing mind and they themselves should find out best solutions. We had to intensely follow his class-lectures, which were very rich and invaluable and simultaneously take down the notes - which was a bit difficult. Again, during the lectures, he would often draw large sized sketches showing details of the proposed construction and we too had to make out quick copies! The nice, detailed sketches, as he would draw in the class room would not be so easily available in the standard Books in Market.

Simultaneously with his class-lectures he would often teach us the Intricacies of Professional Practice in Civil Engg. A tough man having tougher expression, he used to say that in Civil Engg., "Theory follows practice", hence the importance of quick learning of Professional Practice. He advised us to pick up quickly after joining the Professional work the varied aspects of Professional Practice and Construction Techniques as followed in field by experienced workmen - again like a student and without any ego.These advices still hold good. Linked up with Professional Practice and Construction Techniques are three more very important aspects viz (1) Preparation of clear, legible drawings & sketches to communicate with the working personnels in field (2) Adoption of suitable Factors of Safety and (3) Adoption of Codes

Drawing is the, "Engineers' Language" often he would say and so he insisted that every Civil Engineer must learn to prepare clear, legible detailed drawings & sketches to communicate and got the desired work done at the construction site. Even for answering structural Design Problems in Examinations his advice to students was not to waste time and energy in obtaining a high degree of accuracy in calculations, but to present instead within the answer, neat legible sketch showing the details of Proposals, typical of Prof. Roy.

As for Adoption of "Factors of Safety" in Design, he would say "Factors of Safety" are nothing but Factors of the union Parameters or our ignorance, so to say. He would say in the Domain of Construction so many Factors remaining unknown all through the Design, Construction with Quality Control in Construction, also there being lack of high standards of quality control in Construction, a Designer could hardly adopt a lesser value of Factor of Safety. Lesser values of Factor of Safety could only be adopted after ensuring and achieving High Degrees of Quality Control.

As to use of codes of Practice, Prof. Roy used to say that Codes are northing but the assorted fruits of experience of learned veteran Engineers collected together in concise form. Before using the codes as Tools, the students must learn "Design" first & that is of fundamental Importance.

Prif. Roy came to Jadavpur University form B.E College Shibpur to take charge of the budding Civil Engg Department of JU and to nurture and build it up to strength. He took great pain to fulfil that mission.

Student friendly or not? Leaving aside the debate, one thing was sure, Prof. Roy was very proud of the Civil Engg Deptt under him in Jadavpur University and often used to say, "Boys Securing a First Class here would be able to secure the same in any university".

Admittedly Prof. Roy was not at all a popular student friendly sir and always maintaining a very strict disciplinarian stature which resulted in the Civil Engg. products from JU in his time to be acclaimed all throughout the state and abroad.

প্রফেসর পিযুষ কান্তি সোম
Manas Bandyopadhay

Jadavpurer golden days er smriticharon korchi. Haan sei Professor Pijush Kanti Som. London University theke M.Sc Engineering kore esechilen amader Structural Engineering porate.
He was an excellent English-speaking person and was a great orator. After BCM, he was my second respected professor. I remembered the first day of his class in C-2-7. He entered the class and welcomed us with excellent voice and superb english vocabulary. Then he stopped for some time. There was pindrop silence in the class. When talked after this pause, he uttered a golden line, which is framed in my mind in platinum even today, as permanent memory,
'If you go with me, I will go with you, if you go without me I will go without you and if you go against me I will go against you.'
Pindrop silence in the class.

Ashoke Sharma Sir
দীপক সেনগুপ্ত

বন্ধুরা, আবার যাদবপুর
যাদবপুর-বেলার অসংখ্য স্মৃতি আমার মনের খোলা গবাক্ষপথে ধীরে তার শরীরি-রূপে বল্গাহীন ভাবে একেবারে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ছে। আমি যাদবপুর-স্মৃতি আক্রান্ত। তার থেকে দুটো স্মৃতি ছেঁকে বার করি!

আমাদের মেক্যানিকাল ছাত্রদের প্রথম বর্ষে একটা Survey জাতীয় Civil Engg. এর ক্লাশ করতে হত। ক্লাশ হত Civil Engineering এর বিল্ডিং এ। আমাদের ক্লাশ নিতেন Ashoke Sharma Sir. খুব স্মার্ট, ইয়ং আর সুদর্শন স্যার। প্রথম দিনের ক্লাশ শুরু হল। স্যার এসেই বল্লেন,
"Good morning my dear Brothers." Brothers কথাটা খুব জোর দিয়েই বল্লেন, "Yes, you all are my brothers. Pl accept me as one of your new friends. Now let me introduce myself. I am a '57 (যতদূর মনে পড়ে) batch Civil Engineering graduate from IIT, Kharagpur. My name is Ashoke Sharma, initials AS. One request my dear brothers. Please do not put another 'S' after my initials. I will be very sad, if you make me ASS from AS. ব্যাস, এক্কেবারে Center of percussion এ হিট্ করা silly mid-off এর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া সোজা বিশাল এই ছক্কা। আমাদের ছাত্রজীবনে A.S ছিলেন instant hit. শুনেছিলাম, আশোক শর্মা স্যারের অকাল মৃত্যু হয়েছিল। খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু এ খবরের কোন confirmation আমার নেই। তোমরা কি কেউ বলতে পারো?

সিভিল স্মৃতি
আশিস দাশশর্মা

Civil Engg. এর অশোক শর্মা খুব পপুলার ছিলেন সব ছাত্রদের মধ্যে। আমরা Suvey করেছি ওনার কাছে।
আর এক বিভীষিকা ছিলেন সিভিল এর HOD. নামটা মনে করতে পারছি না। মানস বা কেউ বলে দেবে?
Dipak answers: Prof Karuna Roy

প্র. করুণা রায়
আশিস দাশশর্মা

হ্যাঁ করুণা রায়। পরীক্ষার সময় খুব জ্বালাতেন। একেবারে sniffer dog এর মত হলে ঘুরে বেড়াতেন। সিভিল ডিপার্টমেন্টের উপরে ছিল টেলিকম ডিপার্টমেন্ট। পরীক্ষার সময় সিভিলে মোটামুটি তান্ডব করে উপরে আসতেন আমাদের attack করতে। আমরা তখন Black board cryptography ভাই শিখে গেছি। বোর্ডের অসংখ্য লেখার মাঝে কিছু equation / circuit diagram এমন করে লিখে রাখা হত যেটা যে লিখেছে সে ছাড়া আর কেউ decode করতে পারতনা। Prof. K. S Roy হলে ঢুকে প্রথমেই বোর্ডটা মুছে দিতেন। হলের মধ্যে তখন প্রায় হাহাকার। শহিদুল আনসারের চাপা গলা " যাঃ শালা, সব গেল!" এর পরেই বগলের তলা থেকে বেরোতো একগাদা খাতা পত্তর। বাথরুম থেকে সংগৃহীত। এবার প্রত্যেকের seat এর কাছে গিয়ে খাতার সংগে হাতের লেখা মেলানোর দুঃসাহসিক অভিযান। এই সব কি দুঃসহ তা যারা ভুক্তভোগী তারাই জানত। পরীক্ষার পর শাহিদুলের কাকুতি মিনতি "কিছু একটা করতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে আমার আর ইন্জীনিয়ার হওয়ার কোনো চান্স নেই।"
উপায় একটা অবশেষে বেরোলো।
Set square এর উপর কিছু লিখে রাখার টেকনিক খুব পুরোনো। আমরাও কয়েক জন তাই করলাম। পরদিন একই ঘটনা। Prof. Roy ঝড়ের মত ঢুকলেন। বোর্ডের লেখা মুছলেন। তারপর সংগৃহীত খাতা বগলে বাঘের মত এগিয়ে এলেন প্রথমেই আমার দিকে। দূর থেকে দেখেছেন set Square এ কিছু লেখা। একেবারে হীরে সংগ্রহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সেট Square তুললেন। কি লেখা আছে দেখতে গিয়ে ঝট করে নামিয়ে রেখে সোজা হলের বাইরে।
আমারটায় লখা ছিল "তেরি প্যারি সুরথ কো কিসিকা নজর না লাগে!"

On Prof. K.K. Roy
Manas Banerjee

Yes Dipak, Jadavpur er smriti. 3rd year class cholche C-2-7 e. Professor Karunamoy Ray er class. Sob chup chap. Haate ekta jhatar kati. Bojachhen reinforced concrete. Bollen ektu moida mekhe soru kore pakie duhaater angul diye soja kore rakhte paro. Chokh gulo boro boro kore amader dike takie bollen paro ki ? Jothariti na bollam. Ebar bollen ei jhatar kathita or moddhye dhukie dao. Dekho soja hoye ache. Kintu keno. Ei holo suru. Tarpor aar theme thakenni. Ektu deri kore class e asten. Kintu baire thekei lecture dite dite dhukten. Dukhei ekjonke prosno korten ebong tar barota bajaten. Amake hotath ekdin dhukei jiges korechilen, what is Ballisticmeter ? Ebong janina bolate ki ki sunte hoyechilo ami aar mone rakhini. Tobe teacher hisabe London Universityr BSc(Engg.) onobodyo. Aaj taake shroddhar sange saran kori.

Remembering our dear Prof. from TeleCom. Engg.

Prof. Jnan Saran Chatterjee - As we knew him

A pupil of Prof. Chatterjee

Prof. J. S. Chatterjee was the founder of the Telecommunication Engineering department in Jadavpur University in the year 1957. Prior to that, it was only an optional subject under Electrical Engineering course. Rector Dr. Trignna Sen realised that TCE is going to govern the future world, hence on consultation with the most renowned Professor of radio Physics in Calcutta University Dr. Sisir Mitra, appointed trusted and brilliant Dr. J. S. Chatterjee to take charge of the proposed TCE department with the responsibility of designing the curriculum for study. Dr. J. S. promptly obliged by bringing in new contemporary ideas like inclusion of computer study in the syllabus.

Brilliance of his may be revealed from the fact that his Ph. D. thesis was the shortest ever, only of 28 pages. He was a specialist of "Antena Technology", advisor and consultant to many corporate industries, he possessed many a patent on this. Medical Electronics in particular was benefitted from his advice and he was the first person in this state to establish Tele Medicine link between two government hospitals situated quite apart a distance, Gandhi Memorial (speciality) Hospital at Kalyani (Nadia) and SSKM (super speciality) Hospital at Kolkata up and running a full-fledged.

Remembering our dear Prof. from CAS

Memoir on Prof. Pradeep Neogi
Manas Banerjee

Jadavpurer smriti. Ist year er Maths 1 or 2 r class cholche. Porachhen young Prodip Kumar Neogi (PN). Calculus korie jachhen. Sotyoi kichu bujhte parchi na. Emon somoy pechon theke ekti gobotser dak bhese elo. Sokolei ektu bhabito holam. Sir pichoner dike takalen. Kichu na bole abar differentiation suru korlen. Kintu abar sei aoaj. Uni bollen ke korcho, keno korcho. Ekjon darie bollo kichui bujhgi na Sir. Amra calculas bhalo janina. Tahole class e bose disturb korona. Mon diye sono. Eibar kintu oi dak besh bhalo korei suru holo ebong mone holo du charte dakche. Uni class theke berie gelen. Ei ghatonar sesh ta tomra biswas korte parbe na. Ami exame bhalo korte parini. Bolechilen Manas bhalo kore class koro. Noyto jibone kichui hobe na. Bolechilam yes Sir korbo. Bhalo kore Calculus korchi. Pore obosyo bhalo result korechilam. Tarpor oner songe aar dekha hoyni. 1985 e ami IIT Kharagpur e direct Professor er post e join kori with two increaments more than I expected. Pore sunechilam je amar interview was outstanding. Amar sange various department er Asst. Professor o Professor hoyeche. Jai hok. Amar onek senior amar theke junior hoye gelo. Er jonyo amake initially kichu kotha sunte hoyechilo. Ei bar asol ghatanay asa jak.

Ekdin ami seminar lecture dichhi on Mathematical model of river water quality. Onyo dept.theke faculty ra esechen. Hotat chokhe ekjon ke dekhe mone holo khub chena. Ke hote pare. Seminar seshe tea break e jiges korlam apnake khub chena lagche. Bollen Manas congratulations. Amio ekhane Professor in Maths.dept. Bujhte parlam PN sir. Bhebe dekho mone rekhechen tokhono.

Memoir on Prof. D N Mukherjee
Dipak Sengupta

মনে পড়ে যাদবপুরে সম্ভবত আমাদের 2nd year এ Engineering Mathematics অর্থাৎ Higher Calculas পড়াতে আসতেন CAS থেকে প্রবীণ স্যার, Prof. D.N.M। (পুরো নাম মনে নেই, কারোর মনে পড়লে, please বলে দিও) অগাধ পন্ডিত মানুষ, যতদূর মনে পড়ে Presidency র retired Professor, অত্যন্ত ভাল Sir. শুরু হল Differential Equation আর তার Mathematical Model। Sir ছিলেন প্রচন্ড witty, গোটা ক্লাশের সমস্ত ছাত্রদের একাগ্রতা তিনি যেন কোনও মন্ত্রের যাদুতে আদায় করে নিতেন। মজার মজার কথা বলে ছাত্রদের কাছে টানার কৌশল আর ছিল অনাবিল হাস্যরস আমদানি করা টান্ টান্ মসৃণ ভাবে বোঝাতেন : linear equation এ আমরা unknown number 'x' কে খুঁজে বার করি, কিন্ত Differential Equautionএ আমরা বার করি unknown function টাকে অর্থাৎ y = f(x) কে, যে function টা differential equation টাকে real number এর একটা interval এর মধ্যেকার সব অবস্থাতেই satisfy করবে। আজ এত যুগ পরে, এ সব কথা কেমন যেন ছায়া ছায়া মনে হয়। তবু যাদবপুর এবং Prof. D.N. Mukherjee আমাদের মাথার মধ্যে একটা সুন্দর সংস্কারের মত জড়িয়ে আছে। তাই যুগান্ত পার করেও আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কি নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট।
যাক, যা বলতে বসেছলাম, DNM প্রসঙ্গ। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঝকঝকে শানিত রসিকতা দিয়ে মেজাজী ঢঙে আমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের পুরো মনোযোগ সুতীক্ষ্ণ রাখতেন আর Exact-Non exact Differential

equation, Integrating factor, Bernoulli's Equation, Fourier Series, Euler's Theorem আর তার application -- Euler Angle এর 3 dimensional rotational Dynamics এর মত জটিল অধ্যায় গুলো সরস ভাষায় বোঝাতেন। যতদূর মনে পড়ে, Sir বলেছিলেন Fourier series হল Infinite series এর এক expansion of Integration of functions of Sines and Cosine, আর তার পর ক্রমে ক্রমে এলেন Euler সাহেব, তাঁর বিচিত্র Euler Angle আর তার তদীয় Application - Transpose Matrix নিয়ে। প্রথম প্রথম ভাবতাম Fourier সাহেব আমাদের দাঁত ভাঙছেন, Euler সাহেব আমাদের চোখের আলো কাড়ছেন। জানি না ক্লাশের ভাল ছেলেদের কথা, কিন্তু অন্তত আমরা কজন মনে মনে ভাবতাম এই পৃথিবীতে কেন Mr. Fourier, Mr. Euler রা জন্ম নিয়েছিলেন, তা কি আমাদের মত কোমলমতি কিশোরদের মাথাগুলো চিবিয়ে ভক্ষণ করার জন্য! কিন্তু না, Prof. DNM আমাদের মত ডুবন্ত ছাত্রদের সাতার শেখালেন, expert না হলেও ভেসে থাকার কৌশল শেখালেন। আমরাও সাফল্যের সাথেই অনেকটাই শিখলাম।
এবার আসি স্যারের wit আর humour এর কথায়। পাখী পড়ানো কৌশলের জন্যই হবে, তখন সোজা এবং পরিচিত কিংবা ঈশৎ কঠিন ও অপরিচিত function এর integration আর differentiation কি হবে, তা প্রায় নামতা পড়ার মত মুখে মুখে আমরা বলতে পারতাম। একটা সহজ উদাহরণ দেই! ধরা যাক একটা function হল f(x), আর
f(x) = 3x^2 + 4x +2, তা এ রকম একটা function এর
integration আর differentiation কি হবে?
Integration of f(x) = 6x^3/3 + 4x^2/2 + 2x + some constant. = 2x^3 + 2x^2+ 2x + C
আর Differentiation of f(x) = 6x+ 4

তা, স্যার একদিন ক্লাশে এ রকমই একটা Function, ধর উপরের Function টাই অর্থাৎ f(x) = 3x square + 4x +2 কে বোর্ডে লিখলেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে হঠাৎই জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্লাশের কেউ একজন বল তো এই Function টাকে integrate করা হলে, কি উত্তর পাবো?" smart অমর প্রায় সাথে সাথেই উত্তর দেবার জন্য হাত তুলে প্রস্তুত।
"ঠিক আছে, তুমিই বল!" স্যারের উক্তি
প্রায় বিজয়ীর ভঙ্গীতে অমর উত্তর দিল, "integration of f(x) = 6x + 4"
এ কী বল্ল? অমর ঠিক উল্টো উত্তরটা দিয়ে বসল!
পুরো ক্লাশে একটা যেন চাপা হাসির গুঞ্জন। স্যারও কিছুক্ষণ নির্ব্বাক। আর তারপর স্যারের সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক উক্তি, যা আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা -

"My dear student" স্যারের চোখ দুটি কৌতুকভরা চোখ, কিন্তু কণ্ঠ গম্ভীর, "তোমার উত্তর শুনে
Newton in rage will burn,
Einstein in grave will turn"

পুরো ক্লাসে তখন অবরুদ্ধ হাসির বাঁধভাঙা ফোয়ারা।

হে অতীত, কোন কথা কভু হারাও নি তুমি, সব তুমি তুলে লও, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও।

Further on DNM
Dipak Sengupta

DNM এর স্মৃতি-চিত্রনে বন্ধুবর কানাই (দাস চৌধুরী, মেক্যা) জানাল তার টুকরো স্মৃতি, DNM প্রসঙ্গে। সেই স্মৃতিটাকে আমি, দীপক আজ কথার মালা দিয়ে গাঁথলাম।

পরীক্ষার হলে DNM Sir ইনভিজিলেটর। পরীক্ষা শুরু হল। ইতিপূর্ব্বে রসিক DNM কে কোন পরীক্ষাতেই ইনভিজিলেটর রূপে পাই নি। ধরেই নেওয়া হ'য়েছিল এই হাস্যময় স্বভাবের রসিক মানুষটি, গার্ড হিসেবে খুব কড়া হবেন না। তাই ভাবা হয়েছিল পরীক্ষার হলে একটু আধটু স্বাধীনতা নেওয়া যেতেই পারে। স্যার পুরো হল একবার টহল দেবার পরে, তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন। ফোলিও ব্যাগের ভেতর থেকে একটি খবরের কাগজ বের করে নিবিষ্ট মনে পড়তে লাগলেন। পরীক্ষারত আমরা ভাবলাম, বাঃ, এতো ফ্রি ফর অল হ'য়ে গেল! পেছনে দুজন নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। হঠাৎ খবরের কাগজের ভেতর থেকে স্যারের রসিক উক্তি, "উঁহুঁ, আজ কোন কথা নয়, শুধু লেখা আর লেখা!" সবাই ঘাবড়ে গেল, কি ব্যাপার, স্যারের কি অন্তর্দৃষ্টি আছে নাকি! না হলে, কাগজের ভেতর থেকে দৃষ্টি কি ভাবে বাইরে আসে? কিছুক্ষণ শান্ত থাকার পর হলে আবার গুঞ্জন। আবার শুরু হ'লো নিজেদের মধ্যে আলোচনা। স্যার তাঁর পরিচিত সুরে বল্লেন, "উঁহুঁ, I, from behind the newspaper, will turn and your exam papers will burn". কাগজের ভেতর থেকে আবার সেই কণ্ঠ। আমরা এবার নিশ্চিত, স্যার দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু কি ভাবে, প্রশ্ন এটাই! যারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল, তাদের একজন অমর। অমর উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল, "স্যার, এক নম্বর, টয়লেট।" স্যার বল্লেন, "যাও, এক নম্বরের জন্য বরাদ্দ দু মিনিট। তার মধ্যে ফিরে এসো, না হ'লে ..... and your time starts now". অমর উঠল, বাইরে গেল, স্যারের দিকে তাকাতে তাকেতে বাইরে গেল, ফিরেও এল দু মিনিটের আগেই। ফেরার পথে আমাদের দিকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আর হাতের ইশারা করে জানাল, সবাই যেন শান্ত থাকে।
এর পর পরীক্ষা নিরুপদ্রবে শেষ হল, শুধু একটু ফিসফিসানি ছাড়া। অমর চুপিচুপি তার পাশের বন্ধুটিকে বল্ল, স্যার কিন্তু ঐ খবরের কাগজের ভেতরে অসংখ্য ফুটো করে রেখেছেন, আর ওই ফুটো দিয়েই তিনি তাঁর নিবিড় পর্য্যবেক্ষণ চালাতে থাকেন। আর ফিসফিসানির মাধ্যমেই খবরটা পুরো ক্লাশে ছড়িয়ে পড়ল।

হায়রে কবে ফুরিয়ে গেছে ডি.এন.এম এর কাল

> *এই প্রসঙ্গে আশিস*
> *মধু (মাল) সেন একবার আমাদের হলে সানগ্লাস পড়ে গার্ড দিতে এসেছিলেন। সে কি দুঃসহ অবস্থা। কোনদিকে যে তাকাচ্ছেন?*

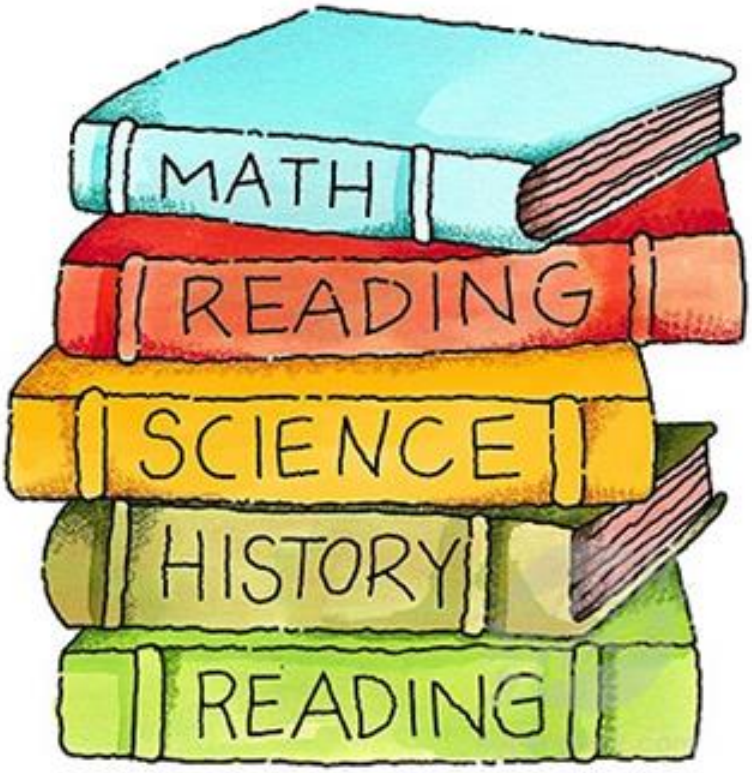

প্রাক্তন অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও প্রশাসকের

দৃষ্টিতে যাদবপুর

Days as a J.U. Faculty
Siddharta Datta

অনেকদিন ধরেই ভাবছি, এই বিষয়টি নিয়ে লিখবো। কিন্তু কিছুতেই শুরু করতে পারছিলাম না। কিছুদিন আগে প্রথম লেখাটি পোস্ট করার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী এবং বেশ কয়েকজন প্রাক্তনী পরবর্তী লেখার কথা বললেন, জানিয়ে দিলেন খুব বেশি দেরি করা চলবে না। অগত্যা এই লেখাটি শুরু করে কিছুক্ষণ আগে শেষ করলাম ।

আজকাল একটা খবর পেয়ে মনটা খুবই বিচলিত হয়ে ওঠে, সে সংবাদপত্রের পাতায় পড়ে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে চাক্ষুষ করে হোক্। হ্যাঁ, এতক্ষণে আপনারা ঠিকই অনুমান করেছেন। ইদানিং ঊর্ধ্বগামী আত্মহত্যার ঘটনা বা প্রবণতা। সে আত্মহত্যার ঘটনা ছাত্র ছাত্রীদের ক্ষেত্রে হোক বা কৃষকদের এবং খেতে না পাওয়া মানুষদের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়া আত্মহত্যার ঘটনা হোক। প্রশ্ন জাগে মনের মধ্যে কেন মানুষ বিশেষ করে অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা পারিপার্শিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে? তাহলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ক্ষমতা কি নিম্নমুখী?

আমরা তো আমাদের সময় এরকম জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেই বড় হয়েছি। সে শিক্ষা তো পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। সেজন্যই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একজন প্রাক্তনী হিসেবে আমি ঋনী । অবশ্য সেসময় অন্যান্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদেরও একই অভিজ্ঞতা

এ লেখায় তুলে ধরবো ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যা সমাধানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা দের ইতিবাচক ভূমিকা।

ঘটনাটা আমার রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগের ।

আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য । হঠাৎ একদিন আমাদের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অলকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ফোন। উদ্বেগ মিশ্রিত গলায় উনি বললেন সিদ্ধার্থ, তুমি কি একবার বিভাগে আসতে পারবে? আমি জিজ্ঞেস করাতে জানালেন আমাদের এক ছাত্র ড্রাগ নিয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় লাইব্রেরিতে ঢুকে ব্যাগ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে । অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীরা ওকে বিভাগীয় প্রধান এর কাছে নিয়ে এসে শাস্তির দাবী জানাচ্ছে । আমি অলোকদাকে বললাম, আমি একটা মিটিং এ ব্যস্ত আছি । আপনি ওর অভিভাবকদের ডেকে নিন। তখন আমি যাবো।

ছাত্রের বাবা কর্মসূত্রে ভিন্ রাজ্যে থাকেন। মা এসেছেন। ওনার সামনেই ছাত্রটিকে প্রচন্ড বকাবকি করলাম। তারপর দেখলাম অলোকদা কিরকম শান্তভাবে ছাত্রটিকে বোঝাচ্ছেন। এ ঘটনার বেশ কিছুদিন আগেই এরকম একাধিক সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কাউন্সেলিং সেল্ খুলেছি। ওর মায়ের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে ঐ সেল এ পাঠানোর । কিন্তু অলোকদা তৎক্ষণাৎ ঐ সেলের প্রধান এর সাথে যোগাযোগ করে ওদের পরামর্শে এবং সহযোগিতায় বারুইপুরে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে ছাত্রটির থাকার বন্দোবস্ত করলেন । মার সম্মতিতে পাঠানো হলো ঐ সেন্টারে। তারপর নিয়মিত ওর খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানাতেন। এদিকে ছাত্রটির একটি পরীক্ষা কয়েকদিন বাদেই। আবার অলোকদার ফোন, পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে । এরপর ওখানকার ডাক্তারদের পরামর্শ মত কয়েকদিন বাদে পরীক্ষার দিন ধার্য হলো ।

এরপর এর ঘটনা খুবই আনন্দদায়ক । আমাদের বিভাগীয় প্রধান অলোকদা ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছেন। কোথায় ক্লাস নোট পাওয়া যাবে তা জোগাড় করা, লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে সবশুদ্ধ ওকে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে কিভাবে পড়াশোনা করতে হবে সেসব বোঝানো, সবই করেছেন পরীক্ষার দিন পর্যন্ত । শুনে খুশি হবেন সেই ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করে, চাকরি পেয়ে আজ জীবনে

প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি ঘটনা থেকেই আমি শিখতে চাই, এটি আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও থাকাকালীন আমি অনেক কিছু শিখেছি, তার মধ্যে এটি অবশ্যই অন্যতম ।
এই ঘটনা আমার উল্লেখ করার মধ্যে দীর্ঘদিনের একটা ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে।
কিছুদিন ধরে সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তির মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি । বিভিন্ন মিডিয়ায় এটা এখন ও চলছে । কিন্তু কজন জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সুন্দর ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক এর কথা? পড়াশোনা, গবেষণার বাইরে অধ্যাপক/ অধ্যাপিকা দের বিভিন্ন ইতিবাচক ভূমিকার কথা। এখন তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ণয়ে সমাজের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে । মান নির্ণয়ে উচ্চ স্থান দখল করার ক্ষেত্রে পঠনপাঠন, গবেষণার পাশাপাশি এটাও একটা ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গ ক্রমে জানাই সারা বিশ্ব জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা এখন বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। এই কোভিড-19 সংক্রান্ত গবেষণায় তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সারা পৃথিবীতে একেবারে সামনের সারিতে। পঠনপাঠন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার নিরিখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বে একটা জায়গা করে নিয়েছে এবং সেটা এখনও বহাল আছে। এসব তো আর হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন সাফল্য নয়। এর পিছনে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট মানুষজন। দীর্ঘদিন ধরে লালিত পালিত শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্যই এই সাফল্য । যতদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঐতিহ্য বজায় রেখে আগামী দিনের সমস্ত রকম কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে, ততদিন শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের সবার প্রিয় এই বিশ্ববিদ্যালয় সামনের সারিতে থাকবে। এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভরসারও কথা, কারণ,
যাদবপুর আছে যাদবপুরেতেই।

অন লাইন শিক্ষা- ব্যাবস্থা আর আমার কথা
সিদ্ধার্থ দত্ত

ভবিষ্যতে কি অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষাদানের মাধ্যম হতে চলেছে? এই সময়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত বিষয়ে চর্চা হচ্ছে, এটি তার অন্যতম। অনেক রকম প্রশ্ন উঠে আসছে এ বিষয়ে। সেটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে যে সব পরিকাঠামো থাকা দরকার তা সরকারি স্তরে আছে কিনা? থাকলেও ছাত্র ছাত্রীর পরিবারে সে সকল জিনিস ব্যবহার করার মত স্বচ্ছলতা আছে কিনা? শিক্ষা ক্ষেত্রে এরকম বিভাজন তৈরি করা দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে কিনা? এই ধরণের হরেক রকম প্রশ্ন। এসব কিছুর আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, আর তা করতে চাই না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে না। বড়জোর একে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক এর ভূমিকায় কাজে লাগানো যেতে পারে। এসব কথা আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার নিরিখেই ব্যক্ত করছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে অনেক অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের ক্লাসে দেখেছি তাঁরা class teaching কে অনেক সময়েই একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারতেন। এগুলো অবশ্যই অনুকরণ যোগ্য। এসবের কোন বিকল্প হয় না। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফাঁক ফোকর ভরাট করার জন্য এটাকে উন্নত করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু বিকল্প খোঁজার সময় এটা না। বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় ওই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগের একটা ঘটনা এই
বিষয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। সেটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের শ্রদ্ধেয়
অধ্যাপক সলিল কুমার ঘোষাল (SKG) কে কেন্দ্র করে। কয়েক বছর আগে উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। স্যারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

সলিলবাবু স্বভাবে ছিলেন একজন রাশভারি মানুষ, গলার স্বরটিও ছিল বেশ গম্ভীর। সম্ভ্রম জাগানো ব্যক্তিত্ব। আমাদের পড়াতেন Chemical Engineering Thermodynamics. ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ দিয়ে কঠিন বিষয়গুলো কে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করতেন। এছাড়া আমাদের কিছু Sessional classও নিয়েছিলেন। আমাদের সময়েরও আগে Sessional subject এর উপর পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। Unit Operation Laboratory পরীক্ষায় কে কোন্ experiment করবে, তা লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হতো। অনেকেই সেই সময়ে লটারিতে SKG র কাছে যেন experiment না পরে, তার জন্য পূজো দিতেন। এটা আমার প্রাক্তনীদের মুখে শোনা তার ছাত্র জীবনের ছেলেমানুষির কথা।

ছাত্র থেকে যখন সহকর্মী হলাম, খুব আন্তরিকতার সাথে ডিপার্টমেন্ট এ আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। সহকর্মী হিসাবে দেখেছি স্যার এক একটা ক্লাসের জন্য কতটা সময় ব্যয় করতেন। অসাধারণ Class note তৈরি করতেন। আমার কাছে এসবই শিক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। পরবর্তী সময়ে বহু ব্যাপারেই ওনার পরামর্শ পেয়েছিলাম।

সে সময় আমরা কয়েকজন প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে ক্লাস নিয়ে সলিলবাবুর ঘরে যেতাম। ওখানে আমাদের চা খাওয়া চাইই। নিজের হাতে চা বানিয়ে সবাইকে খাওয়াতেন। চা খেয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে নিজের ঘরে ফিরতাম। এরকমই একদিন অভ্যাস মতো গেছি SKG র ঘরে চা খেতে। উনি তখনও ক্লাস থেকে ফেরেননি। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকে বললেন " আজ ক্লাসে কি পড়ালাম জানো "? প্রশ্ন করে নিজেই জানালেন " Love Is a Big Zero. " এটাই ব্যাখ্যা করলাম আজ ক্লাসে। আমি ওনার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটে একটি শব্দই সেদিন উচ্চারণ করেছিলাম " সেকি! " এবার উনি শুরু করলেন :
ক্লাসে ঢুকে দেখি বোর্ড এ লেখা ঐ বাক্যটি "। এ রকম অভিজ্ঞতা ক্লাসে ঢুকে আমাদের অনেকেরই কম বেশি হয়েছে। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ছাত্র ছাত্রীদের এই দুষ্টুমি উপেক্ষাই করেছি। SKG ও করেছেন। কিন্তু সেদিন স্যার ওটি না মুছে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করলেন " তোমাদের মধ্যে কে এটি লিখেছো"? উঠে দাঁড়াও। বলা বাহুল্য কেউই এটা স্বীকার করলো না। তারপর স্যার বললেন " আজ ক্লাসে এটাই আমি আলোচনা করবো "। করলেন ও তাই। এসব বলেই আমাকে বললেন। Class Test এ এটাই হবে আমার প্রশ্ন " | একটু ইতস্ততঃ করে আমি অনুরোধ করলাম " না স্যার, পরীক্ষায় এসব প্রশ্ন দেবেন না"।

এরপর যা হয়, ঘটনাটি আমি ভুলে গেছি। কিছুদিন পরে ক্লাস নিয়ে ওনার ঘরে চা খেতে ঢুকতেই হাতে ধরিয়ে দিলেন একটি প্রশ্নপত্র। দেখি ওটাতে প্রথম প্রশ্নটিই : " Love Is a Big Zero "- Explain it with the help of Thermodynamics."

বেশ কিছুদিন পর ঐ ক্লাসের কয়েক জন ছাত্রছাত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমরা SKG র ক্লাসে বোর্ড এ কি সব লিখে রেখেছিলে। কেন? ওরা জানিয়েছিল " হ্যাঁ স্যার, আমরা ঐদিন অন্যায় করে ফেলেছি। কিন্তু SKG সেদিন ভারি সুন্দরভাবে ঐ sentence কে কেন্দ্র করে Entropy, Free energy, Available energy আমাদের বুঝিয়েছিলেন। ওসব ভোলা যায় না "। এটাই হ'চ্ছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সৌন্দর্য।

আজ যখন অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা বনাম প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে, তখন দূরভাষ এ অনেক

প্রাক্তনী, বর্তমান ও প্রাক্তন অধ্যাপক/ অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম। এখনও
সেটা করে যাচ্ছি। সিংহভাগই দেখলাম প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার
পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলেন। এটি সত্যিই আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক | কারণ যাদবপুর আছে যাদবপুরেতেই।

Jadavpur Days as Faculty
Siddharta Datta

যাদবপুরের স্মৃতি কথা_
সিদ্ধার্থ দত্ত,
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগ এবং প্রাক্তন সহ উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

কিছুতেই ভুলতে পারি না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে। সেটা চাইও না । আমিও যাদবপুরাক্রান্ত। আসলে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যতভাবে যুক্ত থাকা যায়, সেটাই ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে ঐ যাদবপুর এ। ছাত্র হিসাবে শুরু, তারপর একে একে গবেষক, অধ্যাপক এবং শেষে প্রশাসক। তাই অনেক সময়েই বন্ধুদের ঠাট্টা করে বলি,
বন্যেরা বনে সুন্দর
শিশুরা মাতৃক্রোড়ে,
সিদ্ধার্থ যাদবপুরে।

যাদবপুরের কাজকর্ম সমন্ধে লিখতে গিয়ে আজ মনে পড়ছে। তার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যর কথা। বহুদিন থেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অন্যতম কাজ হ'লো ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত থেকে তাকে সাহায্য করা এবং এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থেকে নিজেকেও শিল্প সমন্ধে শিক্ষিত করে তোলা। এই শতাব্দীর গোড়াতেই এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। গড়ে উঠল Industry Institute Partnership Cell. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন আমি বহু ইন্ডাস্ট্রির জন্য কাজ করেছি। আজ এরকম দুটো কাজের কথা খুব মনে পড়ছে।

যাঁর কথা লিখবো বলে এতটা ভূমিকা করলাম তিনি অধ্যাপক পিনাকী ভট্টাচার্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। স্যার এবং আমি দুজনে মিলে ঐ কাজ দুটি করেছিলাম। পিনাকীবাবু ছিলেন খুবই সিরিয়াস প্রকৃতির অধ্যাপক। সে ক্লাস নেওয়া থেকে শুরু করে, গবেষণা এমন কি আড্ডা মারতেও একই রকম। খুবই মজাদার মানুষ এবং বেশ গোছানো, একমাত্র নিজের বসার ঘরের টেবিলটা ছাড়া। ঐ অগোছালো টেবিলটা আজও আমার কাছে বিস্ময় এর ব্যাপার। নিয়মানুবর্তিতা নিখুঁত | বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং যাওয়া ছিল ঘড়ি ধরে। শুনেছি লোকাল ট্রেনে আসা যাওয়ার পথে আমজনতার সাথে মিশে যেতেন খুব সহজেই।

এবার আসি কাজদুটির কথায়।
প্রথম কাজটি ছিল আম ফলনের উপর ধূলিকনার প্রভাব সংক্রান্ত। কাজে নেবো কি ছেড়ে দেবো এই ভাবতে ভাবতে পিনাকীবাবুকে ফোন করলাম। স্যার এক কথায় রাজি। যথা সময়ে দলবল সহকারে রওনা দিলাম আমবাগানের উদ্দেশ্যে। মেপে দেখতে হবে আম গাছের উপর জমে থাকা ধূলিকনার

পরিমাণ। বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে ধূলিকনার উৎস আশেপাশের ইন্ডাস্ট্রি। ট্রেনে যাওয়ার পথে গল্পগুজব করে মাতিয়ে রাখলেন পিনাকীবাবু। আম বাগানের মালিক এর সাথে আলোচনা করে কাজের রূপরেখা ঠিক করে নিলাম আমরা। এই কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে শিখেছিও প্রচুর। প্রকৌশলবিদ হিসেবে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে কৃষিক্ষেত্রকে মজবুত করার, সেটাও উপলব্ধির মধ্যে এসেছিল সেই সময়। প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজে স্যারের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কাজের সাফল্যের ব্যাপারে ছিল অগাধ আস্থা। শুনেছি কাজটি পরে প্রশংসিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় কাজটির সামাজিক বিস্তৃতি ছিল বড় রকমের। মনকে খুব নাড়া দিয়ে যায় সে সব ঘটনা। সে সময় একটা ইন্ডাস্ট্রির প্রডাক্ট খুবই জনপ্রিয়, এখন ও তাই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওটাই তখন কিছু মানুষের কাছে নেশার বস্তু। এ ব্যাপারে আলোচনা করতে একদিন কোম্পানির লোকজন এসে হাজির। এমন কিছু করতে হবে যাতে প্রডাক্ট এর গুণমানও বজায় থাকে আবার নেশাগ্রস্তরা যেন এটাকে নেশার বস্তু হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। স্যার এবং আমি দুজনেই তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম এ কাজ আমাদের করতেই হবে। কত খোঁজ খবর সে সময় নিয়েছিলাম। মনে পড়ে একদিন দুজনে মিলে ঠিক করলাম কলকাতা শহর ঘুরে নিজেদের চোখে দেখবো, কারা এই নেশা করে এবং কি ভাবে করে। সব দেখে শুনে দুঃখও পেয়েছিলাম, কিন্তু একটা জেদ চেপে বসেছিল মনের মধ্যে। অবশেষে আমরা দুজনে প্রচুর বইপত্র ঘেঁটে এবং ল্যাবরেটরিতে কিছু কাজকর্ম করার পর ইন্ডাস্ট্রিতে একদিন পরীক্ষামূলক ভাবে আমাদের ভাবনাচিন্তাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করলাম। অবশেষে এল সেই কাঙ্খিত সাফল্য। খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম কাজটা সাফল্যের সাথে শেষ করে।

পড়াশুনার বাইরে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরে যে সমাজ, তাকে ভুলে থাকা যায় না। উচিতও না। সেটা অস্বীকার করাটাও মুর্খামি। এটাই তো যাদবপুরের শিক্ষা। দুটো কাজের ক্ষেত্রেই স্যারের ভূমিকা ছিল প্রথমে প্রকৌশলবিদ হিসেবে, আর তার চেয়েও বড় ভূমিকা ছিল সমাজসেবী হিসেবে। আমার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যাতিক্রম ছিল না।

এমনই আনন্দে কাটিয়েছি আমরা আমাদের প্রিয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। সব সময়েই মনে হতো আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। এখন প্রশ্নটা মনের মধ্যে মাঝে মাঝে উকি মেরে যায় : যাদবপুর কি আছে যাদবপুরেতেই?

আমাদের কিছু মিষ্টি-দুষ্টু স্মৃতি

On JU Memoir
Siddharta Datta

দীপকদা, আপনার পাঠানো সব লেখা আমি যাদবপুরিয়ান দের মধ্যে শেয়ার করি। আমি ইতিমধ্যেই অনেককে শেয়ার করলাম । তাঁরা তো আপ্লুত । বিশেষ করে আমার ক্লাস মেট্ সবাই যারা হষ্টেলে ছিলো, তাঁরা এক/ দুই লাইনে স্মৃতি রোমন্থন শুরু করে দিয়েছে আমাদের বিভিন্ন group এ এবং ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই দারুণ উপভোগ করছেন ।
অনেকেই লেখার চেষ্টা করছেন । আপনার শুরু করা " যাদবপুর কাহিনী " ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছে। একটা বড় ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শক আপনিই।
আপনাকে কুর্ণিশ জানাই

গিরীণদা, বিশ্বকর্ম্মা পূজো ও আমরা
আশিস দাশশর্মা

যাদবপুরের বিশ্বকর্মা পূজোর কথা মনে আছে? Blue earth workshop এ হতো মুলত গিরীণদার নেতৃত্বে। একটা মহা হৈ চৈ ব্যাপার। সকালে পূজো, অঞ্জলি, প্রসাদ আর দুপুরে ভূরিভোজ। আর বিকেলে মাষ্টার মশাই দের সঙ্গে ছাত্রদের সেই বিখ্যাত ফুটবল খেলা। রেফারি গিরীণদা। টীচার দের গোলের কাছে গেলেই ফুরুৎ ফুরুৎ বাঁশি। সাল টা 1960 । পুজোর দিন গিরীণদা আমাদের বিমল দাকে (মোহনবাগান খ্যাত বিমল চক্রবর্তী, তখন মেকানিক্যাল 3rd Yr) ডেকে বললেন খবরদার, টীচারদের গোলের আশেপাশে গেলেই খারাপ হবে। আর অসীম কে ('63 সিভিল) বলে দিবি ও যেন গোল পোষ্টে statue হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর মনে রাখিস টীচার রা সবাই গুরুজন। পায়ে পা লাগলে প্রণাম করবি। না হলে বাঁশি ফুরুৎ।
বিমল দাও খ্যাপাবার জন্য বলে দিল, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র ভূমি। গিরীণদাও বঙ্কিম দৃষ্টি হেনে বললেন, ঠিক আছে, দেখে নেব। দুপুরে সময়মত খেতে আসিস।
যথারীতি আমরা দল বেঁধে খেতে গেলাম। গিরীণদা আমাদের জন্য উৎকন্ঠিত প্রতীক্ষায়। আমরা যেতেই পরমাদরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এর পরেই আরম্ভ হল মহাপ্রলয়। একেবারে বকরাক্ষসের খাওয়া। ভাত মাছ মাংস চাটনি দৈ মিষ্টি র মহারণ। পাত ফুরোবার আগেই আবার ভর্তি। গিরীণদাও সমানে ওদর আরো দে, আরো দে। আমরাও ছাড়ার পাত্র নই। সমানে লড়ে যাচ্ছি। এ যেন ভারত পাকিস্তান লড়াই। অবশেষে গিরীণদাও ক্লান্ত হয়ে থামলেন। সশব্দ হুংকার, দেখি এবার কেমন মাঠে নামিস।
আমাদেরও হাঁসফাঁস অবস্থা।
ব্যাপারটা আমরা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। ধীরে ধীরে একে একে বাইরে গিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে সব হড় হড় করে বমি করে বার করে দিলাম। ব্যাস একদম fit. । দু চার বার জগিং করে মাঠের পাশে ক্লাব হাউস এ চলে গেলাম।
বিকেলে মাঠের চারপাশে প্রচন্ড ভীড়। শুনলাম গিরীণদার আস্ফালন, দেখি ওরা সবাই কি করে খেলতে নামে! তার পরেই ফুরুৎ ফুরুৎ বাঁশি। আমরাও যথারীতি সময়মত মাঠে ঢুকে গেলাম। গিরীণদার মুখখানা তখন দেখার মত!
আমরা যথারীতি ইচ্ছাকৃত এক গোলে হারালাম।
অপার বিস্ময়ে গিরীণদা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি করে হল? আমরাও সবাই মুচকি হেসে কেটে পরলাম।
কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী সেই দিনগুলো?

ইনভিজিলেটর গিরীণদা
দীপক সেনগুপ্ত

গিরীণদার কথায় মনে পড়ল গিরীণদা কোনদিকে তাকাচ্ছেন, বোঝা যেত না, এতটাই ট্যারা। আজ ভুলে গেছি, এ হেন গিরীণদা কোন একটা সেমিষ্টার ড্রয়িং পরীক্ষায় আমাদের গার্ড দিচ্ছেন। আমার পেছনে বসেছিল অমর, অমর নাথ ভট্টাচার্য্য। পরীক্ষার শুরুতে অমর আমায় বলে রেখেছিল,' দীপক, তোর ড্রয়িং থেকে আমি কাঁটা মারবো।"
আমি বল্লাম, "ওরে, গিরীণদা যে গার্ড! কোন দিকে তাকাবেন, বোঝা যাবে না যে? কাঁটা মারার সময় যদি আমাদের দিকে তাকান, তবে কি হবে?"
অমর বল্ল, "তোর কোন চিন্তা নেই রে, গিরীণদার চোখের মণির locus আমি ভালকরে ষ্টাডি করে নিয়েছি। চোখের মণির কোন পজিশনে আমাদের দিকে তাকাবেন, আমি ঠিক বুঝে যাব। সময় বুঝেই আমি কাঁটা দিয়ে দেবো তোকে, মাপ দেবার জন্য।"
আমি আর কি করি! অগত্যা!
পরীক্ষা শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে অমর বল্ল, "দীপক, নে, এবার কাঁটাটা ধর্, গিরীনদা এখন অন্যদিকে চেয়ে আছেন।"
আমি গিরীণদার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, তিনি কোনও একটা দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, কিন্তু সেটা কোন্ দিক, তা বুঝতে পারিনি। এদিকে অমর যখন তার কম্পাসটা আমায় বাড়াচ্ছে, ঠিক তখনই আবার গিরীণদার হুঙ্কার, "এই, কি হচ্ছে?"
অমর ফিসফিসিয়ে আমায় বলে, "ওরে, গিরীণদার হুঙ্কার আমাদের জন্য নয় রে, এ অন্য কারোর উদ্দেশে। তুই নিশ্চিন্তে কাঁটায় মাপ টা দেনা!"
গিরীণদা বোধহয় অনুমানে কিছু বুঝলেন, বল্লেন, "এই, আমি তোদেরই বলছি।"
আমার তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া অবস্থা। অমর কিন্তু তখনও কনফিডেন্ট, বলে, "আমাদের বলছে না রে।"
সঙ্গে গিরীণদার হুঙ্কার, এবার "তুমি" ছেড়ে "তুই" দিয়ে সরাসরি আক্রমন, "কি ভেবেছিস রে তোরা, আমি ট্যারা ব'লে কানেও শুনি না নাকি? খাতা সিজ্ করে নেব, হল্ থেকে বার করে দেব!"
সেবার বহু কষ্টে ক্ষমা-টমা চেয়ে গিরীণদার শাস্তির হাত থেকে বেঁচেছিলাম।

কাল থেমে নেই, গিরীণদা বহু আগেই চলে গ্যাছেন, অমরও চলে গেল, সেও আজ কত৷ বছর! স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল।

Memoir on Girin Da
Dipendu Raha

Mechanical এর গিরীণবাবুর কথায় একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ল । Mechanical Shop এ 1st কি 2nd assignment
Mandrel বানানো। গিরীণবাবু সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, rough cut এর সময় caliper দিয়ে মাপা, আর fine cut য়ে measurement micrometer দিয়ে । আমি toolcrib থেকে tools and measuring instruments নিয়ে mandrel বানানো শুরু করলাম । । was not good at machine shop projects. cuttingয়ে problem শুরু হতে গিরীণবাবুকে ডাকলাম ।

উনি আমাকে সাহায্য করতে করতে হঠাৎ একটা tools য়ের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, "এটা কি?" আমি বললাম "micrometer "
গিরীণবাবু বললেন " বাবাঃ, বিয়ে না হতেই ফুলশয্যার আয়োজন!!!" আমার অবস্থা তখন ধরণী দ্বিধা হও

যাদবপুর স্মৃতি
দীপক সেনগুপ্ত

ঘুরে ফিরে আবার যাদবপুর প্রসঙ্গ। সেই সাথে অন্য বন্ধুদের স্মৃতিচারণার অপেক্ষাতেও রইলাম।

যাদবপুর-জীবনের স্মৃতি বার মনে করায়, আমাদের একটা সুমধুর অতীত আছে, সে অতীতে ঢুকলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের স্বপ্নময় কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের এক কাব্যিক জীবন। আর সেই জীবনের ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে রয়েছে, নানা মণি মাণিক্য।
একটি মণি হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। প্রকৃত অর্থেই তাঁরা ছিলেন আমাদের Friend - Philosopher - Guide. আজকের মত যান্ত্রিক সম্পর্ক নয়, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যর, ভক্তি, শ্রদ্ধা আর বিনম্র ভালবাসা দিয়ে গড়া। অবশ্য এর মধ্যে, আমাদের কিছু ছাত্রসুলভ চটুলতাও ছিল। প্রিয় মাষ্টারমশাইদের অনেকরই কিছু মজার নাম দেওয়া ছিল। যেমন G.N. De হলেন গুন্ডা দে, M.S.G হলেন মাল সেন, H.G.G হলেন হাগুবাবু, R.N.D হলেন রেণ্ডি স্যার, M.M.K হলেন মামাকর ইত্যাদি।
আরেকটি মুক্তো হল 'মাদার'। "মাদার" হল Sessional এর রিপোর্টগুলো সব, সময়ে জমা দেবার একটা মোক্ষম হাতিয়ার। Senior batch কৃত lab-reports বা light tracing করার জন্য কত drawing ইত্যাদি, এসব যেমন মাদারের হার্ড-কপি ভার্সান, ঠিক তেমনি এই মাদারেরই একটি সফট কপি ভার্সানও ছিল - কিছু তথ্য, যেমন কি না বিভিন্ন স্যারেদের পড়াবার স্টাইল, উচ্চারণের বিশেষত্ব, বিভু বাবু স্যারের জুতোয় তলায় লোহার লাইনিং লাগিয়ে ছন্দবদ্ধ লয়ে খট্ খট্ করে হাটা, বিভিন্ন স্যারেদের বিভিন্ন nick names ইত্যাদি - এ সমস্ত তথ্যের মোখিক soft copy version গুলো down the line, senior থেকে junior রা পেয়ে এসেছে। আবার বলি, এ সবের মধ্যে কিন্তু শিক্ষকদের প্রতি আমাদের কোনরকম অশ্রদ্ধা ছিল না, যা ছিল তা হচ্ছে নিতান্তই ছাত্রসুলভ চপলতা।
Prof HGGকে নিয়ে এ রকম একটি তথ্য, senior দের থেকে soft copy, মাদারের মাধ্যমে আমরা পেয়েছিলাম। আসা যাক সে কথায়। Prof H.G.Gর বিশেষত্ব ছিল, তিনি ক্লাশে পূর্ব্ব বঙ্গীয় ভাষায় কথা বলতেন। তবে, এর আগে একটা প্রাক্ কথন আছে, Electrical H.O.D Prof Hem Guha র সম্পর্কে। অত্যন্ত রাশভারি ও গম্ভীর মানুষ ছিলেন গুহ সাহেব। অগাধ ছিল তাঁর পান্ডিত্ব, বিস্তৃত ছিল তাঁর জ্ঞানের পরিধি। আমরা ছাত্ররা গুহ সাহেবকে যেমন ভক্তি করতাম, তেমন ভয়ও পেতাম। তবে অত্যন্ত রাশভারী এই স্যারের আপাত-গাম্ভীর্য্যের আড়ালে, তাঁর ছাত্র-দরদী রূপের পরিচয়ও, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ পেয়ে থাকবে। প্রাক্ কথন শেষ, ফিরি prof. H.G.Gর কথায়। তিনি তাঁর Mechanics classএ একবার বলে ফেল্লেন, "আমি আর গুহ (প্রঃ হেম গুহ) এক ক্লাশে পড়্ ছি, গুহ বিলাত গিয়া, হইল গুহ সাহেব, আর আমি হাগু বাবু! বাঁশ দিমু, পরীক্ষায় তোমাদের সক্কল্ ডিরে আমি বাঁশ দিমু।"

ইনভিজিলেটর HGG
আশিস দাশশর্ম্মা

হাগুবাবু একবার পরীক্ষার invigilation ডিউটি র সময় কোনও এক ছাত্রকে বলে ওঠেন " সুরি কর ক্যান, সুরি কর ক্যান? মিনিস্টার হইবা বুঝি?" কেউ একজন বলে উঠল " স্যার চুরি করলে মিনিস্টার হয় বুঝি?" "হ কাগজে কলমে তো হেইডাই দেহি!". অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন হাগুবাবু।

কিছু স্মৃতি কিছু কথা
প্রফুল্ল রায়

দীপক।
খুব ভাল লাগল। হাগুবাবু আর হেমগুহ প্রসঙ্গ। নিক নেম গুলোও। তবে সত্যি কথা মাষ্টার মশাইদের অসম্মান করি নি। BL Das (বোতল দাস) ।
আমি SPT hostel এ থাকতাম। সুপার ছিলেন mechanical এর J C Sarkar. খুব সাদা সিধে মানুষ ছিলেন। আমরা মেকানিকাল এর ছেলেরা AC Mc পরীক্ষা দিয়ে মন খারাপ করে হষ্টেলে ফিরলে উনি বললেন মন খারাপ কোর না।ঐ সাবজেক্টাই ঐরকম। আমিও ভাল করিনি।
প্রফুল্ল।

প্র. এইচ.জি. জি ও সুমিতা বাগচি
আশিস দাশশর্মা

কথায় কথায় এলো সুমিতাদির কথা। সুমিতা বাগচি, Chemical, "61 batch. University topper, সম্ভবত '৬১ তে Chemical এ 2nd. মিশুকে এবং অসামান্যা রূপসী। নামের আদ্যাক্ষর sb, antimony. তাই antimony নামেই সমধিক পরিচিত।
সেই
যাকগে। সুমিতা দি কে নিয়ে একটা ঘটনা বলি। হস্টেলে কেমিক্যাল এর সিনিয়র দের থেকে শোনা। হাগুবাবুর নম্বর দেওয়ার হাত টা খুব টাইট ছিল। ছেলেরা একবার সুমিতাদিকে depute করলো হাগুবাবু কে নম্বরের জন্য plead করতে।
এর পরেই হাগুবাবু কাউকে বলেন, " পোলাগুলারে ত নম্বর দিমু না ঠিক করসিলাম। কিন্তুক মাইয়াডা বড়ই জ্বালাইতাসে" ।

আমার ছোট্ট কথা
Shankar Nath Chaterjee

Ami ekta incident boli.1958 J.U.Semifinal HOCKY tournament.Capt bollo,ekta player kom,tui nemay ja.Ami bollam konodin hocky khelini,footnall e half e kheli.Capt, Asish bollo nemay.
Within 10 mins khatang koray thutnitay laglo ball.Fetay bone dekha jachhey.
Bezene diye sealed for 10 days. Bojho.

On Jadavpur days
Siddharta Datta

পুরানো দিনের কথা মনে পড়লে একটা আনন্দের অনুভূতি হয় । তখনই মনে হয় বন্ধুদের সাথে এটা শেয়ার করি। ঘটনাটা এইরকম
আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ/ ছত্রিশ বছরের আগেকার কথা । আমি তখন রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগে অধ্যাপনা করি , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। একদিন সেশনাল ক্লাস নিতে নিতে টিফিন করতে ভুলে গেছি । শেষ বিকালে টিফিন করতে গেলাম এইট বির গেটের বাইরে । তখন রাস্তা এত বড় ছিল না । একটাই রাস্তা, তার পাশে সারি সারি খাবারের দোকান । একটা দোকানে ঢুকে দেখলাম, ঠিক তার পাশে একটা পান/ সিগারেট এর দোকানে কিছু মানুষ গভীর আগ্রহে রেডিয়োতে কিছু শুনছে । কান পাততেই বুঝে গেলাম কলকাতা লিগ এর খেলা চলছে । খুব সম্ভবত ইষ্টবেঙ্গল বনাম কুমারটুলি । লোকজনের চোখ মুখের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি, ইষ্টবেঙ্গল এর অবস্থা ভালো নয়। নিজে মোহনবাগানের সমর্থক, তাই ভয় হচ্ছে কাউকে খেলার খবর জিজ্ঞেস করতে। শুনে যদি চোখেমুখে কিছু প্রকাশিত হয়ে যায় । আর দেখতে হবে না, এলাকার নাম যাদবপুর । এদিকে খাওয়া দাওয়ার পর চা খাওয়াও শেষ । অগত্যা যখন দেখি ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে, দোকানে গেলাম একটা সিগারেট ধরাতে । এক বয়স্ক ভদ্রলোক কে জিজ্ঞেস করেই বসলাম । দাদা খেলার রেজাল্ট কি হলো? খেলা তো শেষ। ভদ্রলোকের জবাব শুনে আমি থ। উনি বললেন ' রিলে তে তো কইল ড্র, দেহি কাল বসুমতী কি কয় '।
বিশ্বাস করো আমি প্রায় দু মিনিট আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম । ভাবছিলাম মানুষের জীবন নিয়ে। কি অদ্ভুত এই জীবন । সুখ দুঃখ, আনন্দের মাঝে ও বেঁচে আছে মানুষ শুধু আশা নিয়ে । হ্যাঁ, বাঁচতে তো হবেই । কারণ এখন ও অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে বাকি আছে ।
আর যাদবপুর আছে যাদবপুরেতেই।

যাদবপুরের দুষ্টু মিষ্টি গল্প
আশিস দাশশর্মা

1962. Unforgettable year for us all.
Calcutta University র মাঠ। Inter University Cricket semifinal match. যাদবপুরে লড়ছে Opponent team ও জবরদস্ত । নামটা আজ আর মনে নেই। শিবু (রাঁচি) হয়তো বলতে পারবে। তখন যাদবপুরে খেলাধূলা জোয়ার। আমরা সদ্য ইন্টার-ইউনিভার্সিটি ফুটবল জিতে এসেছি। নন্দন রমেশ রা টেবিল টেনিস জিতেই চলেছে। মানসরা বাস্কেটবল খেলছে। সুতরাং সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। 3rd দিনের

খেলা। চরম উত্তেজনা। পুরো যাদবপুর ভেঙে পড়েছে মাঠের চারধারে। চারিদিকে হুঙ্কার... লড়াই করে জিততে হবে।
এমন সময় দেখি বীরেন সরকার (ইলেকট্রিক্যাল) প্রায় উদ্ভ্রান্তের মত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। ঠোঁটে সিগারেট। তখনও জ্বালায় নি। আমরা ডাকলাম.... সরকার এদিকে আয়।... কোন কথা না বলে ও সোজা চলে গেল, পাশেই একটা গাছ আছে সেদিকে। গাছের নীচে ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোক চুরুট খাচ্ছিলেন। সরকার তাঁর কাছে গিয়ে, মাঠের দিকে চোখ রেখে বলল.... দাদা একটু দেশলাই টা দেবেন? ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়ে কিছু একটা বার করতে যাচ্ছেন, আমরা চেঁচিয়ে বললাম..... সরকার Dr. Sen!!! ... সরকারি এবার মুখ ঘুরিয়ে দেখেই ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠে আ আ করছে। তারপরেই আমাদের পাশ দিয়ে যেন ঝড় উড়ে গেল। দেখি সরকার কোথাও নেই। আমরা সভয়ে পাশে দেখতে গিয়ে দেখি দুটি ক্ষমাসুন্দর চোখ আর মুখে সেই চির পরিচিত এক চিলতে হাসি।
হস্টেলে ফিরে দেখি সরকার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। টেনেটুনে তুলে দেখি চোখে মুখে তখনও আতঙ্ক। বলল.... কোথা দিয়ে এসেছি, কিসের উপর দিয়ে ছুটেছি, কিচ্ছু জানি না। যখন থামলাম দেখি পার্ক স্ট্রিটের মোর। সামনেই একটা 5 নং বাস। লাফিয়ে উঠে পড়লাম। সোজা হস্টেল।
তবে সরকার প্রায় এক মাস জেনারেল বিল্ডিং এর দিকে আর যায়নি পাছে ডাঃ সেনের মুখোমুখি হতে হয়।

On General Kariappa
Alok Ganguly

Amidst the ongoing skirmish in Ladakh, I am reminded of the Chinese aggression in 1962 when we were in the final year at JU. After the dust settled, a concerted effort was made by the Govt of India to encourage fresh engineers to join the armed forces. The then Chief of the Armed Forces, General Cariappa, himself came to address a gathering of eager students standing on the playground. Many of our batch mates would surely recall how the imposing figure of the General climbed the dias and declined to use the microphone with a swift and sure motion of his hand. His baritone voice boomed across the huge playground even without a microphone. It was a motivational speech to light up patriotism and join the Armed Forces. Shortly thereafter Short Service Commission was introduced, probably due to his thrust. This probably was, for many, the only occasion to see and hear at close range a serving Commander-in-Chief of the Indian Army in real life.

স্মৃতির সরণী বেয়ে
শিবানী দাস

২০ শে জানুয়ারী ২০১৩ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রছাত্রীর ১৯৬৩/৬৪ সালে পাশ করার ৫০ বছর। উদযাপিত হ'য়েছিল। ভাবতেই অবাক লাগছিল, পাশ করবার পর ৫০ বছর কেটে গেল। সময় থেমে থাকে না, আমাদের জীবনের গতিও থেমে নেই, তারপর আরও সাত বছর কেটে গেছে, যখন চিন্তা করার জন্য একটু থামতে হয়, তখন কিন্তু অবাক বিস্ময়।
আমাকে বলা হলো ক্লাসে কোনো মজার ঘটনা যা ঘটেছে, সে সম্পর্কে লিখতে। রোজ কত কী ঘটেছে, মনের ভেতরের স্মৃতির ওপর ৫০ বছরের প্রলেপ পড়ছে। একটা ঘটনা লেখা যায় সহপাঠিনী সঞ্চিতাকে নিয়ে। আশা করি সঞ্চিতা কিছু মনে করবে না।

আমরা ফাইনাল ইয়ারে পড়ি। Blood donation এর ক্যাম্প ব'সেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সঞ্চিতা গেল রক্ত দান করতে। সেদিন বাড়ী গিয়ে ও খুব বকুনি খেয়েছিল । কারণটা জানি না।

Class হচ্ছে আমরা ক্লাস করছি, Prof. Banerjee ক্লাশ নিচ্ছেন, মন দিয়ে শুনছি, হঠাৎ দেখি সঞ্চিতার মাথা আমার বাঁ কাঁধের ওপর - bench-এর ধারে ও বসেছে, গাশে আমি আর রুবি। পিছন থেকে জ্যোতি চেঁচিয়ে উঠলো -- স্যার, সঞ্চিতা অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। Prof. Banerjee অতি ভাল মানুষ, নার্ভাস হ'য়ে Prof. Kundu কে ডেকে নিয়ে এলেন। সঞ্চিতাকে bench-এ শুইয়ে দেওয়া হলো। Prof, Kundu জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন, তারপর যথারীতি প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ওকে বাড়ী পাঠানো হলো, এবং আমাদেরও আর class হলো না।

এরপর আবার একদিন ক্লাস হচ্ছে - হঠাৎ Prof. Kundu-র ক্লাসে সঞ্চিতা অজ্ঞান হয়ে গেল, ওর মাথাটা আমার ডান কাঁধের ওপর। যথারীতি Prof. Kundu first aid এর ব্যাবস্থা করলেন, সঞ্চিতা একটু সুস্থ হলে বাড়ীতে গেল।

এরপর বেচারাকে অনেক জ্ঞান, উপদেশ শুনতে হত, ও অবশ্য কেবল শুনেই যেত, কোনো উত্তর দিত না। আর আমরা অবধারিতভাবে ওকেই support করতাম।

এবার পরীক্ষা প্রায় সমাগত, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত class-এর বিরাম নেই। আমরাও হাঁপিয়ে উঠেছি। একদিন tiffin-break-এর পরে class হ'চ্ছে topic টা খুব uninteresting হ'লেও class ছেড়ে বেরিয়েও যাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ পেছন থেকে একটা চিরকুট সঞ্চিতার কাছে ---
"সঞ্চিতা তুমিই ভরসা।"

চিরকুটের কল্যানে ক্লাশে তখন হাস্যরোল।

On Annual Social

Dipak Sengupta

মনে পড়ে যাদবপুরে Combined Social, মানে C.E.T আর C.A.S মিলে আর কি।
আমাদের ছাত্রাবস্থার একটি Social, সম্ভবত ১৯৬২ সালের। সংগীত পরিবেশনে সব স্বর্ণযুগের বাংলার শিল্পীর spectrum, ব্যাতিক্রম বোধহয় সন্ধ্যা মুখার্জী, তিনি আসেন নি। গান শুনে সেদিন আমরা সংগীত-রসে ভেসেছিলাম। কালজয়ী শিল্পীর কয়েকজন ছিলেন দ্বিজেন, তরুণ, শ্যামল, সতীনাথ, ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, অখিল বন্ধু, নির্ম্মলেন্দু, দেবব্রত, সুপ্রীতি, উৎপলা, প্রতিমা, আরও অনেকে আর ছিলেন স্বয়ং হেমন্ত মুখোপাধায়।
এই অনুষ্ঠানেরই দুএকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলি!
প্রথম ঘটনা :
রাত বারোটার পরে। সুরমুর্ছনায় আমাদের মত শ্রোতারা তখন আন্দোলিত। একসময় ঘোষণা হল, এখন গান শোনাবেন দেবব্রত বিস্বাস। শিল্পী মঞ্চে প্রবেশ করলেন,পরিধানে ধুতি, সম্ভবত সার্ট, আর একটা কালো জহর কোট। স্টেজের ওপর হাঁটু মুড়ে বসলেন, পরক্ষণেই যেন পরম মমতায় সযত্নে হারমোনিয়ামটি কোলে তুলে নিলেন অর্থাৎ হাঁটুর ওপর, তবলচির দিকে কিসের যেন ঈশারা, ঠেকা শুরু হল, জলদ গম্ভীর মন্দ্র সপ্তস্বরে যে গান তিনি শুরু করলেন, না --- সে কোন রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়, অবাক হয়ে আমরা শুনলাম,
"বিল্লব চারিদিকে, বিল্লব আজ .... "
বিলম্বিত লয়ে অবলীলায় তারপরে পৌঁছালেন, " অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি .... "
আমরাও অবাক --- দেবব্রত আর অবাক পৃথিবী!! এই গানটা গাইবার পর শিল্পী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ময়মনসিংহ ভাষায় যা বলেছিলেন, তার বক্তব্য অনেকটা এ রকম ছিল, IPTA র জন্য এই গানটাকে গ্রামে গঞ্জে গেয়েছি, এরপর এল হেমন্ত। বুঝতে পারলাম, এই তো সেই ঈশ্বর-কণ্ঠ, যে কণ্ঠ সলিলের সুরকে আপামর জনতার মর্মস্থলে বিঁধিয়ে দেবে! আজ মঞ্চে ঢোকার আগে দেখলাম, হেমন্ত গান শোনাবার জন্য অপেক্ষারত। তাই তার গান গেয়েই তাকে শ্রদ্ধা জানালাম, এরপর আমি গুরুদেবের গান শোনাব। শুরু হল, "তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই, আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী, মেঘ বলেছে যাব যাব রাত বলেছে যাই, দীপ নিভে গেছে মম নিশীথ সমীরে, আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি" ইত্যাদি আরও গান, থামলেন যখন, প্যান্ডালের ভেতরে যেন করতালির resonance. পরের শিল্পী ছিলেন উৎপলা সেন। তাঁর গলার কয়েকটি গানে কিন্তু আসর জমল না। এর পর ঘোষণা হল, গান শোনাতে আসছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
ধীর পায়ে যাঁর মঞ্চে প্রবেশ, তাঁর অজানুলম্বিত বাহু, সাদা ধুতির সাথে সাদা পুরোহাতা সার্ট, ব্যাক্ ব্রাশ করা চুল, চওড়া কপাল এবং মোটা কালো ফ্রেমের চশমার ফাঁকে হাসির ঝিলিক। তিনি ব্যারিটোন গলায় বল্লেন, যেখানে গান গাইতে এসেছি, সেটা আমার শৈশবের শিক্ষাভূমি, যাদবপুর, তোমায় যুক্তকরে প্রণাম। মনে হল, Veni Vidi Vivci র জলোছ্বাস আর রূপ একসাথে আমরা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করলাম। তার পর হেমন্ত তাঁর ঐশ্বরিক কণ্ঠে বল্লেন, "আমাদের পরম্পরা বলে, অগ্রজকে সন্মান জানাবার অধিকার অনুজর। তাই প্রথমেই আমি এই গানটি গেয়ে আমার অগ্রজ দেবব্রত বিশ্বাস মশাইকে তাঁর গান গেয়েই শ্রদ্ধা জানাই!" তিনিও শুরু করলেন, "অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি, ... "। এরপর, পরপর কয়েকটি রবীন্দ্র সংগীগ, তার পর শুরু হল বাংলা আধুনিকের যাদু আর হিন্দী গীতের সুরলহরী। সময় স্তব্ধ, আমরা নিঃশব্দে ভেসে চল্লাম, ভেসেই চল্লাম। সব শুরুরই শেষ আছে, আমরা কতক্ষণ হেমন্ত স্রোতে ভেসেছিলাম, আজ আর খেয়াল নেই। শুধু মনে পড়ে, এক সময় সেই ব্যারিটোন গলার গান থামলো, যুক্তকরে হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়েছেন, আর তখনই গোটা প্যান্ডেল জুড়ে কোরাসের গর্জ্জন, আরেকটা - আরেকটা। শিল্পী আরেকবার বসলেন, বল্লেন, আপনাদের অনুরোধে আরেকটা গান

শোনাব, কিন্তু তারপর বিদায় চাইব, আমি ক্লান্ত। সত্যি মনে হল, টানা ঘন্টা দুয়ের বেশী গান শুনিয়ে গলায় ক্লান্তি এসেছে, তাও গায়কীতে, উচ্চারণে, নিবেদনে আর সুরের আবেদনে গানটি সকলের মর্মভেদ করল। জলদ গম্ভীর কণ্ঠের কারুণ্যঘন আবেদন, "যে বাঁশি ভেঙে গেছে, তারে কেন গাইতে বল, কেন আর মিছেই তবে সুরের খেয়া বাইতে বল।" এক সময়ে শেষ হল গান, রাতের শেষ প্রহর, যেন - যে বাঁশি ভেঙে গেছে, সেই বাঁশিরই হাহাকার চারিদিক নিস্তব্ধতায় ভরিয়েছে।

এরপর কিছুক্ষণ বিরামের পর শুরু হল উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর। উচ্চাঙ্গ সংগীত আমার কাছে Fourier series এর মত দুর্ব্বোদ্ধো ছিল, ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার না পেলেও দুর্ব্বোদ্ধোতার প্রতি শ্রদ্ধা তো ছিলই। যাক্, যা বলছিলাম। এই আসরে প্রথম শিল্পী ছিলেন বাদ্যযন্ত্রী, বংশী বাদক, সংগে তবলার অনুষঙ্গ তো ছিলই। রাত্রির শেষ প্রহর তুমি বোঝ আর না বোঝ, সুরমুর্ছনা তোমায় আকৃষ্ট করবেই।

এর কিছক্ষণের মধ্যেই ঘটল সেই দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি। যা এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। এবার আসি সে ঘটনায়।

আমরা চার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাশাপাশি বসেছিলাম। তপন (ঘোষ), আমি, প্রণব আর অমর, four musketeers. প্রিয়তম বন্ধু তপনের প্রখর মেধা থেকে উদ্‌ভুত হঠাৎ হঠাৎ আপাত-গম্ভীর কণ্ঠের witty joke, নিজে না হেসে অন্যকে হাসাবার ক্ষমতা বা কোন পরিকল্পিত মজার পরিবেশ তৈরী করার মত ব্যাপারে তপনের পারদর্শিতায় ছিল শিল্পের সুষমা। তপন বল্ল, "চল্, আমরা গুজবের গতিবেগ মাপার চেষ্টা করি।" গাড়ির গতি মাপা যায়, শব্দতরঙ্গের গতিবেগও মাপা যায়, এবার গুজবের গতিবেগ মাপা? কিমাশ্চর্যম্! পদ্ধতিটাও তপনই বল্ল। Calculus এর Infinite Series related কঠিন Integration থেকে শুরু করে Fluid Mechanics এর Entropy বা Enthalpy অথবা IC Engineএর Power Transmission ---- ইঞ্জিনীয়ারিং এর যে কোন দুরূহ বিষয়েই তপন আশ্চর্য্যরকমের তীক্ষ্ণধী। তবে এই 'গুজব' এর গতিবেগ মাপার পদ্ধতিটা তপনের একেবারে নিজস্ব নবতম উদ্ভাবন। আর তপনের পরামর্শ মতই আমরা চারজন আমাদের কাছাকাছি বসে থাকা এক এক জন শ্রোতার কানে এ রকম একটি খবর ভাসিয়ে দিলাম যে কিছুক্ষণ আগে খবর পাওয়া গেল পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সে দেশের সেনা-বিদ্রোহে গুলি বিদ্ধ হয়ে সেদিন রাতে নিহত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে স্পর্শকাতর সংবাদ, আয়ুব খান সে সময় আপামর বঙ্গবাসীর কাছে এক নিন্দিত ব্যাক্তি, তাঁর পরিকল্পিত হিন্দুবিদ্বেশকে হেড্ লাইন করে, দিন দুয়েক আগের আনন্দবাজারে বড় বড় মোটা মোটা হরফে খবরে লেখা হয়েছিল : 'পাকিস্থানে আয়ুবশাহী জঙ্গীচক্রের পাক্ কুম্ভীপাকে হিন্দুমেধ।' সে যাই হোক, আমি আমার পাশে বসা একজনের কানে অতি নিম্ন কণ্ঠে খবরটি বল্লাম, অনুরূপ ভাবে বাকী তিন বন্ধুও তাই করল।
মনে নেই, ঠিক এর কতক্ষণ পরে, তবে পাঁচ মিনিটের বেশি নিশ্চয়ই নয়, পুরো গ্যালারী (প্যান্ডেল) জুড়ে ফিস ফিস করা কণ্ঠে ভাসতে লাগল একটাই কথা, "আয়ুব খান মারা গেছে", "আয়ুব খান মারা গেছে"। ঠোঁটে কৌতুক-হাসি ভাসিয়ে নিয়ে তপন বল্ল, গুজবের গতিবেগ কিছুটা আন্দাজ করতে পারলি তো! ইতিমধ্যে ডায়াসে বাঁশির ধুন শেষ হয়েছে, মঞ্চে এসেছেন বিখ্যাত কোন উচ্চাংগ সংগীতের কণ্ঠশিল্পী। আজ এতদিন পরে তাঁর নাম মনে নেই। তানপুরায় সুর বেঁধে নিয়ে শিল্পী বল্লেন, "রাত্রির শেষ প্রহরের সংগে মানানসই রাগসংগীত, মন দিয়ে শুনলে, কথা দিচ্ছি, ভাল লাগবে। আমি বেহাগ দিয়ে শুরু করে ভৈরবে বিস্তার করবো।" কিছুক্ষণের মধ্যে শিল্পীর মন্দ্রসপ্তকের সুরধনী কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকলো সবাইকে। কতক্ষণ কেটে গেল জানি না, ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজে গেছে।
হঠাৎ তপন বল্ল, "চল্, একটু বাইরে বেরিয়ে শেষ রাতের ভোরের আকাশটা দেখে আসি!" আমরা চারজন প্যান্ডেলের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরোলাম। বাইরে বেরিয়েই শুনতে পেলাম দুয়েকজন অতিথি শ্রোতা বলাবলি করছেন যে তাঁরা আর প্যান্ডেলে ঢুকবেন না, বরং যাদবপুর স্টেশনে গিয়ে প্রথম লোকালে আসা সেদিনের নিউজ পেপার কিনবেন, আয়ুব খানের মৃত্যুর ব্যাপারটা আরও বিষদে জানতে

পারবেন। বুঝলাম, তপনের মস্তিস্ক-প্রসুত মৃত-আয়ুব খান, খবরের উৎসস্থান থেকে বেরিয়ে এখন সোজা ট্রেনে চেপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বেন।
আমরা আবার প্যান্ডেলে ফিরে এলাম, দেখলাম প্যান্ডেল-ভর্ত্তি সমবেত শ্রোতাবৃন্দের শরীর সুরের তালে তালে আন্দোলিত হলেও, কেমন যেন প্যান্ডেলভর্ত্তি প্রতিটি মানুষের চোখে মুখে চাপা উদ্বেগ জাতীয় অভিব্যক্তি। বুঝলাম আমাদের ভাসিয়ে দেওয়া গুজব, তার প্রভাবকে চারিদিকে কেমন ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যেন Pasal's Law চাক্ষুষ করলাম, "Pressure-change in a confined fluid is transmitted unopposed in all directions."
কিছুক্ষণ পর প্রভাতী সূর্য্য তার আলোক-বন্যা ছড়াতে শুরু করলো আর সময়ের সংগে সামঞ্জস্য রেখেই যেন মঞ্চে কণ্ঠের সুপ্রভাতের রাগিনী ধীরে ধীরে খাদে নেমে মিলিয়ে গেল। সারা রাত ব্যাপি সোশ্যাল শেষ হল।
মনের ভেতরে সংগীতের অনুরণন, শরীরে রাত-জাগা ক্লান্তি, চলনের অভিমুখ যাদবপুর স্টেশনের দিকে, বাড়ী ফেরার তারা আর তপনের ঠোঁটে সাফল্যের চওড়া হাসি, আসে পাশে চারিদিকে একটা কথাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে "আয়ুব খান মরেছে"।
হয়ত এ ঘটনা তোমাদের ভাল লাগবে না, কারণ ঘটনাটার বিস্তারে যাদবপুর অনুপস্থিত, তবু প্রেক্ষিততে তো যাদবপুর আছেই, তাই একটু ইতস্তত করে হলেও স্মৃতির ঝাপি খুলেই দিলাম।

Futher contributed by:
***Asish** : দীপক একজনকে বোধহয় বাদ দিলি। রবিশঙ্কর কে নিয়ে এসেছিলাম আমি গিয়ে।*

***Manas**: Jodio ami oi onusthane uposthit thakte parini kintu sunechilam Dhananjay Bhattacharjee tar udatto kanthe 'Matite Janmo nilam' gaanti geyey chilen.*

***Asish** : মনে আছে রবিশঙ্কর খুব drink করেছিলেন। Stage এ ওঠার সময় দুবার হোঁচট খেয়েছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন stage টা কোনো architecturial design কিনা। আমি বলেছিলাম পাতি ডেকরেটরের Design.*

***Manas**: Amar mone porche Ashis er barite ekdin evening e amra koek jon Jadu bhai uposthit hoyechilam. Ami oidin Matite jonmo nilam gaan ti geyechilam ebong gaaner seshe Dipak chair theke uthe ese amake jorie dhorechilo. Eta amar jiboner bishes upohar. Oidin hoyto golata bhalo chilo. Sob din thake na.*

***Prasun**: Deepak..abar firey esecho tomar otuloniyo smriti bhander niye.*
1962 er social money poratey khoob bhalo laglo. Nirmalendu palligeeti sobai key nachiey diey chilen
" nachoto dekhi bala ,nachoto
Dekhi .." aar
" orey o.. Kanai par korey dey amarey..kanu heno guno nidhi..sorbo sokhi par koritey nibo ana ana , aar
Radharey paraitey nibo, nibo kan er sona.... "
most of the lumineries of yester years entertained us in that event.!!
Thank you for the walk down the memory lane.

***Dipak Sengupta**: বাবু, আশিস ও বন্ধুরা, যতদূর মনে পড়ে, আমি যে social এর বর্ণনা দিয়েছি, সে বছরে নয়, তার পরের বছরের অনুষ্ঠানের শিল্পী ছিলেন একসাথে ত্রয়ী, তিন দিকপালের*

synchronised symphony - রবিশঙ্কর, আলী আকবর আর আল্লারাখা, অবিস্মরণীয় সে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছিল সকাল সাড়ে ছটার পর। এই অনুষ্ঠান নিয়ে পরে লেখার ইচ্ছে রইল। আগে জানতে হবে, তোদের ভাল লাগছে কি না!

আরেকবার Social এর কথা
দীপক সেনগুপ্ত

আগেকার স্মৃতিচিত্রন পড়ে আশিস লিখল, 'দীপক একজনকে বোধহয় বাদ দিলি। পন্ডিত রবিশঙ্কর কে নিয়ে এসেছিলাম আমি গিয়ে।'

বন্ধুবর বিশ্বজিত (বাবু) লিখল, "I remember that Ravishankar played Ahir Bhairo. Also Ali Akbar in Sarod jugal bandi? Allah Rakha in Tabla and he gave his kid boy Zakir Hussein to play tabla in teo numbers?

আর বন্ধু উৎপল (সেনগুপ্ত) লিখল, 'দীপক - তোমার মত অতটা আমার মনে নেই তবে ৬১-৬২ র সেই বিখ্যাত সোশ্যাল দুই অর্ধে ভাগ করা ছিল - প্রথমে আধুনিক - রবীন্দ্র সঙ্গীত, পরে ক্লাসিক্যাল। আর ক্লাসিক্যাল শুরু করেছিলেন সুনন্দা পটনায়ক গুরু ওমকারনাথ এর স্তোত্র বন্দনা, সম্ভবত ' যোগী মাতু যা...' দিয়ে । তারপর আলী আকবর এর ছেলে আশীষ খান বাজিয়েছিলেন। শিশির কণা ধর ও ছিলেন। একেবারে শেষে আমরা যখন পরিতৃপ্ত, তখন এসেছিলেন নিখিল ব্যানার্জী - দের ঘণ্টা বাজাবার পড়ে মুগ্ধ শ্রোতাদের বললেন- বাইরে এখনও অন্ধকার, প্রথম বাস বা ট্রেন তো পাবেন না- একটু সময় দিলে আমি একটু বাজাতাম। আমরা ঘুম জড়ানো চোখে চিৎকার করে বলেছিলাম বাজান। উনি ভোর বেলাকার আহেরী ভয়রো বাজালেন - 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি.....'! বাজানো যখন শেষ হলো আধো-অন্ধকারে প্রথম ট্রেন এর বাঁশি শোনা গেলো! মনে হয়েছিল 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ ' ! এই কাহিনী কতবার যে বলেছি - কোনোদিন ভুলবো না! স্মৃতি সততই সুখের!!'

এ সব গুলোই তিনিটে আলাদা আলাদা বছরের Social এর কথা।

প্রথমটা আমার স্মৃতি চিত্রন - যা আগেই লিখেছি।

তৃতীয়টা উৎপল বর্ণিত। উৎপলের কাছে অনুরোধ রইল এই Social টা নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত লেখার।

দ্বিতীয়টাতেই, কোন year মনে নেই, যেটা বন্ধু বিশ্বজিত লিখেছিল - ছিল রবিশঙ্কর-আলী আকবর-আল্লারাখার একত্র উপস্থিতি।

যেটা বলছিলাম।

এটা বন্ধু বিশ্বজিত উল্লেখিত সেই Social টির কথা, যে Social এ একসঙ্গে রবিশঙ্কর-আলী আকবর-আল্লারাখার অবিস্মরণীয় উপস্থিতি, যা জীবনের চিরকালীন অভিজ্ঞতার একটা। শুধু উল্লেখই করবো, কারণ সঠিক ভাষার প্রয়োগে সে ঘটনাগুলোর স্থিরচিত্র আঁকার তুলি আমার করায়ত্ত নয়।

JU র combined Social, স্টেডিয়ামের আকারে বিশাল ধনুকের কাঠের গ্যালারী, চার ধাপের, চোখের আন্দাজে মনে হয় কুড়ি হাজারেরও বেশী দর্শকাসন। ফাংশন যখন শুরু হল, আসন কানায় কানায় পূর্ণ। জমাটি জলসায় প্রথম থেকেই জমিয়ে রেখেছিলেন নামী দামী শিল্পীরা। কয়েকজনের কয়েকটি গান মনে আছে। নির্মলেন্দু তাঁর উদাত্ত গলার জাদুতে গাইলেন আর নাচালেন "আহা যেমন নাচেন নাগর কানাই, তেমনি নাচেন রাই, একবার নাচিয়া ভুলাও তো দেখি, নাচিয়া ভুলাও তো দেখি নাগর কানাই, বালা নাচো তো দেখি .... ", মানবেন্দ্র গাইলেন " হয়ত বা ফার্মাকোলজিটাই নিয়ে আজ লেকচারে নাববো, লেকচারে নাববো লেকচারে নাববো-ও-ও-ও ক্ষতি কি ..... ", ধনঞ্জয় গাইলেন "মাটিতেই জন্ম নিলাম, মাটি তাই রক্তে মিশেছে ..... ", দ্বিজেন তাঁর ভরাট গলায় গাইলেন " ক্ষমিতে পারিলাম না, ক্ষম হে মম দীনতা, পাপী জন শরণ প্রভু ...."। এর পর জমেছিল মিন্টু দাশগুপ্তের গলার প্যারডি আর তুলসী আচার্য্যের কৌতুক নকসা। মিন্টু দাশগুপ্ত সতীনাথের নকলে গাইলেন "রেশনের দিনে ক্ষমা কর ভগবান। আমি চলে গেলে .... ", আর তুলসী আচার্য্য তাঁর নক্সায় বল্লেন, ", পান চিবোতে চিবোতে ধনঞ্জয়বাবু গান ধরলেন 'আলসার পেটে মাংসতে কিবা ফল, ওটা খেয়েই আজ হল যেগো অম্বল, লোভে লোভে তুই হারালি রে সম্বল, মাংসতে কিবা ফল .. "

এখন তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রথমটিতে আসা যাক, এটি ত্রিগুণা সেন যাদু --

অনুষ্ঠানে ছিলেন এক জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। কিন্তু আসর জমল না, প্যান্ডেল জুড়ে শুরু হল গুঞ্জন। বেশীক্ষন এই অনুষ্ঠান চল্ল না। এরপর শিল্পী হিসেবে ঘোষিতা হলেন এক বিখ্যাত মহিলা শিল্পী। মধ্যরাতের একটু আগে উগ্র সাজ, ঠোঁটে মোটা লিপস্টিক, চোখে মোটা কাজল, গালে রুজ্, ঈশৎ স্থুল বপু, গান শোনার আগে থেকেই হাততালি শুরু, গুঞ্জন বেড়ে কোলাহল, প্যান্ডেল ক্রমশ অশান্ত, শিল্পী গান গাইতে বসলেন, কোলাহল উচ্চগ্রামে পোঁছাল, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আয়ত্ত্বের বাইরে যাবার উপক্রম। ঠিক এ রকম একটা পরিস্থিতিতে মঞ্চে প্রবেশ করলেন ডাঃ ত্রিগুণা সেন। ঋষি সুলভ চেহারা, বিরাট জনতাকে সন্মোহিত করার যাদু, নিজের ওপর অগাধ আস্থা আর জলদ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মাইক হাতে নিয়ে উপস্থিত উদ্দাম জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বল্লেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসেবে আপনাদের আমি একটা কথাই বলতে চাই, আপনারা আমাদের সন্মানিত অতিথি। আমার ছেলেরা আপনাদের আমন্ত্রন করে সসন্মানে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি আশা করবো, আপনারা এমন আচরণ করবেন, যাতে আমার ছেলেরা আপনাদের মত সন্মানিত অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা করার সুযোগটুকু পায়। এই সংগীতানুষ্ঠান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব। এখনও অনেক স্বনামধন্য শিল্পী তাঁদের অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় রয়েছেন। আশা করবো আপনারা শান্ত হবেন, আসুন আপনাদের মর্য্যাদার সংগে সামঞ্জস্য রেখেই, আমরা আপনাদের মর্য্যাদা রক্ষা করি!" চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলাম একজন ঋষিতুল্য অধ্যাপক-প্রশাশক এবং এক বিপর্যয় রোধে তাঁর প্রশাশনিক দক্ষতার ম্যাজিক। প্যান্ডেলজোড়া কোলাহল শান্ত হল। এই হলেন আমাদের পরমারাধ্য অভিবাবক ডাঃ ত্রিগুণা সেন।

এবার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রাক্ কথন। মঞ্চে উপস্থিত শিল্পী গান শুরু করলেন। শিল্পীর প্রথম দুটি গান নিরুপদ্রপে শেষ হল। কিন্তু বিধি বাম, হঠাৎই গ্যালারীর একদিকে কয়েকটা ধাপে ছোট একটা ধ্বস নামল, আবার শুরু হল কোলাহল, ক্রমশ পুরো গ্যালারি ছড়াল, শুরু হল চিৎকার চেচামেচির ঐকতান। যেন গর্জনের জলোচ্ছ্বাস। ডায়াসের শিল্পী কোনভাবে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করে বাঁচলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্যালারীর ভাঙা অংশের শ্রোতারা স্থানান্তরে স্থিত হলেন।

এবারে ঘটনাটির আনুপূর্বিক বিবরণ যা অকল্পনীয়, অভুতপূর্ব্ব, চমকপ্রদ।

মাইকে ঘোষণা হল, এবার গান শোনাবেন শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তবলা সঙ্গতে রাধাকান্ত নন্দী। তখনও কিন্তু গোটা প্যান্ডেল জুড়ে অবিন্যস্ত চিৎকার-চেচামেচির ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে। শিল্পীদ্বয় এই রকম এক বাঁধভাঙা বিশৃংখল উচ্চগ্রামের কোলাহলমুখর পরিবেশের মধ্যে ডায়াসে ঢুকলেন, শ্রোতাদের উদ্দেশে করজোড়ে নমস্কার করে একজন হারমনিয়ম কাছে টেনে নিলেন, অন্যজন তবলা আর বাঁয়া। পর মুহূর্তেই হঠাৎ যেন প্যান্ডেল ভর্ত্তি হৈ হৈ চীৎকারে-রত প্রতিটি অশান্ত জনতার একেবারে হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করল এক আকুল আর্ত্তি, যেন বিঁধল বাঁশির এক কণ্ঠ-লালিত্বের তীর -- "কি গান শোনাব বলো গেয়ে" পরমুহূর্তেই রাধাকান্তের জবাব তবলায়, তারপর আবার বাঁশির কণ্ঠ "কি গান শোনাবো বল" কথাকটি তিনবার কণ্ঠমাধুর্য্যের লালিত্যে ভরা ওঠা নামা দিয়ে বিভিন্ন লয়কারী দিয়ে গাইতে থাকলেন "কি গান শোনাব বল গেয়ে, আমি লুকাতে পারিনি অশ্রুরেখা তোমার মুখের পানে চেয়ে, কি গান শোনাবো বল গেয়ে"। আজ এত যুগ পার করেও আমি আমার মনের আয়নায় দেখতে পাচ্ছি একটা জ্বলন্ত অগ্নুৎপাতের মাথায় বিশাল বিশাল বরফের চাঁই পড়ছে, অগ্নুৎপাত মুহূর্তে নির্ব্বাপিত, যেন 'pin drop silence'এর এক আক্ষরিক সংগা। কুড়ি হাজারেরও বেশী অশান্ত জনতা কয়েক মুহূর্ত্তে সন্মোহিত। এ আমার নিজের চোখের উপলব্ধ music therapy. এই গানের শেষ লাইনের রেশ কাটার আগেই আবার শুরু হলো "মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা" এবার তবলার ঠেকা, যেন কণ্ঠীর উদ্দেশে যোগ্য প্রত্যুত্তরের আহবান, উত্তরে আবার মায়াবতী মেঘে তন্দ্রার ঘোর নামলো, এভাবেই চ'ল্ল কণ্ঠ আর তবলার মোহময় যুগল-বন্দী। কতক্ষণ চলেছিল এই সাংগীতিক জাদু, আজ আর তা মনে নেই। আমরা গানে গানে শুনেছিলাম কোন এক গীতিময়কে কিছু মনে করাবার এক বেদনার্ত্ত আকুতি, চন্দন পালঙ্কে একা একার বেদনা, এক অশ্রুঝরানো বেদনার পরশ 'চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়, আমারো সমাধি পরে' তারপর চল্ল 'মধু মালতী ডাকে আয়' 'আর ডেকো না এই মধু নামে' 'এ শুধু গানের দিন, এ লগন গান শোনাবার' এবং আরও অনেক। একসময় কণ্ঠ স্তব্ধ হল, স্তব্ধতর হল গোটা কুড়িহাজার শ্রোতৃমন্ডলী। তারপর শিল্পী উঠলেন, গোটা প্যান্ডেল জুড়ে ঐকতানে হাততালির reverberation।

এবারে তৃতীয় ঘটনাটি। ক্ষমা কর বন্ধুরা, আমি শুধু ঘটনার সুত্রধার, বর্ণনা করার মত ভাষার যাদুকরী বিদ্যা আমার আয়ত্ত্বাধীনে নেই। 'ক্ষম হে মম দীনতা'।
একসঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করলেন সংগীত-জগতের ভূবনজয়ী ত্রয়ী - সেতারের পন্ডিত রবিশঙ্কর, সরোদের ওস্তাদ আলী আকবর আর তবলার জাদুকর আল্লারাখা, তিন মহাসাগরের সঙ্গম। 'ভীম পলশ্রী' দিয়ে শুরু, শেষ আহীর ভৈরব দিয়ে। মাঝে ছিল তিন সাগরের কলোচ্ছ্বাস, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ! সুরের জাদুতে সর্বাঙ্গ শিহরিত। তিন মহাসাগরের মোহনায় এসে বসেছিলাম আমরা মধ্যরাতের মধ্যযামে, অনেক পরে দেখলাম মোহনায় সূর্য্যোদয় হল, আমরা সন্মোহিত হয়ে বসে আছি, বসেই আছি, সময় তার হিসাব হারিয়েছে, কখন যেন সূর্য্য আকাশের একটু উঁচুতে উঠল, এর পর শিল্পীত্রয়ীর হাতের কথাবলা একটু একটু করে স্তিমিত হল। যবনিকা পড়ল JU আয়োজিত সোশ্যালের এক মহা অনুষ্ঠান। প্রতিটি শ্রোতার মনে জুড়ে ছোট গল্পের রেশ 'সাঙ্গ করি মনে হল, হইল না শেষ।' যেন আরও একটু হলে হতো।

স্মৃতি বয়েই চলেছে, এবার কি ঘটনা কি, এখনই বলতে পারব না। আপাতত মনকে শান্ত রাখার প্রচেষ্টায় আমি দীপক।

My Memories on JU
Saurabh Basu

[1]

After graduation in '63 I stayed in JU for two more years for post-graduation. At that time, I got the company of Achintya Basu (Elect.), then a research scholar in HV Engg. and Pratyush (Telecomm), a student of Civil Engg. for dual degree. Not only then but next two decades I spent quality time with Abhindra Nath Chatterjee (Civil), one of my dearest friends and Arunava Chatterjee (Elect.). not only a friend but my hero also. During professional life for different periods I got the company of Tapan Chatterjee, Prakash Kejriwal, Biren Sarkar (all Elect.) and Paresh Sarkar (Telecomm).

Luckily I could attend golden jubilee meeting at JU in Jan' 13. There I met Abhindra, Tapan and Arunava after a gap of 2 decades and Santosh Guha, Subrata Deb, Bikash Chanda (all Elect.) and Manasendu Banerjee after a gap of 5 decades. On that day I being a resident of A block of Engg. hostel for 4 years was bit frustated due to my inability to recognise and chat with a lot of my the then hostel-mates.

I may be permitted to add here that myself, Bimalendu Konar (Telecomm), Aloke Chakrabarty and Amarendra Kundu (both Chem.) came together from Burdwan town to join JU. I knew one Debdas Ghosal who was one-year senior to me and like me received invaluable coaching of respected teacher Kalikrishna Mitra. He had to skip study for 2/3 years due to his sinus problem.

How I wish were WhatsApp available sixty years back, we could have been in touch throughout with each other and share our thoughts, activities and tribulations.

However, for the present, let me renew my my friendship with all the friends in the group. I thank you Ashish for your message. Still I remember how lovely way you used to tease Bimalendu Konar, and for that matter a few others also.

I am saddened to learn that Priyabrata is no more. As soon as I hear the name Priyabrata, a scene appears before my eyes. Let me describe. In 3rd year for Electrical Machine Lab, our group consisted of six students as follows: Roll no.1- myself, 2 - Prakash Kejriwal, 3 - Santosh Guha, 4 - Byomkesh Chakrabarty (he stood 1st from 3rd year to final year, joined Durgapur steel plant and committed suicide more than 50 years back), 5 - Priyabrata Ganguly anf 6 - Barun De (stood 1st in final year). Every week one experiment. Let me picturise: we enter the lab with experiment sheet. The technician indicates the place and goes away as per instruction of the teacher. Prakash hands over to me neatly arranged six sheets and tells to note down the data. He says that he is going to canteen and I should inform him in case of any urgency. In one corner Priyabrata & Barun start fierce argument on the theoretical aspect of the allotted experiment. On the other side Byomkesh starts connecting apparatuses and machines with wires. Santosh watches for some time and shouts everything is wrong and disconnects.Then he starts connecting according to his funda. Within minutes Byomkesh disagrees with connections and pulls out wires.The scenario goes on. One connects and the other disconnects. Priyabrata and Barun are engaged in their arguments without bothering the fate of the lab work. I wait wondering when the arguments will end, when the connection will be okayed and the data will be dictated to me to note.The situation is hilarious and somewhat pathetic for me as I am looking forward to go to hostel and then to canteen for afternoon tea and snacks. Finally, everything gets settled almost at the far end of the lab period. All is well that ends well. This scene was repeated every week throughout the year. Prasun might recall.

স্মৃতি সততই সুখের
সৌরভ বাসু

দুটো ঘটনার কথা বলি। প্রথমটা - আমাদের ফাইন্যাল ইয়ারে জনাকয়েক ক্লাসমেট যোগ দেয়। সিনিয়র হওয়ার সুবাদে আমরা নামের পাশে 'দা' লাগিয়ে ডাকতাম। একদিন ডি কে দেব স্যারের পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর হঠাৎ শুনি প্রচন্ড হৈ চৈ। পিছন ফিরে দেখি দুই দাদা(দু/তিন দিন চেষ্টা করেও নাম মনে করতে পারলাম না- কেউ'63 ইলেক্ট্রিকাল সাহায্য করতে পারবে) চেঁচামেচি ও ধস্তাধস্তি করছে - প্রায় হাতাহাতি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সবাই দৌড়ে গেলাম। একজন বলছে - "তুইই তো আমার থেকে টুকলি, আমি কি করবো, আমি কি বলেছিলাম টুকতে? টুকতে গেলি কেন?" অপর জন বলে যাচ্ছে- "প্রশ্নপত্র পাওয়ার পরেই তুই যে গতিতে লিখতে লাগলি, তাতে ভাবলাম তুই সব উত্তর জানিস। এমন জানলে অন্য কারুর থেকে টুকতাম। অন্তত কিছু নম্বর তো পেতাম। আসলে দেব স্যার তাঁর বিষয়ের পিরিওডিক্যাল পরীক্ষার নম্বর ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়েছিলেন। দুই দাদার রোল নম্বরের পাশেই লেখা ছিল - শূন্য। সেবার কোনরকমে স্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছিলো।

এবার দ্বিতীয় ঘটনা -- আমাদের স্যারেদের দুই একজন ফাইলে আটকে রাখা লেখা নোট দেখে পড়াতেন। একজন নোট ডিক্টেট করতেন এবং আরেকজন বোর্ডে লিখে দিতেন। আমরাও খুশী খুশী নোট সব টুকে নিতাম।
একদিন নীতিশ (Dr. N.N.Roy) বাবু দ্যার বোর্ডে লিখছেন আর আমরাও টুকছি না বোঝার চেষ্টা করেই (বোঝাটা হোষ্টেলে ফিরে গিয়ে করা হয়)
হঠাৎ একজন সিরিয়াস-মনস্ক সম্ভবতঃ বরুণ অথবা প্রসূন হবে- বলে উঠলো- কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না স্যার। তাইতো! এবার খাতার দিকে তাকিয়ে দেখি ওপরের লাইনগুলোর সঙ্গে নীচের লাইনগুলোর কোন continuity নেই । নীতিশ বাবু বোর্ড ছেড়ে নোটের দিকে তাকালেন। তারপর শুরু হল একবার বোর্ড দেখা একবার নোট দেখা। মিনিটের পর মিনিট যায় - আমরা বিমূঢ় হয়ে দেখে যাচ্ছি। হঠৎ নীতিশ বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন "পেয়েছি"- আর্কিমিডিসের ইউরেকা বলে চিৎকার করার মত (আমার অনুমান)। ব্যাপারটা কি? নীতিশবাবু যখন নোট দেখে লিখছিলেন তখন জানালা দিয়ে একটা (দুষ্টু!) হাওয়া এসে কয়েকটা পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়। নীতিশবাবুর নোটের পোজিসন জ্ঞান ছিলো। সেই অনুসারে নোটের ঐ অঞ্চল থেকে লিখে গেছেন। ভাগ্যিস ধরা পড়লো। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আজ এই পর্য্যন্ত।

কার্সিয়াংএর লোড সার্ভে
সৌরভ বাসু

কার্সিয়াং এ লোড সার্ভের প্রসঙ্গ যখন টেনেই এনেছি তখন মনের মণিকোঠায় যে গুটি কয়েক হীরে জহরত রাখা আছে, তাদের কথা বলে নিই। হয়তো ওদের তেমন কোন চমক নেই তবু সে স্মৃতিগুলোকে বার করে স্পর্শ করে একটা আলাদা আনন্দ অনুভব হয়।
এক নং -- আমরা বিকেলে উডকট্ পোঁছাই। আগেই বলেছি ওটা চার্চের অধীনে। পরের দিন সকালে এক সৌম্য দর্শন যুবক গলায় ক্রশ ঝোলানো আমাদের সঙ্গে দেখা করে সুবিধে অসুবিধের কথা জানতে চাইলেন। ওঁর সাথে কথা বলার সময় আমরা বারবার ওঁকে ফাদার বলে সম্বোধন করছিলাম আর উনিও কিন্তু ব্রাদার বলে সম্বোধন করতে অনুরোধ করছিলেন। আমাদের সীমিত জ্ঞানে গলায় ক্রশ ঝোলানো

ব্যক্তিমাত্রই ফাদার, ব্রাদার বলে কিছু হয় নাকি! ঘন্টাখানেক কথাবার্তায় আমাদের মুখ দিয়ে ব্রাদার উচ্চারণ করাতে না পেরে হাল ছেড়ে দেন।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও কিছুটা মিল থাকায় আর একটা ঘটনাকে এর সাথে জুড়ে দেওয়ার লোভ সামলানো গেল না। আমাদের ক্লাসে একজন মণিপুরী বন্ধু ছিলো। নাম ওয়েনাম টেম্বা সিং। প্রসুনের লেখায় ওর উল্লেখ দেখেছো নিশ্চয়ই। এখন ইহজগতে নেই। কর্মজীবনে মণিপুর রাজ্যের পাওয়ার মিনিস্টার ছিলো (প্রসূনের লেখা থেকে জেনেছি)। সেকেন্ড ইয়ারে গুহ সাহেব পড়াতেন। ওঁর ক্লাসে রোল নম্বর অনু্যায়ী বসতে হত। উনি নাম ধরে রোলকল্ করতেন। উনি ওয়েনাম টম্বা সিং বলে হাঁকতেন।। আর ওয়েনাম প্রেজেন্ট স্যর বলেই বলে উঠতো আমার নাম টম্বা নয় টেম্বা। গুহ সাহেব হুঁ বলে পরের নামে চলে যেতেন। এক বছর প্রতিটি গুহ সাহেবের পিরিয়ডে এই দৃশ্য দেখেছি। গুহ সাহেব ভুল নামেই ডেকে যেতেন আর ওয়েনাম কারেকসন করতে পিছপা হতো না।কেউই নিজেদের বদলায় নি। ফার্স্ট ইয়ারে ওয়েনামের জন্য প্রসূন শ্রদ্ধেয় গোপাল সেনের কাছে বকুনি খেয়েছিলো। তবু খেয়াল করেনি যে নামটা টম্বা নয়, টেম্বা। বারবার টম্বা লিখেছে।

দু নং-- লোড সার্ভেতে প্রতি বাড়ী ও সংস্থানে গিয়ে তাদের পাওয়ার কনজাম্পসন এবং ভবিষ্যতের ডিমান্ড নোট করার কথা। পথের ধারে একটা প্রাইমারী স্কুল। ওপেন স্পেসে একটা ক্লাস চলছে। পড়াচ্ছেন এক দিদিমনি -- তন্বী তরুণী। ভারী মিষ্টি দেখতে (বিশেষণ যা বোঝায়)। আমরা প্রাঙ্গণে যেতেই ক্লাসের সব বাচ্চারা উঠে দাঁড়িয়ে গানের সুরে কবিতা আবৃত্তি করে গেল। কিছুটা হতভম্ব হয়ে যাই। গান থামলে জিগ্যেস করাতে দিদিমণি জানালো যে অতিথিদের এই ভাবেই অর্ভ্যর্থনা জানানো স্কুলের নিয়ম। দিদিমণি প্রধানের ঘরে নিয়ে গেল।অনুমতি পাওয়ার পর মিস্টি মেয়েটিই প্রত্যেক ক্লাসে নিয়ে গেল। একই ভাবে অর্ভ্যথিত হলাম। নোটও করলাম।এবার ফেরার পালা। মনের মধ্যে যে কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল সেটা বিদায় মুহুর্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। জিগ্যেস করলাম - আপনি কি বাঙ্গালী? মিস্টি হেসে সপ্রতিভ উত্তর দিল- না, আমি নেপালী। ঝরঝরে বাংলা বলে গেছে বরাবর। মনে আজও খটকা-- সত্যিই কি নেপালী? না আমার মুগ্ধ চাউনির জন্য মিস্টি মেয়ের দুষ্টু ঠাট্টা । কে উত্তর দেবে?

স্মৃতি সততই সুখের

ঁঅরুণাভ চট্টোপাধ্যায়

দীপকের প্রাককথন : যাদবপুর-বন্ধুদের মধ্যে অরুণাভ অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন। 'নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'। অরুণাভ-স্মৃতি আমাদের অতি বেদনার। অরুণাভ লিখিত নীচের স্মৃতিচারণটি ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তে আমাদের স্বর্ণ-জয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রকাশিত souvenir থেকে পুনঃসংকলিত

[১]

১৯৫৯ সালের এক সকালে মফস্বলের ছোট এক শহরের বিখ্যাত একটি কলেজ থেকে আই.এস.সি পরীক্ষার মার্কশীট হাতে একসঙ্গে কয়েকজন বন্ধু এসে হাজির হলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিপার অফ মাস্টার রোল-এর অফিসের কাউন্টারের সামনে। উদ্দেশ্য, যে এগারোজন এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে ভর্তির নির্দেশনামা পেয়েছি, তাদের ভর্তি হওয়ার জন্য করণীয় কাজগুলি জেনে পদক্ষেপ করা, আর বাকি যে একজন সেরকম নির্দেশ পায় নি, তার না পাওয়ার কারণ অনুসন্ধান। তখন এখানে ভর্তির মাপকাঠি ছিল আই এস সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উচ্চ মান।

বারোজনের মধ্যে আমি বিনা ইন্টারভিউতে সরাসরি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভরতি হয়ে গেলাম, কেন না সব বিভাগেই প্রথম পাঁচটি করে সীটে ওই নম্বরের উচ্চতার ভিত্তিতে সরাসরি ভর্তি হওয়া

যেত। বাকীদের মধ্যে ৯ জন ইন্টারভিউ দিয়ে নিজেদের পছন্দমত বিভাগ গুলিতে ভর্তি হয়ে গেল। একাদশতম বন্ধু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক করুণাময় রায়ের কাছে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় উনি তার বিশেষ শখ (হবি)র কথা জানতে চাওয়ায়, উত্তর পেলেন "রবীন্দ্র সংগীত"। শুনতে চাইলেন তার গান, শোনার পর বললেন, "তোমাকে এখনই ভর্তি করে নিতে পারলেও আপাতত দিনকয়েক অপেক্ষা করতে চাই। তোমার মতো সুদর্শন, কোমল স্বভাব, ও মধুর কণ্ঠের অধিকারী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার বদলে ডাক্তারি পড়লে বোধহয় তুলনামূলকভাবে দেশের বেশি উপকার হবে। তাই আমার পরামর্শ অনুযায়ী তোমার অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো"। এই বন্ধুটি অবশ্য ডাক্তারি পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ওনার মান রেখেছিল। পরবর্তিকালে ওই বন্ধুটির সাফল্য থেকে বার বার মনে হয়েছে, ভবিষ্যত-দ্রষ্টারা কীাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

যে যার কাজ সেরে আবার কে,এম, আর অফিসের সামনে জমায়েত হচ্ছি, সেখানে পূর্বোক্ত ঘটনাটি শুনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল বহুগুণ। শেষ যে বন্ধুটির তখনও কোন গতি হয়নি, তার কাছে ইন্টারভিউ সংক্রোন্ত কোন নির্দেশ পৌঁছায়নি। সে কেন তা পায়নি, জানতে চাওয়ায় অফিসের একজন প্রশ্ন করলেন, "তুমি এখানে পড়ার জন্য আবেদন-ফর্ম ভরতি করে পাঠিয়েছিলে তো? যদি পাঠিয়ে থাকো, তাহলে হয়ত ভরতির যোগ্যতার নম্বর তোমার নেই!" শুনেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, "আবেদন না করে থাকলে এতগুলি বন্ধুর সঙ্গে কি শুধু শুধু আপনাদের বিরক্ত করতে এসেছি? আর নম্বরের কথা বলছেন? এই দেখুন আমার আই, এস.সি-র মার্কশীট, যাতে আমার নম্বর ওই দুজন (দু বন্ধুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) এখানে ভরতি হয়ে যাওয়া বন্ধুর চেয়ে বেশি। শুনেছিলাম, এখানে ভরতি-যোগ্য ছাত্র দের নামের তালিকা, প্রাপ্ত নম্বর সহ নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেওয়া হয়, তাই কোনরকম কারচুপি হয় না। আমার নামটি ওই তালিকায় না দেখে এখন তো নানারকম সন্দেহ জাগছে মনে।" অভিযোগ শুনে তৎপর হয়ে উঠলেন ওই বাক্তি। বললেন, "এমন অবমাননাকর গুরুতর অভিযোগ শুনতে আমরা অভাস্ত নই, কারচুপি আমরাও মেনে নেবো না। তুমি একটু অপেক্ষা কর, দেখছি গন্ডগোলটা কোথায়?" তিনি চেয়ার ছেড়ে অফিসঘরের পিছনের দেওয়ালের উপরের তাক থেকে একটি মোটা ফাইলে কিছু কাগজ খুঁজতে শুরু করলেন, পেলেন না বলে আর একটি ফাইল দেখলেন, সেখানেও পেলেন না, বোধহয় পেলেন তৃতীয় ফাইলটিতে। সেটি নামিয়ে এনে চেয়ারে বসে এবারে মৃদু হেসে আবার প্রশ্ন করলেন, "সত্যিই তুমি এখানে পড়ার জন্য ঠিকমতো আবেদন ফর্ম পাঠিয়েছিলে তো?" বন্ধুটি "হ্যাঁ'' বলার আগেই আবার প্রশ্ন করলেন "তুমি কোন বিভাগে ভর্তি হতে চেয়েছিলে?" উত্তরে, "কেন, মেটালারজি"। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই উনি অট্টহাস্য করে উঠলেন, ফাইলে ওর আবেদনপত্রটি দেখিয়ে বললেন, "এটিই তোমার আবেদনপত্র তো? দেখ, তুমি মেটালারজি ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রেফারেন্স দাওনি, তাই তুমি অনেক নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের এখানে মেটালারজি পড়ানো হয় না বলেই, তোমার মতো ভালো ছাত্রকে ভরতির কোন সুযোগ দিতে পারলাম না বলে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। তবু অন্যত্র সাফল্যের জন্য রইল আমাদের শুভেচ্ছা"। বন্ধুটির এর জন্য কোন ক্ষতি হয়নি, ওই শুভেচ্ছা নিয়ে সেও ভবিষ্যত জীবনে এক সফল ডাক্তার হয়ে উঠেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমদিন পা দেওয়ার ঘটনা এত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা তোমাদের বিরক্তির কারণ হওয়া সত্ত্বেও বলছি একটাই কারণে - শিক্ষক বা অফিস কর্মচারীর যে মানবিক পরিচয় শুরুতেই পেলাম, তাতে শ্রদ্ধার পাশাপাশি সম্ভ্রমও বেড়ে গেল অনেকগুণ, আমার ভালো লেগে গেল, যাকে কাব্যিক ভাষায় বলা যেতে পারে প্রথম দর্শনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রেম। ভর্তির পরে থাকার সুযোগ পেলাম হস্টেলে, সৌভাগ্যক্রমে হস্টেলের এ-ব্লকে। ঘরে গিয়ে মনটা খুশিতে ভরে গেল, কেন না ঘরগুলি যথেষ্টই প্রশস্ত, দরজার সামনে একটি বারান্দা, যেখানে অফুরান রোদ-হাওয়া, ঘরের সামনেই একটুখানি খোলা জায়গাতেই জিমন্যাসিয়াম, বিরাট লম্বা ব্লকটির মাঝামাঝি করিডর যুক্ত-পথে দু'চার পা পরেই খাওয়ার

ঘর, খাওয়ার ঘরের দোতলাতে কমনরুম। ঘরের ঠিক পিছনেই ব্লকের লম্বা বরাবর ঝিলটির পাড়ে অজস্র নারকেল গাছের সারি, ঝিলের উল্টো পারে নিস্তরঙ্গ প্রিন্স আনোয়ার সাহ রোড, রোডের অপর প্রান্তে নির্মীয়মান যোধপুর পার্ক। ছোটবেলা থেকেই উঠোন-বাগান-গোয়ালা-শোভিত বিশাল বাড়িতে মানুষ হয়ে ওঠা আমাদের মনে হল এখানেও তো প্রকৃতির কোলেই নিজের বাড়ির মতই র'ইলাম - চারটে বছর নিশ্চয়ই স্বস্তিতে ও স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব, এই নিশ্চয়তার সুবাদে আমার ভালো লাগাটা দৃঢ়তর হল।

প্রথমদিন হস্টেলের ক্যান্টিনে খেতে ঢুকলাম, কাকে বা কী খাবার অর্ডার দেব ভাবতে ভাবতে পাশের টেবিলের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার ম্যানেজার কে? তার কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার আগেই দেখি আমার পিঠে আলতো করে হাত দিয়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাঝবয়সী একজন বলে উঠলেন, "আমিই এই ক্যান্টিনের ম্যানেজার, সবাই আমাকে ভূতো কাকা বলে ডাকে, তোমরাও ওই নামেই আমাকে ডেকো। সুতরাং এখানে আমি তোমাদের সবাইকার অভিভাবক স্থানীয়। তবে সেই সুবাদে প্রথম থেকেই জানিয়ে রাখি যে এখানে কিন্তু ধারে খাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

তাঁর অভিভাবকত্বে লাভ হয়েছিল আমাদেরই। মুখ দেখেই বুঝতে পারতেন পকেটের অবস্থা, আর সেই অনুযায়ী বেছে দিতেন খাবারের আইটেম, ছিলেন সদাহাস্যময়, স্নেহপ্রবণ। আবার শাসনে কাঠিন্যও দেখেছি, বিশেষত যখন একবার ক্যান্টিনে বসে একসঙ্গে কুড়িটা ডিম খাওয়ার বাজি প্রায় জিততে বসেছি, সেই সময় ডিম সরববাহ বন্ধ করে দিয়ে টেবিলে এসে শাসানি, "তোমাদের লজ্জা করে না? বেশি খাওয়া দেখাতে হলে "মিষ্টি' বাছতে পারতে, এরকম একটা ক্ষতিকর আইটেম বাছে কেউ?" বাজির যুক্তি দেখাতে গেলে আবার ধমক এবং চপেটাঘাতের হুমকি। বুঝেছিলাম অভিভাবকত্ব অধিকার করা যায় না, তা অর্জন করতে হয়।

সন্ধ্যোবেলাটা বেশির ভাগ দিনই কাটত গড়িয়াহাট বা বালিগঞ্জ লেকে (অধুনা রবীন্দ্রসরোবর) অথবা যোধপুর পার্কে। উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। একদিন গড়িয়াহাটে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছি নির্দিষ্ট জায়গায়। হঠাৎ তপনদা (দাশগুপ্ত) এক অচেনা ভদ্রলোকের হাতে হ্যাচকা টান দিয়ে প্রশ্ন করল "দেখে তো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে, তাহলে আমার পকেটে হাত ঢোকাচ্ছেন কেন?" ভদ্রলোক প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক, তারপর বললেন "পকেট মারি নি, দেখুন আপনার পকেটে কী রেখেছি। একটা চিঠি পোষ্ট করেছি, যেমন প্রায়শই করি, কিন্তু পোষ্টবক্সের স্ট্যান্ডে এমনভাবে পা রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে আপনার বুকপকেটটি পোস্টবক্সের মুখের পাশে যেন তারই ফার্ণিচার হয়ে গেছে, তাই আমার চিঠিটি পোষ্টবক্সের বদলে আপনার পকেটে ঢুকে গেছে।" তপনদার সৌজন্যে চিঠিটি খোওয়া না যাওয়ায় তিনি ধন্যবাদ জানালেন। তেমনই আরেকদিন যোধপুর পার্কের এক ছাপোষসভদ্রলোক হস্টেলের সুপারিন্টেডেন্টের কাছে অভিযোগ জানাতে এসে বললেন "আমার সপ্তম সন্তানের নাম রেখেছি আনারকালী অথচ আপনার ছেলেরা তাকে ডাকে "আর না কালী" বলে।" সুপার ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে বললেন, "ভেবে দেখুন, খুব একটা ভুল তো বলেনি।"

হস্টেলে ফিরে আসতে হত সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে। তারপরে ফিরলে, আধখোলা গেটে চেয়ার-টেবিল-ঘড়ি নিয়ে পাহারায় বসে থাকা বাহাদুরের সামনে একটি খাতায় তারিখ ও সময়সহ নাম ও রুম নম্বর লিখে ভিতরে ঢুকতে হত। একবার সুপারিন্টেডেন্ট সেই খাতা দেখে প্রথম থেকেই দুষ্টু-চিহ্নিত আমাদের কজনকে ডেকে বললেন, "আমাদের কী সৌভাগ্য, ফ্রাঙ্ক ওরেল, গ্যারি সোবার্স, নীল হার্ভে, পেলে, গ্যারিনচা ইত্যাদির মতো বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়রা হস্টেলে রাত কাটিয়ে যাচ্ছেন। হস্টেলের সুরক্ষার জন্য তোমরা একটু তৎপর থেকো কিন্তু।" বুঝে গেলাম, তাই তারপর থেকে খাতায় লেখার সময় বাহাদুরকে

একজন কথোপকথনে অন্যমনস্ক রেখে বাকিরা একে একে খাতার পাতার অনেক উপরে শূন্যেই কলমটা চালিয়ে যেতাম।

সে যুগেও লোডশেডিং ছিল, যদিও কাল ভদ্রে। তখন হস্টেলের ছেলেরা দলবেঁধে হাফপ্যান্ট পরে কাঁধে টি-স্কোয়ারগুলি বন্দুকের মতো ধরে মার্চ পাস্ট করে আসতাম গড়িয়াহাট বা ঢাকুরিয়া পর্যন্ত অবশ্যই সোচ্চারে, পাড়ার লোকেদের কাছে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে করতে।

একবার এরকম পরিস্থিতিতে সবাই পাগলের মতো আচরণ করে হস্টেলের পাশে এক ব্যবসায়ীর পিচড্রাম রাখার জায়গা (বর্তমানে যেখানে পুলিশ-আবাসন) থেকে অনেকগুলি ড্রাম গড়িয়ে গড়িয়ে এনে হস্টেলের ঝিলে ফেলে দিল। আলো আসার পরে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক অসীম ক্ষতির আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানালেন এবং সংশ্লিষ্ট ছেলেদের শাস্তির দাবি করলেন। ডাঃ ত্রিগুণা সেন হস্টেলে এসে সব ছাত্রদের নিয়ে মিটিং করে জানতে চাইলেন, কারা ওই অপরাধ করেছে। ভয়ে কেউ স্বীকার না করায় উনি বললেন, যারা স্বীকার করবে, সৎসাহসের জন্য তাদের অল্প শাস্তি হবে, আর স্বীকার না করলেও আমি যেহেতু আমার পরিচিতির বা ক্ষমতার সুবাদেই বিস্তারিত সঠিক খবর পেয়ে যাব, যাদের নাম জানতে পারব, তাদের কঠোর শাস্তিই ভোগ করতে হবে।" ওঁর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে উপস্থিত সব ছাত্রই সমস্বরে একযোগে দোষ স্বীকার করায় উনি হেসে বললেন "তোমাদের যাদবপুরিয়ান ফেলোশিপ দেখে আমি অভিভূত। যাই হোক, যারা সত্যিই অপরাধী তারা লঘু শাস্তি হিসাবে, ওই গরীব বেচারার পিচড্রামগুলি জল থেকে তুলে যথাস্থানে ফেরত রেখে এস"। ফল - ঝপাঝপ জলে ঝাপিয়ে পড়া সবাই মিলে।

হস্টেলে একবার নবীনবরণ হচ্ছে, পরিচালনার দায়িত্বে এল আমাদের গ্রুপ। প্রোভোস্ট অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত। একে একে নতুন সবার পরিচয় পর্বে হবি-র কথা জানতে চাওয়ায়, এক ছাত্রের উত্তর 'স্মোকিং'। গোপালবাবুর মতো বিশুদ্ধবাদী তো রেগে আগুন, অনুষ্ঠান স্থল ছেড়ে রাগে গমগম করতে করতে কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা দিলেন। অনেকদূর পর্যন্ত পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে ওঁকে বোঝাতে সফল হয়েছিলাম যে এটা একটা মজার আসর, ওঁর মতো শ্রদ্ধাভাজনের সামনে অসভ্যতার প্রদর্শন নয়। আমাদের সৌভাগ্য, উনি আবার ফিরে এসেছিলেন অনুষ্ঠানে, ছেলেটির স্পষ্টবাদিতাকে প্রশংসা জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জেনেছি, গ্রাম থেকে আসা বিড়ি খেতে অভ্যস্ত ওই ছেলেটি তারপর থেকে জীবনে আর কোনদিন ধূমপান করেনি। বর্তমানে মাথাফাটানো শিক্ষাবিদরা শিক্ষাদান-পদ্ধতির শিক্ষা নিতে পারেন কিনা, ভেবে দেখা যেতে পারে।

[২]

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে হস্টেলের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রথম গায়ক শ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। শুরু করলেন ওঁরই একটি অতি জনপ্রিয় আধুনিক গান। শ্রোতারা বিভ্রান্ত, আমরা উইংসের পাশ থেকে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছি, তবু বিভোর হয়ে উনি গেয়ে চলেছেন, অবশেবে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া থেকেই বুঝলেন যে কোথও একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে। গান থামালেন, আমরা ওঁর কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম যে উপলক্ষ্যটি হল রবীন্দ্রজয়ন্তী, আধুনিক গানের আসর নয়। আগে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে না বলে দেওয়ার যে দোষ, উনি সেটি নিজের কাঁধে নিয়ে শ্রোতাদের কাছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইলেন, তারপর যেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত সেদিন তিনি পরিবেশন করলেন, সেটা ছিল এক বিরল প্রাপ্তি। ওই অনুষ্ঠনেই গান গাইতে এসেছেন আরও দুই দিকপাল - সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাস। দুজনে গীন রুমে খুনসুটি করছেন আগে গাওয়ার দাবি নিয়ে। নিজেরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না, অবশেষে

আমাদেরই সুত্রে বয়স্কতরর আগে গাওয়ার তথা বাড়ি ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া উচিত বলে মেনে নিলেন।

হস্টেলে যখন যে ঘরেই থেকেছি, সে ঘরটি ছিল সবার জন্য অবারিতদ্বার - সবার বলতে আমি বন্ধুদের যেমন বোঝাচ্ছি, ওয়ার্ডবয়দেরও তেমনই ছিল অবাধ গতিবিধি, তালাচারি লাগানোর প্রয়োজন অনুভব করিনি কখনও। এটাকে কেন উচিত কাজ বলে মনে করেছিলাম, তার সদুত্তর দিতে আমি অপারগ, আনুমানিক হতে পারে বা ঘরে কোন দামি জিনিষ বা টাকাপয়সার অভাব অথবা নিছকই সরল বিশ্বাস -- সহমর্মিতার মূলে সেই বোধটি - "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ"।

কলেজের অনেক রকম কাজকর্মের মধ্যে কিছু কিছু কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। অবশ্য, সবচেয়ে বেশি যাতে অংশগ্রহণ করার কথা, সেই ক্লাশ করাটাই ছিল বোধহয় সবচেয়ে কম। এর জন্য তো একবার ক্লাসে কম হাজিরার জন্য পরীক্ষা দেওয়াই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। এই অবস্থায় যা ক'রে সবাইকে পার পেতে হত, সেটা ছিল পড়াশোনার বাইরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানগলো। হয় খেলাধুলা, নয় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ নেওয়ার জন্য ক্লাস করা যায়নি - এ ধরনের ঘটনাগুলির উল্লেখ করে ছাড় পেতে হ'তো আমি অবশ্য ছাড় পেয়েছিলাম Industrial Exhibition-এ অংশগ্রহণ, একটু-আধটু কলেজের খেলায় অংশগ্রহণ আর চ্যাম্পিয়ন টীমকে সমর্থন করার অজুহাত দেখিয়ে। খেলাধুলার ব্যাপারটা এবং খেলোয়াড়ি মনোভাব ক্লাসের অন্যান্য শিক্ষকরাও সহানুভূতি-সহকারে সমর্থন করতেন।

সদ্য বিদেশ থেকে আগত এক শিক্ষত ঘোষণা করলেন, "আমি রোল কল করব না। যার ক্লাসে শোনার ইচ্ছা হবে না, তারা ক্লাসে থেকে অন্যদের বিরক্ত ক'রো না। হাজিরার ভয় নেই।" শুনেই দু-একদিন পর থেকে ওঁর ক্লাস প্রায় ফাঁকা, তা দেখে উনি মাঝে মাঝে রোলকল শুরু করলেন। একদিন রোল কলের পরে আবার ডাকলেন, "রোল নম্বর ফিফটি সেভেন!" অমিতাভ দাস সাড়া দিল, "present Sir"। ওকে তিনি প্রশ্ন করলেন তুমি কটা প্রক্সি দিয়েছ? অমিতাভর উত্তর, " সাতটা স্যার।' উনি বললেন 'এতটা পরিমাণ স্বীকারোক্তিরর পরেও, তুমি সত্যি কথাটা পুরোপুরি বললে না। তোমার গলাটা অন্য সবার চেয়ে আলাদা, তাই বুঝতে তো অসুবিধা হয় না। আমি যে তোমার গলা শুনেছি আটবার।" অমিতাভর নৈর্ব্যক্তিক জবাব "ঠিকই শুনেছেন স্যার। আপনার প্রশ্ন ছিল, আমি কটা প্রক্সি দিয়েছি। সুতরাং আটবার গলা শোনা গেলেও, ওর মধ্যে একটা ছিল আমার নিজের উপস্থিতির জন্য, সেটা তো আর প্রক্সি নয়, বাকি সাতটা অবশ্যই প্রক্সি।" স্যার সংগে সংগে অমিতাভর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন,"স্পষ্টবাদিতা ভবিষ্যতে চিরকাল বজায় রাখার চেষ্টা ক'রো, আমার মতো সবাই তোমার জন্য গর্ব অনুভব করবে।"

Exhibition -এ যেবার খুব বেশি জড়িয়েছিলাম, সেবার Programming Controlled Lathe -এর Model তৈরি করে আমাদের গ্রুপ প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। সেবারে আয়োজনের দায়িত্বে যারা ছিল, তার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে আমাদেরই ব্যাচের সঞ্জীব বসু আর আর্টস ও সায়েন্স কলেজ থেকে আনন্দদেব মুখার্জী (ছাত্রনেতা, পরবর্তীকালে ওই কলেজেই জিওলজির অধ্যাপক, তৎপরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বর্তমানে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক) ছিল যুগ্ম কনভেনর। Exhibition শুরুর কয়েকদিন আগে থেকে সারা রাত model এর কাজ করতে হত। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে মধ্যরাত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বেড়িয়ে টাটকা বাতাস গ্রহণের সুযোগ হত। একদিন ওইরকম মধ্যরাত্রে বেড়াতে বেড়াতে লাইব্রেরি বিল্ডিং এর সামনে দুইদিক থেকে এসে মুখোমুখী হওয়া সঞ্জীব আর আনন্দের মধ্যে কোন একটা ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে মতবিরোধ, তর্কাতর্কি, গালাগালি, অবশেষে প্রায় হাতাহাতি। সঞ্জীব যেমন উগ্র স্বভাবের, আনন্দ তেমনই নরম-সরম প্রকৃতির।

স্বভাবতই দুপক্ষের মধ্যপন্থী বন্ধুদের মধ্যস্থতায় হ'ল সঞ্জীবের রাগের প্রশমণ (যা আবার ওর স্বভাবসুলভ গুণ) ও আনন্দের যুক্তির গ্রহণেচ্ছা - হ'ল অসম অবাঞ্ছিত লড়াইয়ের অবসান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সারারাতব্যাপী বার্ষিক সোশ্যালে আমাদের কাজ ছিল কয়েকজনের মতোই চত্বরে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেওয়ার, কোন অবাঞ্ছিত বা অপরাধমূলক কাজ হচ্ছে কিনা, তার প্রতি নজর রাখা কারণ, চোদ্দ হাজার শ্রোতা-দর্শক ধরা প্যাণ্ডেলের সুরক্ষার জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কোনদিন পুলিশ ঢোকার প্রয়োজন হয়নি। একবার সোশ্যালের মাসখানেক পরে আলু-ক্যান্টিনে আর্টস কলেজের এক বন্ধু ও এক বান্ধবী একসঙ্গে ঢুকছে - সবাই বান্ধবীর সিঁথির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তোরা এখনই বিষয়টা চুকিয়েই ফেললি, কী হয়েছে তোদের?" উত্তরে বন্ধুটি বলল, "আর বলিস না, সোশ্যালের দিন দুজনে নিরিবিলিতে একটু গল্পগাছা করছিলাম, ডাঃ ত্রিগুণা সেনের কাছে ধরে নিয়ে গেল তোদের মতো পাহারাদাররা, ডাঃ সেন ফরমান দিলেন এরপর তোমাদের একসঙ্গে দেখতে চাই বিয়ের পরেই, তার আগে নয়। স্বভাবতই আজই প্রথম এলাম বিয়ে করে, তোদের কাছে আসার আগে ওঁর আশীর্বাদও নিয়ে এলাম। সেদিন বান্ধবীর কপালে অস্বাভাবিক বড়ো একটা সিঁদুরের টিপ দেখে টিপ্পনি কেটেছিলাম, "সম্পর্কটাকে জোর করে ধরে রাখার প্রচেষ্টাতেই কি এত বড় একটা টিপ পরেছ?" আজ আক্ষেপ হয়, অপরিণত-মনস্ক অবস্থায় ওই টিপ্পনিটা না কাটলেই ভাল করতাম। ভবিষ্যতে দেখেছি, ওদের বিয়েটা টেকেনি।

যুদ্ধোত্তর কালে দেশের প্রথমতম রক্তদান শিবিরটি স্থাপিত হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসে। ডাঃ ত্রিগুণা সেন ছিলেন মূল উদ্‌বুদ্ধকারী, অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন ছিলেন প্রথম রক্তদাতা। ছাত্রদের মধ্যে অগ্রনী ভূমিকায় দেবুদা, নন্দন, মনন, আমি এবং আমার মত আরও অনেকে। লিষ্ট অনুসারী আরও ৩০০ জনের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন রক্তদাতা। সম্প্রতি (২০১২ সালের ১৮ আগষ্ট) সেই রক্তদান শিবিরের ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এই ইন্দুমতী সভাগৃহে, আমি হাজির ছিলাম সেই অনুষ্ঠানে। না থেকে উপায় ছিল না, ওঁদেরই অনুপ্রেরণায় এখন যে আমি ওতপ্রোত ভাবে রক্তদানের আন্দোলনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত।

খেলাধূলাতে কিছু কিছু অংশগ্রহণ করেছি। আমার পছন্দসই দুটি খেলাতে যে খুব গুরুত্ব সহকারে অংশগ্রহণ করিনি, তার জন্য আমার মানসিকতাই দায়ী। ছোটবেলায় হকি খেলার পাঠ নিয়েছিলাম কে ডি. সিং (বাবু) র শিক্ষকতায়, সান্নিধ্যে এসেছিলাম ধ্যানচাঁদেরও, স্বভাবতই এখানকার হকির মান আমার পক্ষে বেমানান মনে হয়েছে। আবার ভলিবল খেলাতেও উদ্‌ভুদ্ধ হই পঞ্চাশের দশকে বিশ্বের প্রথম সারির দল রাশিয়াকে দেখে। জুনিয়ার রাজ্য দলে সুযোগ পেয়েও এখনকার 'কাটারি' আর 'পদ্মফুল' এর মাধ্যমে বল পার করার খেলা আমার কাছে হাস্যকর ঠেকেছে। তাই ইন্টার-ভার্সিটি টিমের সিলেকশন ট্রায়ালে অনুপস্থিত থেকে নির্বাচকদের এড়িয়ে যাওয়ার পরেও ঘন্টি, মানে ঘনশ্যাম অধিকারী আর প্রদীপ (মজুমদার)-এর হাত ধরে টানাটানি সত্ত্বেও সংকল্পে অনড় ছিলাম। কিন্তু কলেজে ইন্টার-ক্লাশ বা রাজ্যের ইন্টার-কলেজ খেলাগুলিতে খেলতে বাধ্য হয়েছি বন্ধুদের চাপে পড়ে, আর সেই অস্বস্তিকর সহমর্মিতার প্রকোপে।

তাস খেলায় একসময় বেশ নেশা ধরে গিয়েছিল। প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হয়েছি, কখনও বা হইনি। হস্টেলে রাত্রি বারোর সমমত আলো নিভিয়ে দেওয়া হত, ওই অবস্থায় নেশার টানে একটি জ্বলপ্ত টর্চকে পাখার হুকে ঝুলিয়ে সেই স্তিমিত আলোও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাস খেলেছি। সত্যেনদার ক্যান্টিনেও বেশ জমজমাট তাসের আড্ডা বসত। একদিন বিকালের দিকে আমরা হাতে তাস তুলেছি, আর বাইরে ভরাট গলায় গলাখাঁকারি দিয়ে ডাঃ ত্রিগুণা সেন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন, "তপন

দাশগুপ্ত আছো নাকি?" উনি তপনদাকে খুঁজতে এসেছেন, খবর নিচ্ছেন ঠিকমত ক্লাস করছে কিনা। হঠাৎ একেবারে আমাদের টেবিলের পাশে ওঁকে দেখে সবার হাত খেতেই তাসগুলি ঝরঝর করে টেবিলের নীচে পড়ে গেলেও, আমার বিস্ময় বিমূঢ় হাত থেকে পড়েনি। তপনদাকে চাক্ষুষ দেখে ডাঃ সেন ফিরে গেলেও আমরা তখন ভাবছি যে এই অপরাধে এবার তো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। আমাদের সৌভাগ্য, তপনদার হাজির থাকার সুবাদে উনি খুশি হওয়ায় কারও কোন শাস্তি হয়নি।
তৃতীয় বর্ষের শেষে দেখা গেল আমাদের ব্যাচের পরীক্ষার ফলে প্রচুর ছাত্র অকৃতকার্য, এক বছর নষ্ট, বাস্তবেও হয়েছে সেরকমটাইচ।

তবে তার আগে সবাই মিলে লক্ষ্মী ছাড়ার দল তৈরি করে ডাঃ সেনের ঘরে গিয়ে আবেদন করা হল, একটা স্পেশাল পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। উত্তরে তিনি বললেন, "তোমরা তো ছেলেবেলা থেকেই জেনে এসেছ যে পরীক্ষায় পাশ করতে হলে পড়াশুনো করতে হয়, তা করেছিলে বলেই তো সাধারণদের ছাপিয়ে এখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলে। আমিও চাই, আমার ছাত্ররা পড়াশুনো করেই বিষয়গুলি শিখে পরীক্ষায় পাশ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক"।

সেদিন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ হয়নি বলে খারাপ লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু আজকের শিক্ষাব্যবস্থার হতাশ ও অরাজক অবস্থাটা দেখে অনুভর করছি ডাঃ সেনের কথাগুলি কতটা অর্থবহ ও সুপ্রযোজ্য। ফলে ওঁর শেষজীবনে দু-একদিন অন্তর ওঁর সামনে নীরবে বসে থেকেও অনুভব করেছি সত্যিকারের অন্তরের ভাব বিনিময়।

পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি, কালের বিচারে মানবজীবনে অর্ধশতাব্দী তো মহাকালই। বন্ধুরা মিলে স্মৃতির
রোমন্থন করার চেষ্টায়, ওই ছাড়ার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের মধ্যে দিয়ে পিছন ফিরে চাওয়ার চেষ্টা করছে। এতে আমিও এক অংশীদার নিঃসন্দেহে। তবে সর্বদাই অনুভব করি ব্যাক্তিগতভাবে নস্টালজিয়া আমার ধাতে নেই। তবু মাঝে মাঝেই এখন যেন মনে হয়, কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী সেই দিনগুলো…।

আমাদের হষ্টেল-স্মৃতি -- কিছু দুষ্ট-মিষ্টি কথা

যাদবপুরের দুষ্টু মিষ্টি গল্প --
আশিস দাশ শর্মা

[1]

1962. Unforgettable year for us all.
Calcutta University র মাঠ। Inter University Cricket semifinal match. যাদবপুরে লড়ছে Opponent team ও জবরদস্ত । নামটা আজ আর মনে নেই। শিবু (রাঁচি) হয়তো বলতে পারবে। তখন যাদবপুরে খেলাধূলা জোয়ার। আমরা সদ্য ইন্টার ইউনিভার্সিটি ফুটবল জিতে এসেছি। নন্দন, রমেশ রা টেবিল টেনিস জিতেই চলেছে। মানসরা বাস্কেটবল খেলছে। সুতরাং সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। 3rd দিনের খেলা। চরম উত্তেজনা। পুরো যাদবপুর ভেঙে পড়েছে মাঠের চারধারে। চারিদিকে হুঙ্কার... লড়াই করে জিততে হবে।
এমন সময় দেখি বীরেন সরকার (ইলেকট্রিক্যাল) প্রায় উদ্ভ্রান্তের মত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। ঠোঁটে সিগারেট। তখনও জ্বালায় নি। আমরা ডাকলাম.... সরকার এদিকে আয়।... কোন কথা না বলে ও সোজা চলে গেল, পাশেই একটা গাছ আছে সেদিকে। গাছের নীচে ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোক চুরুট খাচ্ছিলেন। সরকার তাঁর কাছে গিয়ে, মাঠের দিকে চোখ রেখে বলল.... দাদা একটু দেশলাই টা দেবেন? ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়ে কিছু একটা বার করতে যাচ্ছেন, আমরা চেঁচিয়ে বললাম..... সরকার Dr. Sen!!! ... সরকারি এবার মুখ ঘুরিয়ে দেখেই ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠে আ আ করছে। তারপরেই আমাদের পাশ দিয়ে যেন ঝড় উড়ে গেল। দেখি সরকার কোথাও নেই। আমরা সভয়ে পাশে দেখতে গিয়ে দেখি দুটি ক্ষমাসুন্দর চোখ আর মুখে সেই চির পরিচিত এক চিলতে হাসি।
হস্টেলে ফিরে দেখি সরকার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। টেনেটুনে তুলে দেখি, চোখে মুখে তখনও আতঙ্ক। বলল.... কোথা দিয়ে এসেছি, কিসের উপর দিয়ে ছুটেছি কিচ্ছু জানি না। যখন থামলাম দেখি পার্ক স্ট্রিটের মোর। সামনেই একটা 5 নং বাস। লাফিয়ে উঠে পড়লাম। সোজা হস্টেল।
তবে সরকার প্রায় এক মাস জেনারেল বিল্ডিং এর দিকে আর যায়নি পাছে ডঃ সেনের মুখোমুখি হতে হয়।

[2]

তখন আমাদের তখন দ্বিতীয় বর্ষের শেষ ভাগ। যাদবপুরের হস্টেলে থাকি। একদিন কয়েকজন মিলে মেনকায় ইভিনিং শো দেখব বলে বেড়িয়েছি। একটা শর্টকাট রাস্তা ছিল। যোধপুর পার্কের ভিতর দিয়ে তালতলা মাঠ পেরিয়ে (এখন যেখানে দক্ষিণাপণ, আমার অনেক খেপ খেলার মাঠ, লেকের ভিতর দিয়ে হঁটাপথে মেনকা। বাসের খরচা তো কমে! বেশ কিছুটা আগেই বেরিয়েছি। টিকিট ফিকিট কেটেও হাতে অনেকটা সময়। সবাই মিলে বাদাম ঝালনুন সহ লেকে ঢুকে একটা গাছের নীচে বসলাম। বসন্তের বিকাল। লেকের জলে আলোছায়ার ঝিকিমিকি।

একটু পেছন থেকে আরম্ভ করি। যাদবপুরের মেইন হস্টেল থেকে ছজন বন্ধু হেঁটে মেনকাতে সন্ধ্যা শো তে সিনেমা দেখতে এসেছি। টিকিট কেটে লেকে এসেছি বাদাম-ভাজা আর ঝালনুন নিয়ে। একটি গাছের নীচে বসে আড্ডা চলছে। আমাদের ছয় জনের একটু পরিচয় দরকার।
প্রথমে মলয় ভট্টাচার্য। হস্টেলে আমার রুমমেট। মেকানিক্যাল। সব সময় সিরিয়াস। মুখ ভীষণ গম্ভীর। এই গম্ভীর মুখের আড়ালে একটা অসামান্য সব চুটকির ভান্ডারী। শালীন অশালীন দুইই।
বীরেন্দ্র নারায়ণ সরকার। ইলেকট্রিক্যাল। আমাদের সকল রসের ধারা। ডাঃ ত্রিগুণা সেনের কাছে সিগারেট ধরাতে যাওয়ার গল্প আগেই করেছি। একটা অসাধারণ গুন ছিল ওর ক্লাসের যে কোন ছেলের

রোল নাম্বার বলে দিতে পারত। গান ভালবাসতনা, কিন্তু কোন গায়ের কোন কোন রেকর্ড আছে অবলীলায় বলে দিত। খুব রেগে গেলে তোতলাতো আর ইংরেজি বলতো।
এরপর সিদ্ধার্থ মুখার্জি। টেলিকম। বেঁটেখাটো চেহারা আর গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। যেমন মেধাবী তেমন বদমাশ। আমার খেলার জন্য মিস করা ক্লাস নোট বোঝাবার অন্যতম সাথী। ওর বিখ্যাত আবিষ্কার "গন্ধ দিয়ে চেনো"। অর্থাৎ ও স্রেফ গন্ধ শুঁকেই বলতে পারত লোকটা বা ছেলেটা কোনদিন যাদবপুরের মেইন হস্টেলে থেকেছে কিনা? ওর ধারনা ছিল যে একবার হস্টেলের মেসে খেতে ঢুকেছে, তার গায়েই ওই গন্ধ সেঁটে যায়। দু চারবার গড়িয়াহাটে পরীক্ষাও দিয়েছে successfully. আরেকটি যাদবপুরের প্রসিদ্ধ প্রবাদ এটাও মনে ওর অবদান। একবার বাসে করে গড়িয়াহাটের দিকে যাচ্ছি, বাসের সামনের দিকে বসে আছেন মাল সেন আর অন্য একজন অধ্যাপক। একটু পিছিয়ে দুটো 1st year এর ছেলে প্রাণপণে set Square, T - Square এসবের গল্প করছে, যাতে বাসের সবাই বুঝতে পারে ওরা ইন্জীনিয়ারিং এর ছাত্র। গোলপার্কে আমরা নামব। সিদ্ধার্থ একটু এগিয়ে একটা ছেলের কাঁধে টোকা মেরে, ছাড়ল তার অমোঘ বানী " কোথায় খাপ খুলেছ শিবাজী? এযে পলাশীর প্রান্তর!" ছেলেদুটো কিছু বোঝার আগেই আমরা নেমে পড়েছি। তারপর থেকে এ প্রবাদ বাক্য হস্টেল হয়ে সারা ইউনিভার্সিটি ছড়িয়ে পরে।
অসীম চ্যাটার্জি। সিভিল। যেমন গোঁয়ার তেমন মেমোরি। অসীমের মেমরি ছিল অসাধারণ। কিছু বুঝতে না পারলে চ্যাপ্টার এর চ্যাপ্টার মুখস্থ করে ফেলতে পারত। তবে একটা problem এর উত্তর দিতে হলে চ্যাপ্টারের প্রথম থেকে বিড় বিড় করতে করতে ঠিক জায়গায় এসে উত্তর লিখতো। দরকার হলে পুরো বইটা মুখস্থ করতে পারত। ও দাবী করত যে পুরো সঞ্চয়িতা ওর মুখস্থ। আমরা টেস্ট করিনি। কারণ যদি 600th page এর কোন কবিতা বলতে বলি তবে 599 পাতা পর্যন্ত বিড় বিড় করে.... । আমি ওর নাম দিয়েছিলাম মুখে মুখে চোথা। আরেকটা ব্যাপার... অসাধারণ ফুটবলার। ইউনিভার্সিটি টীমের গোলকিপার। আমার সহ খেলোয়াড় এবং হস্টেল রুমমেট।
শ্যামল সোম। টৈলিকম । সহজ প্রেমিক। অর্থাৎ আদ্যপান্ত প্রেমিক আর খুব সহজেই যার তার প্রেমে পড়ার ক্ষমতা রাখে। শুধু সুখ থেকে যায়, তবে প্রেম টেকেনা। ঢুলু ঢুলু চোখ, মৃদু মৃদু হাসি, আপাদমস্তক ফিটফাট সদাই চুলের টেরি ঠিক করতে ব্যস্ত শ্যামলের আরেক পরিচয় ইতিহাস প্রেমিক। যখন তখন ইতিহাস নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতে পারে, বিশেষতঃ মোগল পিরিয়ড। এব্যাপারে আমরা সর্বদা তটস্থ থাকি। আদিতে সিলেটের, ভায়া শিলচল, অন্যান্য ছেলেদের মতই বিশেষ মেধাবী এবং মেধা গোলাপের সুরভির মত চারিদিকে প্রবাহিত। মেয়েদের সামনে সামান্য stammering এর লক্ষন দেখা যায়।
আমি, আশিস দাশ শর্মা, টেলিকম। খাদ্যপ্রেমিক। আমার সব প্রেম খাদ্য। চোখ বুজলেই চোখের সামনে চপ, কাটলেট, দই, রাবড়ি, মোগলাই ইত্যাদি ইত্যাদির ভরতনাট্যম, কথ্থক ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। এই জন্যই আমার জীবনে ধ্যান জ্ঞান হলোনা। অবশ্য আমার অন্য ধ্যান জ্ঞান খেলাধূলা। ফুটবল ছাড়া ও অন্যান্য খেলাতেও মোটামুটি পক্ক। তবে ফুটবলেই বেশী আকর্ষণ কারণ এটাতে বেশ খেপ মারা যায়, কমবেশি মাসের হাতখরচা উঠে আসে। বিশেষত সত্যেনদার ক্যান্টিনের খরচা পাতি। দু একবার টিউশনি চেস্টা করেছিলাম। হলোনা। প্রথম টা যোধপুর পার্ক। ক্লাস এইট। যোগ করতে দিলে বিয়োগ করে। অথচ ছেলের বাপ ক্রমাগত কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে চলেছে... ছেলে আমার ইন্জিনীয়ারিং এ চান্স পাবে তো?... আমার তখন বিয়োগ ব্যথার ভৈরবী। সুতরাং ভোকাট্টা। পরের টা গাঙ্গুলী বাগান। ছেলেটা বেশ ভালো। খুব মনোযোগ সহকারে অংক করছে। আমিও ঠিকমত বুঝিয়ে দিচ্ছি। এমন সময় ছেলের মা ঘরে ঢুকলেন। হাতে প্লেটে ফুলকো ফুলকো লুচি আর বেগুন ভাজা, ধূমায়িত চা। আহঃ।বললেন, খাও বাবা গরম গরম খেয়ে নাও। এগুলো আবার কেন বলতে বলতে আমি
হরিনাম নরম নরম গরম লুচি
উদর পুরে খাও ।

খেয়ে দেয়ে রুমালে হাত মুছছি। হঠাৎ দেখি ঘুলঘুলির ফাঁকে বুলবুলির চোখ। এটা কি হল? যাক, একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ দেখি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বুলবুলি। ছেলেটার দিদি।
মাস্টার মশাই ওকে বেশি বেশি হোমওয়ার্ক দিয়ে যান, বলে উঠলো গ্রীবা মন্ডল ইষৎ বাঁকাইয়া চক্ষে বিদ্যুৎ হানি।
বুঝলাম,
ভোলামন এ লাইন তোমার নহে,
মানে কেটে পর ওহে!
একবার হরিনাম নাও
আর খেপের মাঠে মন দাও।।
দুদিন পরে বন্ধুরা বললো ... কিরে তোর টিউশন?
আমি... হলোনা।
সিদ্ধার্থ... কেন?
বললাম ঘুলঘুলির ফাঁকে বুলবুলির চোখ।
সবটা খুলে বলে বললাম..... ম্যায় তো চলি খেপকা মাঠ।
মলয় হঠাৎ বললো সোম কে ভিড়িয়ে দে। ওর একদম ফিট জায়গা।

[3]

অবশ্য আরো কিছু কাজ ও আছে আমার। অনেকের ড্রয়িং করে দিই। অবশ্য আমারটা বাদে। রীতিমতো কন্ট্রাক্ট নিয়ে। হাতটা বোধহয় ভালোই। প্রচুর খদ্দের। পিস প্রতি একটা ডবল হাফ চা। পলুর (পল্লব খাঁ, ইলেকট্রিক্যাল) ক্ষেত্রে এক্সট্রা পানামা সিগারেট। পলু একটা আজব জিনিস। সবার কাজে সবার সাথে। "যেখানে ডাক পরে জীবন মরণ ঝড়ে....." সেখানেই পলু। এটা শুধু University র ছেলেমেয়েদের জন্য নয়। সারা কলকাতায় ছড়িয়ে আছে ওর অন্তত পাঁচ ডজন cousins. সবার servicing এর দায় ভূভারতে একমাত্র পলুর। দিনে রাতে ওর টিকির দেখা পাওয়া মুমকিন হ্যায় । সুতরাং আমার permanent খদ্দের। এরকম আরো কয়েকটা স্যাম্পল থাকার ফলে আমার চা সিগারেটের খরচা আর লাগেনা।
আমার ড্রয়িং? সে তো করে অন্যজনা। বিমলেন্দু কোনার। টেলিকম।
বস্তুত সেমিস্টার নদী পার করতে আমার আছে তিনজনা।
শ্যামল সোম মিস্‌ড ক্লাসের পড়া বুঝিয়ে দিতে সিদ্ধার্থ ক্লাস নোট সাপ্লায়ার, আর কোনার সেশন্যাল। Without any পারিশ্রমিক।
এরকমই একদিন কোনারের ঘরে ডাক পড়েছে। আড্ডা টাড্ডা মেরে রাত নটা নাগাদ ওর দরজায় আমি হাজির।
আজি এসেছি, আমি এসেছি বঁধুয়া.... বলে দরজা ঠেলে ঢুকতে যাব, তড়াং করে ও লাফিয়ে উঠেই চেঁচাতে লাগল, " বেরো বেরো এখান থেকে। তোর মুখ দেখতে চাইনা।" ইত্যাদি ইত্যাদি। কি হল এখন?
চেঁচিয়ে ইঠল, "শালা, তোর ড্রয়িংও আমি করেছি, আমার ড্রয়িংও আমি করেছি। তাহলে তুই কেন বেশী নম্বর পাবি? "
আমি আড় চোখ দেখে বললাম," তোরটায় intellectuality র অভাব আছ। তাই। "
বলে ঘর থেকে বেরোতে যাব, এমন সময়ে ভূমিকম্প!
"থর থর করি কাঁপছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়ছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।"
ভূমিকম্প নয়, গৌরী। গৌরী কান্ত সিনহা। সিভিল । আবৃত্তি ওর নেশা। মাঝে মাঝে আবৃত্তি জেগে ওঠে

এ হস্টেলের বীভৎস বাতাসে,
কখনো সন্ধ্যায়, হঠাৎ মধ্যরাতে।
একটা সারে চার ফুটিয়া লিকলিকে মেশিন থেকে, normally 100+ আর আবৃত্তি তে unmeasurable decibels এ আওয়াজ যে কি করে বেরোতো তা সত্যি বিস্ময়কর!
আমাকে দেখে থামল, কিছু বলতে যাচ্ছে, হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এল 28 ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়ে স্বয়ং কোনার। বুঝলাম টিউব এতক্ষণে জ্বলেছে।
" এই শোন। তুই intellectuality বললি তার মানে কি?"
মুচকি হেসে বললাম, "পরের বার light trace জমা দেওয়ার সময় compass দিয়ে দুচারটা ফুটোফাটা করে দিস।" বলেই আমি হাঁটা দিলাম। পেছনে গৌরীর উদাত্ত কন্ঠ... " কোথায় খাপ খুলেছ শিবাজী? এ যে পলাশীর প্রান্তর!" বলেই সেই হাড় হিম করা হাসি," খ্যা খ্যা খ্যা "।
একটু এগিয়ে দেখি উল্টো দিকে অলোক (চক্রবর্তী, কেমি) আর সব্যসাচী (বাগচী, সিভিল) ।সিরিয়াস আলোচনা চলছে। পশ্চিম বঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা। বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। পাশ কাটিয়ে চলে যাব, অলোক বলে উঠলো," খেয়েছিস? যা মেসে যা তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়েছে। "
বাগচী বলল, "আবার কোথাও আড্ডা দিতে ঢুকিস না"।
" OK SIR"
একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি।
বেরিয়ে যাচ্ছি, আবার বাধা। পেছন থেকে মিহি গলায়, আশিস একটু দাঁড়া। বারীন চ্যাটার্জি, জিওলজি। প্রেম পাগল। মাসের প্রথমে কয়কডজন নীল রংএর ইনল্যান্ড লেটারস কিনে রাখে।সারা মাস ধরে বিচিত্র শব্দ সমাহার সমৃদ্ধ সেই সব নীল চিঠি উড়ে যেত কোন অজানা অনামিকার উদ্দেশ্যে। আমাকে প্রয়োজন চিঠির Head lines & tail lines লেখার জন্য। Specifications... উপরে দুলাইন হৃদয় উদারি শেষ দুলাইন হৃদয় বিদারি। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। যেমন প্রথম দুলাইন যদি হয়, "ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে..."
তো লাস্টের দুলাইন হবে, " ভালোবাসা কারে কয়?"
বয়ান টা ও নিজেই লেখে, আমায় কিছু বলেনা। আর শেষেরপাতায় ওর একটা Bio data। (প্রেমপত্র না বিয়ের চিঠি?) আজ মনে হয় নতুন ঠিকানা জোগাড় হয়েছে। আবার সেই চার লাইন। এদিকে আমার ও রবীন্দ্রনাথের স্টক প্রায় শেষ। ব্যাটাকে একবার বলেছিলাম যে তুই এবার রবীন্দ্রনাথ ছাড়। বরঞ্চ গৌরীপ্রসন্ন ধর। প্রচুর স্টক। রবীন্দ্রনাথের প্রায় চার গুণ। অনুরোধের আসর শুনবি আর ঝেড়ে দিবি। সব গানই বিরহ মিলন মেশানো। প্রবলেম solved। কিছুতেই রাজি না। ঐ রবীন্দ্রনাথই চায়। যাই হোক কোনরকমে স্বরচিত চার লাইন রবীন্দ্রনাথ বলে চালিয়ে দিয়ে বেরোতে পারলাম।
চল মন জগদীশ নিকেতনে। জগদীশ ICS (Indian Cooking Service, from Medinipur)। আমাদের মেসের Cook cum server. ঠিক খাবার নিয়ে বসে আছে আমার জন্য। আমার প্রতি স্নেহ বেশ প্রবল। কেন জানিনা। তবে আমি ছাড়াও ভালো তো আরেকটা জীব। সেটা বীরেন সরকার। দুজনেই মেদিনীপুর।
রাত তো অনেক হল এবার ঘরকে চল্। ধীরে ধীরে এবার ঘরে ফিরি। দাশু (রঞ্জন দাশগুপ্ত) আর প্রনবের (দাশগুপ্ত) ঘরে তখনও দরবারী কানাডা বেজে চলেছে। Aero modelling.. খেলনা Aeroplane এর লেজে দড়ি বেঁধে ওড়াবে। আজকে engine testing. তর্জনি দিয়ে পাখা ঘুরিয়েই চলেছে। কিন্তু ঐ ফুরুৎ। ভুড়ড়ড় ড় আর করেনা। এখনও আলাপ, ঝালায় আর ঢুকতেই পারছেনা। আমার ঘরে বাকি তিন কপোত নিদ্রামগ্ন। রাত প্রায় বারোটা। সিদ্ধার্থের রেখে যাওয়া নোটস গুলো বসে ঝালিয়ে নিলাম। তারপর নিরালা নিঝুম অন্ধকার। পিছনে background music. শাসমলের (বিজন গোপাল, সিভিল) variable frequency নাসিকা গর্জন। মলয় বলে একটা compact musical instrument.

দীপকের উত্তর

সবাইকে বলছি, দেখো দেখো, আশিসকে দেখ! একাধারে ছুপা এবং রুস্তম, একেবারে দ্বন্দ সমাস।,

লাস্ট ল্যাপের স্মৃতির দৌড়ে আশিস তো সবাইকে অন্তত চারটে ল্যাপে পেছনে ফেল্লো। রবীন্দ্রনাথ, গৌরীপ্রসন্ন, দরবারি কানাড়া সব বাঁশির করুণ ডাক পেয়ে দেখ কেমন রাজছত্র হয়ে ছুটে চলেছে।

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেই খানে
বহি চলে যাদবপুর,
সত্যেনদার ক্যান্টিনেতে
যে আছে অপেক্ষা করে
সে এক কাপ ডব্ ল্ হাফ চা।

হঠাৎ সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
ছেড়ে আসা যাদবপুরের
মহিমাময় বেদনা,
তখনই ধরা পড়ে
এ মিছে নয়, এ আমাদের
ছেড়ে আসা যাদবপুরের
স্বর্ণময় স্মৃতিভারাক্রান্ত
হীরের দ্যুতিসম সব কথন।

আশিস, অনুরোধ একটাই, এখনই বন্ধু বন্ধ কোরো না পাখা।
simply fantastic, superb, এক ওভারের প্রথম তিনটে বলে তিনটে ছক্কা মেরেছিস, আরও তিনটে ছক্কার অপেক্ষায় রইলাম।

[4]

সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল চেঁচামেচিতে। শাসমল.... ভয়ানক উত্তেজিত। ঘরে বাইরে যাচ্ছে আর আসছে সাথে চীৎকার, " শালার বউ, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!"

বুঝলাম আবার গেছে। খুলেই বলি। ভূভারতে শাসমল একমাত্র sample, যে হস্টেলে আসার সময় একটা শ্বেত শুভ্র বসন পরিহিত হৃষ্টপুষ্ট নধর কান্তি নরম নরম একটা পাশবালিশ এনেছিল সাথে করে। মলয় নাম দিয়েছিল "বউ" এটার উপরে সকলেরই লোভ। যখন তখন হাওয়া হয়ে যায়। তখনই শাসমলের "হে নটরাজ প্রলয় নাচন নাচলে যখন....."। জানি এটা পলুর কাজ। ও ব্যাটা যে কি কৌশলে শাসমলের বজ্র আঁটুনি ফসকা করে ঝেঁপে দেয়, আর যার তার তোষকের নীচে, কখনো বা সিঁড়ির পাশে, হয়তো বা ছাদের পরে পাচার করে, এটা একমাত্র ওই বলতে পারবে। Absolutely genius! "তোর বউ তুই সামলা " বলে আমি চলি চা য়ের খোঁজে। পথেই মলয়। মর্নিং ওয়াক করে ফিরছে। ব্যাজার মুখ। কারা নাকি পোস্টার মেরেছে রাস্তার ধারে, "লাঙ্গল যার জমি তার।" খুব সিরিয়াস মুখ করে বলল, "তুইই বল! এরপরে সেলুনে নাপিতরা বলবে কাঁচি যার মাথা তার!" বললাম চিন্তা করিস না। এই আনোয়ার শাহ রোডে জমিও

পাবিনা লাঙ্গলও পাবিনা। ইতিমধ্যে ছুটে গেছে সব্যসাচী বাগচী। রীতিমত উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, " সর্বহারার ব্যথা কোথায় জানিস?" বললাম " গরম চায় পে, চল চা খাবি। "

মেনকাতে টিকিট কেটে বসে আছি লেকের পাশে। বাদাম শেষ। " চল ওঠা যাক," বলল অসীম। সবাই আড়মোড়া ভেঙে উঠছি....
সহসা ডালপালা মোর উতলা যে...
মালবিকা, নয়নিকা, চয়নিকা চন্ডালিকার দল।
কলকল ছল ছল।।
উঠব কি? সোমের কাতর আহ্বান, "এখনও তো টাইম আছে। আরেকটু বোস।" ইতিমধ্যেই শ্যামল সোম টেরিতে দু দু বার চিরুনি চালিয়ে দিয়েছে।
অসীমের একটা হাই স্পিড phrased গালাগালি আছে। উত্তেজিত হলেএক নিশ্বাসে বলত।
Idiot nonsense bloody fool damn scoundrels nincompoop. সোমের উদ্দেশ্যে ঝাড়ল এখন। আমি বললাম ঠিক আছে আরেকটু বসা যাক। বিড়ালের ভাগ্যে যদি...। সবাই বসে পরল। "সরকার ভাঁড়ে চা" হুংকার অসীমের। আমি বললাম টাকা সোম দেবে।
ওদিকে মালবিকারাও গুছিয়ে বসেছে। কাছেই একটা গাছের নীচে, লেকের আরো ধারে। বেশ গোল করে বসেছে মাঝখানে একজন, একটু বেশী কথা বলে বেশ অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে। সোম বলল "মধ্যমণি, বেশ স্মার্ট, তাই না?" মলয় বলল, "over smart"। আমি বললাম, " চন্ডালি - কা" । ইতিমধ্যে সোমের ঝুলি থেকে মালকড়ি বেরোতে শুরু করেছে। কি করে বোঝানো যায়.. CET Brand. Semiconductors, transistor ছাই পাশ আরো কত কি ! অবশেষে যখন transformer এর through দিয়ে Induction motor এ ঢুকবে তখনই সরকারের চিৎকার, বো বো বো। একি তোরও বউ problem? তখনই শোনা গেল বোগাস। ব্যাটা এতক্ষণে বোঝা গেল। সোম নিজের লাইন ছেড়ে ওর লাইনে ঢোকার চেষ্টা করছে। ওদিকে তখন বসন্ত জাগ্রত দ্বারে বা হায় রে বসন্ত... । মধুমাস তো? বেশ জমে ইঠেছে। হঠাৎ একটা মধুর আওয়াজ। "এই তোরা এখানে কি করছিস রে?" রাজেনদা। রাজন ঘোষ। আমাদের এক বছর সিনিয়র। মুর্তিমান রসভঙ্গ। পৌনে পাঁচ ফিট হাইট। সর্বাঙ্গে মাসল কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। ওরা নাকি কথা বলে রাজনদার সঙ্গে। হাঁটার ভঙ্গী পুরোপুরি ব্যায়ামীয়। অর্থাৎ চলতে চলতে বাইসেপ্ট নাচে। যেন যামিনী কৃষ্ণমূর্তি। হস্টেলে অধিকাংশ সময় কাটে জিমনেসিয়ামে। দুবার MR. CET. বালির বস্তায় ঘুসি ও মারে। মলয় বলে মাথা ছাড়া সবই মোটা। Extra qualification stammering. দশ সেকেন্ডের একটা লাইন বলতে সারে সতেরো সেকেন্ড টাইম লাগে।
আমিই বললাম যে সিনেমা দেখতে এসেছি। ওহো, বেশ বেশ। বললাম বসুন। বসল, আর তারপরেই সেই বাইসেপ্ট ট্রাইসেপ্ট। বুঝতে পারছি সবাই খেপছে। সিধু জিজ্ঞেস করল, "সাঁকো টা নাড়িয়ে দেব?" দে বলতেই সিধু in action.

আগেই বলেছি, আমাদের হস্টেলে সিধু অর্থাৎ সিদ্ধার্থের গাঁটে গাঁটে শয়তানি । খুব মোলায়েম করে বলল, " রাজেনদা, আপনার body টা যা না! একদম মাইকেলিন্জলোর মডেল। আপনার সাহস ও তো দারুণ। কত সব কীর্তি শুনেছি আপনার!"
গলতে আরম্ভ করেছে।
"হ্যাঁ, একবার জা জা জানতো? সেই সু সু সু....."
হঠাৎ উল্টোদিকে, "টা টা টা...." এটা সরকার। ইংরেজি বলতে গিয়েছিল। ব্যাস, ফেঁসে গেছে। আচ্ছা, তোতলাকে কখনো তোতলার সংগে তোতলামি করতে দেখেছ? সে যে কি ভয়ানক পরিস্থিতি? দুজনেই ঘামছে কিন্তু land করতে পারছেনা। ওফ!!!!!

অবশেষে অসীমের একটা sliding volley তে সরকার ল্যান্ড করলো..... টাইগার। একটু ভীতচকিত হয়েই রাজেনদার perfect landing..... সুন্দরবন।
হাতের বাইরে যাওয়ার আগে ই সিধু ধরে নিয়েছে।
"না না এসব কেস নয়। ঐ যে গাছের নীচে মেয়েগুলো বসে আছে না? ওই যে মাঝখানে বসা মেয়েটা! ওর নাম জেনে আসতে হবে। আপনার যা বডি! আপনাকে দেখেই ওরা ঘাবড়ে যাবে। আপনি ভয় দেখাবেন না। সুর সুর করে বলে দেবে।"
এই ক ক ক থা? মে মে মেরা বাঁ বাঁ বাঁ (বাঁশ নয়) বাঁয়া হাত কা...."
আর এগোতে না দিয়ে সিধু বলল উঠুন উঠুন। ঝটকা মেরে উঠে পরল রাজেন দা।
বলল, "বাজি?"
মলয় বলল, "Yes বাজি।"
যেমন কথা তেমন কাজ।

টলমল টলমল পদভারে,
রাজেনদা চলল সমরে।।
রাজেনদাকে রওনা করিয়ে সিধু বলল চল কেটে পড়ি। কেস খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না। মেয়েটা একটু ঠ্যাঁটা আছে মনে হচ্ছে। আমরা back মার্চ তো Menoka.

হ্যাঁ, about turn, quick march, double up. সরকার একটু ইতস্তত করছে, রাজেনদার কি হবে?
আরে আপনি বাঁচলে..... চল চল। বলল মলয়। হলে ঢুকতে গিয়ে দেখি সোম নেই। আরে গেল কোথায়? নাকে একটিপ নস্যি টেনে মলয় বলে উঠল,
"চারে নেই তোর মাছ,
এখন কদম তলায় নাচ।"
What a philosophy! Great. চার টে বেদ গুলে খেলেও মলয় ছাড়া এ দর্শন কেউ ঝাড়তেই পারবেনা। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম তোর এই নানান philosophy র উৎস কি। বলেছিল নস্যি। Crisis period এ নাকি এটার মত genuine problem solver আর কেউ নেই!
অসীমেরও একটা philosophy আছে। যার যার তার তার। না না টিকিটের দাম নয়। entry ম্যাটার। অর্থাৎ টিকিট কেটে যার যার টিকিট তাকে তাকে ধরিয়ে দেওয়া। বলে কাউকে বিশ্বাস নেই, কখন ঢুকবে? আমাকেই বিশেষ করে। বলে কোথায় কচুরীর দোকান দেখে সেঁটে যাবি! কান্ডজ্ঞান হীন! ওর আবার সাবানের ফেনা থেকে দেখা চাই।
যাই হোক হলে তো ঢুকলাম। যে যার মত position নিয়ে বসে পড়ি। আমার corner seat. ব্যাস আপাতত তিন ঘন্টা নিশ্চিন্ত। আমি?
দিনের শেষে ঘুমের দেশে। সারাদিন তো আর সময় পাইনা!!
চোখটা বেশ টেনে এসেছে। খচরমচর শব্দ।
অঙ্গের ঘামের গন্ধ,
চারমিনার বাস।
সর্বাঙ্গে ফেলিল মোর
উতলা নিশ্বাস।
সোম এল।
কোথায় গিয়েছিলি?
আরে বলিস না। একদম কেলোর কীর্তি। রাজেন দা ফ্ল্যাট। পরে সব বলব। তুই ঘুমো। আমার ঘুমের ব্যাপারটা সবাই জানে।

ইন্টারভেলে ও বিশেষ কথা হলনা। বাথরুম, এক সিগারেটে তিন জনের টান, সোমকে অসীমের phrased গালাগালি এই সব করতে করতে ঘন্টা বেজে গেল।
যাকগে। হল থেকে বেরিয়ে আমরা হাঁটা দিলাম হস্টেলের পথে। সরকার একটু পিছিয়ে পড়ছিল বারবার। খালি চেঁচাচ্ছে দাঁড়াও দাঁড়াও। ওর জুতোয় পেরেক উঠেছে। ইটের টুকরো দেখলেই কুড়িয়ে নিয়ে .... ইট ভেঙে যায় তবু পেরেক মচকায় না।
অথ সোম উবাচ।
তোরা তো হলের দিকে গেলি। আমি ভাবলাম যাই দেখি রাজেনদা কি করে? কোন গন্ডগোল দেখলে...
"যমুনা পুলিনে বাঁশি বাজাবি?" বলে উঠল সিধু।
"চুপ কর, শুনতে দে", আমি বললাম।
সোম : আমি পেছন পেছন গিয়ে গাছের আড়ালে দাড়িয়ে পরলাম। রাজেন দা left right left right করতে এগিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু মাসল টাসল খেলিয়ে, সোজা front line punch.
" এই যে শু শু শুনছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ", direct একদম মধ্যমনি কে।
উত্তর এল "কি ব্যাপার?"
"আপনার না না নাম টা ব ব বলবেন?"
কেন? চোখের কোনে বিদ্যুৎ হেনে বলল মেয়েটি।
মনে হল রাজেনদা একটু দমেছে।
একটু বেশি চিৎকার করে রাজেনদা বলল, " বা আ আ আ জি, ব ব ব বন্ধুদের সাথে "।
মেয়ে টা প্রায় চিৎকার করেই ধমক দিল, "বাজি? ইয়ার্কি হচ্ছে? যাদবপুরের ছেলে তো"
রাজেনদা একদম ডাউন। মাসল টাসল গলে গিয়ে পাকস্থলি তে ঢুকে গেছে। মেয়েটা চেঁচিয়ে যাচ্ছে, "সব কটাকে চিনি। পালের গোদাটা তো সামনেই বসেছিল। যান যান গোদাটাকে বলুন আমার নাম সঙ্গীতা... সঙ্গীতা সিনহা। আমিও পোদ্দার নগর কলোনির মেয়ে। দেখে নেব সব কটাকে।"
রাজেনদা কোনরকমে ঢোক টোক গিলে বলতে গেল, " থ্যা থ্যা...." ।
আরেকটা মেয়ে বলে উঠল, "আরে, এটা দেখছি ধাক্কা গাড়ি! ঠেলা না দিলে চলবেনা।"
এইরে মারধর করবে নাকি? আমি খুব চিন্তিত। ততক্ষণে রাজেনদা ল্যান্ড করে গেছে। কোনরকমে থ্যাঙ্কু বলে quick about turn, ছুটতে যাবে। সঙ্গীতা আবার চেঁচিয়ে উঠলো, "এই যে শুনুন।" রাজেনদা freezed.... "ভবিষ্যতে আর কোনদিন এরকম বাজি ধরবেন না। যত কাপুরুষের দল। "
এবার রাজেনদা direct land করলো।
থ্যাংকু বলেই 100 মিটার ছুট।
থামল এবার সোম।
"কি হবে এবার?" বলল সোম। কি আর হবে? চল চল। তবে ঝড়ের পুর্বাভাষ পাচ্ছি...
আপাতত হস্টেল গেটে।

[5]

হস্টেলে ঢুকতে যাব, গেটের মুখে জটলা। আঁচ পাচ্ছি। সরকার টা একদম সিঁটিয়ে আছে। যদি রাজেনদা দুটো আপার কাট, লোয়ার কাট ঝেড়ে দেয়? আলু (অলোক চক্রবর্তী) চেঁচিয়ে উঠল, "কি করেছিস তোরা? রাজেনদা খেপে আছে। কি সব বিড়বিড় করছে আর D Block to B Block long march করছে।কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করছে তোরা ফিরেছিস কিনা। বারবার সিধুর খোঁজ করছে।"
আমি সিধুকে বললাম, "নে, আরো সাঁকো নাড়া!"
"কৈ বাৎ নেই। দেখ লুঙ্গা" । যখন কোন মতলব ভাজে তখন সিধু হিন্দি বলে সাধারণত।
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে। মুর্তিমান ঝড় সামনে।

"এ. এ. এইযে সব কো. কো. কোথায় প্আ লিয়ছিলে?" তীব্র কন্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রাজেনদা।" আমাকে বা. বা. বাঘের....."
বাঘ নয় বাঘিনি.. বলে উঠল সিধু। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাজেনদা, "ঠিক। আমাকে ব ব বলে কিনা ভ ভ ভ ভ..."
ভবিষ্যতে আর কখনো বাজি ধরবেননা... complete করলো সিধু।
বলে কি কি কিনা আ মি কা কা কা....
সিধু : কাপুরুষ।
রাজেনদা : তু উ উ মি জানলে কি ক ক রে? তো তো তোমরা তো পালিয়ে...
সিধু : না পালিয়ে যাইনি। আশেপাশে ছিলাম।
Attack is the best defence.
রাজেনদা অনেকটা দমে গেছে।
সিধু আবার বলল, "আপনার মত বীরপুরুষ, এত সহজে হার মেনে যাবেন?" ব্যাস।
Ice melts to water!
"তবু ভা ভা ভাব, আমাকে বলে কিনা ধা ধা ধাক্কা গাড়ি! কি সাংঘাতিক মেয়ে রে বা আ বা। একেবারে re re in forced concrete!"
এবার আমি বললাম, "না না বিচ্ছু। এখানে পুঁতে দিলে চিলিতে বিছুটি গাছ হয়ে বেরোবে।"
যাক পশ্চিমের রণক্ষেত্রে সব আপাতত শান্ত। আমরা মেসের দিকে যাচ্ছি। রাজেনদা আবার,"সিধু, আমার টাকা?"
"কিসের টাকা? "
"কেন বাজির!"
"শুধু বাজির কথা হয়েছিল, টাকার কথা তো হয়নি।" বলল অসীম । কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে ফেলল রাজেনদা।
" ব ব ব.."
আমি বলে উঠলাম, "শুধু বদ না, পাজির পাঝাড়া।"

রাজেনদা পর্ব অন্তে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে ফিরছি। পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সুশীল কুমার জমিনদার। (মেকা) কোথাকার জানি না, তবে টাইটল টা জমিনদারই। শৌখিন মেজাজ। যখন তখন কালোয়াতি গান করে। আমাদের দেখে বলে উঠলো... মালকোষ টা এক্কেবারে ঝুলিয়ে দিল বুঝলি। তবে দরবারিটা যা টানল না!
নস্যিতে লম্বা টান দিয়ে মলয় বলল... যা ভাগ। নির্বিকার জমাদার (হস্টেলে এই নামেই ডাকা হত) একই গতিতে বেড়িয়ে গেল।
সোমের গলায় কবিতা। (সাধারণত track change এর সময় বলে)
শোন
শ্যামল সোম ভাই,
লিলি পার্কের মালবিকা সেন
এখনও তোমাকে চায়।
এখনও তোমার ছবি রাখে
তার খালি রুজ কৌটায়।
"পালের গোদাটা কে?"
সিধু বলে উঠল।
"কেন সোম", আমি বলি।

আবার সিধু, "সামনে কে বসেছিল?"
"আশিস, হ্যাঁ ও বেটাই সামনে বসেছিল", সরকার উবাচ।।
মলয় বলে উঠল, "সবাই হাফ চান্স থেকে গোল করে যাচ্ছে, আর তুই ব্যাটা ফুল চান্স থেকেও কিছু করতে পারলিনা!"
বললাম, "আমি ভাই ডিফেন্সের প্লেয়ার, গোল বাঁচাতে জানি। করতে জানিনা"।

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?
সিধু সন্দেহ করেছিল। ফেরার পথে আমাকে একা ওর ঘরে টেনে নিয়ে গেল। Direct charge... তুই সঙ্গীতা কে আগে থেকেই চিনিস।
"কি করে বুঝলি?"
"সামনে বসা পালের গোদা।" বলল সিধু।
"তোর ব্যোমকেশ হওযা উচিত" বলে আমি বললাম, "হ্যাঁ আমি মেয়েটা আমার পূর্ব পরিচিত। ওর দাদা আমার খেপের বন্ধু। ওদের পাড়ার ক্লাবের ক্যাপ্টেন। ওদের ক্লাবের খেলা থাকলে আমাকে নিয়ে যায়। খেলার পরে খাওয়া দাওয়া ওদের বাড়িতেই হয়। মেয়েটা ওর বাড়ির মতই খেলা পাগল। হারলে আমাদের গাল মন্দ জোটে, জিতলে লুচি পরোটা। এই তো কয়েকদিন আগে খেয়ে এলাম গরম গরম পরোটা আর টাটকা নলেন গুড় । তবে.... "
বাধা দিয়ে বলে উঠল সিধু, "জানি। তোর দ্বারা গোল হবে না।"

সেই যে মোদের নানান রঙের দিনগুলি

সুব্রত দেব

এতদিন নিজেকে পরিচয় দিয়েছি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির

'প্রাচীন প্রাক্তনী বলে। কিন্তু সম্প্রতি আমার কাছে এক অভিনব বার্তা এসে পৌঁছেছে। এ যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার। ব্যাপারটা ধোঁয়াশা না করে বলেই ফেলি। কয়েকদিন আগে ফোনে আমার সহোদরার সঙ্গে কথা বলতেই সে আমায় বললে, অফিশিয়াল সিনিয়ার সিটিজন হলেও আমরা হ'লাম,'প্রবীণ-যুবক/যুবতী! পশ্চিম দেশের বাসিন্দা, ওরা এখন সব ইউনিভার্সিটি অফ থার্ড এজ' সদস্য হিসেবে ষাঠ থেকে একশ বছর বয়সের সকলে , একই ব্যাচের!

খানিকটা উৎসাহ পেলাম কথাটাতে। নিজেকে প্রাচীন থেকে রূপান্তরিত করে, এই 'প্রবীণ যুবক' 'আমি' পিছু নিলাম সেই সদ্য যুবক 'আমি'র খোঁজে!

বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেকের মতই যাদবপুর থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার হব , ছোট থেকেই সেই ইচ্ছেটা ছিল। তার সঙ্গে ছিল কলকাতা শহরের দুর্বার আকর্ষণ।

আর সেখানেই তো আমার ভবিষ্যৎ আশ্রমের ঠিকানা যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ! বিহারে জন্ম তাই ছোট থেকে রুক্ষ লাল মাটি, এবড়ো খেবড়ো পাহাড়, জঙ্গল, কোলিয়ারি,থারমল পাওয়ার প্লান্ট, স্টিল প্লান্ট ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয়টা ছিল বেশী। তাই তার পাশে কলকাতার ছবি তখন ছিল এক রূপকথার শহরের মতো । পাঁচ দশকে ঠিক কলকাতায় না হ'লেও, তার পাশ ঘেঁষে আমাকে পাঠান হল রামকৃষ্ণ মিশন বোর্ডিং স্কুলে। সেখানের শিক্ষার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বড় হচ্ছি আর মিশনের সান্ধ্য ভজনের শেষে আমার প্রার্থনা নিয়মিত ঠাকুরকে জানাচ্ছি।

বোধহয় তাতেই কাজ হল। তাই স্কুলের গণ্ডী পাড় করে অবশেষে কলকাতায় ল্যান্ড করলাম। স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা শহর, আমায় স্বাগত জানিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল। কৈশোর থেকে তারুন্যের হেলদোলে মিশনে থাকার দরুন একটাই রং চিনেছিলাম তা হলো গেরুয়া ! কলকাতায় এসে নানান রংএর সঙ্গে পরিচিত হ'তে চলেছি। যে আমি গান জানি না, সদ্য শাসন শৃঙ্খল মুক্ত আমি তখন কলেজ হস্টেলে বাথরুম সিংগার হিসেবে গাইছি, 'খোল্ দ্বার খোল্, লাগলো যে দোল'...দুটো বছর পড়াশোনা স্পীড বাড়াবার সঙ্গে আমার রঙে রসের উন্মাদনার রেশ বেড়ে চলেছে।

অবশেষে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্যে আমি যখন প্রস্তুত, তখন আমার বাবা তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন। তাঁর ইচ্ছে আমি বেনারস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ি। ওনার মতে, কলকাতার বাইরে নানান প্রদেশের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশায় দৃষ্টির গভীরতা বাড়বে ইত্যাদি...

আমার তখনকার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়! অনেকেরই হয়তো সদ্য যৌবনে অপ্রত্যাশিত এরকম

নানান স্বপ্ন ভেঙ্গেছে। তাই উল্লেখ করলাম। তবে বর্তমানকালের প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের তফাৎ হল আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সময় পিতৃ আজ্ঞা পালন করতাম।

আমার যাদবপুরের স্বপ্ন বানচাল করে দিয়ে বাবা পরম নিশ্চিন্তে বেনারসে আমাকে সেট্ করে ফিরে গেলেন। পাঁচ ছয় দিনে বুঝে গেলাম যে সেখানকার 'ব্রড আউটলুক' এর নামে ফ্রেশারদের সহজ, সরল সজীবতা খর্ব করার হাতিয়ার হিসেবে সিনিয়ার ছেলেরা ragging, যাকে বলে 'bulling করে তাদের প্রায় শ্বাসরোধ করে মজা পায়। বাবা এসবের কিছুই আগে শোনেন নি বা জানতেন না। তাই ওনাকে ব্যস্ত না করে সাহস করে কলকাতায় ফিরে এসে তাঁকে জানালাম।

সায়েন্সের সব কটা সাবজেক্টেই আমার মার্কস বেশ ভাল ছিল। প্রফেসর হেম চন্দ্র গুহর সঙ্গে দেখা করে বাবা বিস্তারিত জানালেন (প্রফেসর গুহ বাবাদেরও স্যার ছিলেন)। উনি তাঁর প্রিয় ছাত্রের পুত্রটিকে সানন্দে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। আমাকে আমার সিদ্ধান্তের জন্যও সাধুবাদ জানালেন।

এই স্মৃতি আমার কাছে অমলিন হয়ে থাকবে। এই দৃষ্টান্তটি উল্লেখযোগ্য এই কারনে যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আমার মতে "গুরু পরম্পরা"র আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। ভাবলে আমার কেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানের সকলেই, আমার সব ছাত্রবন্ধুদের গর্ববোধ হয়।

আমার হস্টেল জীবন শুরু হল 'ডি' ব্লকে। আমাদের প্রিফেক্ট সে সময়ে সিনিয়ার ব্যাচের সোমেশ দা। আমার কাছে বেনারস কলেজের কথা শুনে anti ragging group তৈরি করে ফেলল। ফ্রেশারদের ওপর কোন রকম যাতে হামলা না হয়, তার ওপর কড়া নজর রাখা হল। ভেবে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। কারন সে সময় নাম করা অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে র‍্যাগিং নামক জঘন্য প্রথা চলছে। দৈনন্দিন কাগজে বেরুচ্ছে, কলেজ কতৃপক্ষ সেখানে নিরুপায়। আর আমাদের প্রতিষ্ঠানে অল্প বয়েসের ছাত্ররা সেখানে নিজেরাই সে দায়িত্ব নিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিল! জানি না সোমেশদা কোথায় , যেখানেই থাক, আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা সহ স্মরণ করছি।

অনেকেই ছাত্রাবস্থায় কিছুটা প্রতিবাদী হিসেবে নিয়মভঙ্গের দলে ভিড়ে যায়। এই সব কালেই চলে এসেছে, আজও চলেছে। সেকেন্ড ইয়ারে হঠাৎ শুনলাম পিরিওডিক্যাল পরীক্ষা বয়কট করা হবে। তার দলপতি হিসেবে আমাদের সিনিয়ার রাজেনদা। আমাদের "ছোট ভাই" হিসেবে রাজেনদা খুব দেখাশোনা করত। এক বছরের জন্যে সাসপেন্ড হল। তারপর আবার জয়েন করল। আমাদের সহজ হাসি ঠাট্টা, সময়মত সদোপদেশ দিয়ে আমাদের সকলকে পুনর্জীবিত করল।

মনে পড়ে গেল আরেক সিনিয়রকে, দেবাশিস দাকে। আমি তখন 'সি' ব্লকে প্রিন্স প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের ফেসিং রুমে। একদিন রাস্তার উলটো দিকে এক বাড়ীতে বেশ জাঁকজমক দেখে আমরা বুঝে ফেললাম খাওয়া দাওয়ার বহর তেমনি হবে! ব্যস, রাজেনদাকে দেবাশিসদা চ্যালেঞ্জ দিল। ঐ উৎসব

বাড়ীতে নিজেকে নিমন্ত্রিত হয়ে মিষ্টি মিষ্টান্ন খেয়ে, মিষ্টি সঙ্গে করেও নিয়ে আসতে হবে।

আমরা এক্কেবারে জানলায় সেঁটে আছি। দূর থেকে রাজেনদা রাজভোগ খাচ্ছে দেখছি। বেশ কিছুক্ষন পরে ফিরে এল, মুখে চওড়া হাসি আর হাতে মিষ্টির হাঁড়ি।

যাকে বলে হিরো।

'কি ভাবে সম্ভব হল? সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায়,"আমরা আপনাদের নিকট প্রতিবেশী!"(অর্থাৎ আপদে বিপদে আমরাই পাশে আছি)" রাজেনদা এই পরিচয়েই নেমত্যন্ন বাড়ীতে আপ্যায়িত হ'য়েছিল। উৎসবটা ছিল 'গৃহ প্রবেশের'! মনে হয় ওনারা নতুন জায়গায় নব্য যুবকরা পাশে থাকলে একটা ভরসা এমনই ভেবেছিলেন, আর জানালায় নিকট প্রতিবেশীরা মিষ্টির অপেক্ষায় আছে দেখে, রাজেনদার হাতে মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন!

একবার কি করে যেন দেবাশিসদা প্রফেসর মণ্ডলের "চুঁচুড়া" দুর্বলতার হদিস পেয়ে গেল। আমাকে স্যারের প্রিয়ভাজন করাই ওর উদ্দেশ্য ছিল। আমি বিশেষ কিছুই আন্দাজ করতে পারব না সেটা জেনেই বোধহয় হয় দেবাশিসদার এক্সপেরিমেন্ট!

আমাকে লাইব্রেরী থেকে একটা বই নিয়ে (কি বইটি ঠিক এখন মনে পড়ছে না) স্যারকে বইটি সম্বন্ধে তাঁর কি মতামত জানতে হবে। আমি ঠিক তাই করলাম। স্যার বেজায় খুশী হয়ে একথা সেকথার পর জানতে চাইলেন কোথা থেকে এসেছি। সোজা চুঁচুড়া না বলে দু এক জায়গায় বাবার বদলীর সুবাদে স্যারের কানে চুঁচুড়া বাজতেই খুব খুশী হলেন। অল্প দিনের মধ্যেই আমি স্যারের স্নেহভাজন হয়ে পড়লাম।

আমরা সব সময়ই ছোট ছোট দলে বেরুতাম। সিনেমায় গেলে একটু ধোপ দুরস্ত হয়েই বেরুতাম। একবার দল বেঁধে সিনেমায় গিয়েছি। সেটা ছিল ,"মোগলে আজম"। ইন্টারভেলে বাইরে স্ন্যাক্স, পান এসব খেয়ে আমরা সকলে ঠিক করলাম সেদিনই পরের শোএও এই সিনেমাটা আবার দেখব। শুনলাম পরের শো 'হাউস ফুলঃ। 'ইম্প্রেসিভ টোনে' সিনেমার কতৃপক্ষকে আমাদের পরিচয় দিতেই ওনারা জায়গা করে দিলেন!

এ ধরণের ঘটনার মধ্যেই আমাদের নব যৌবনের হাসি, ঠাট্টা সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকত। তবে ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে সে সময় আমাদেরও দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা ছিল। যাদবপুর ইয়ুনিভার্সিটির ঐতিহ্য বাঁচাতে হলে সেই সামঞ্জস্য বজায় রাখার দায়িত্ব আজকের যুব ছাত্র সমাজের।

আর যাই হোক, সেই সৌভ্রাতৃত্বের মধুর সম্পর্ক যেন বেঁচে থাকে।

আমরা সকলেই ছাত্র সকলেই ভবিষ্যৎ গড়তে এসেছি। এটাই তখনকার সময় আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাই আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠানটির স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে।

সেই প্রয়াসেই ত' আমাদের সম্মিলিত অতীতের স্মৃতিচারণ!

সকলে মিলে আমাদের তারুন্যের সজীবতাকে ডায়রির পাতায় ছুঁতে পারি। হাসি, কান্না আর আনন্দের রঙের দিনগুলো আজও স্মৃতির পাতায় অমলিন।

সেই নানান রঙের দিনগুলোর কথাই সহোদরার আগ্রহে ফোনে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে থাকাকালিন কিছু নস্টালজিক গল্প চোখ বন্ধ করে বলে চলেছি আর হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কান পেতে শ্রোতা শুনে চলেছে, নিঃশব্দে।

আমি থামলাম। ওদিক থেকে একটু ভেজা গলার মন্তব্য শুনলাম, 'একি! এ যে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একটি আশ্চর্য সংবেদনশীল একান্নবর্তি পরিবারের ছবি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনে করিয়ে দেয়

সেই "গুরু পরম্পরা আশ্রম' শিক্ষা। যেখানে স্নেহ, ভালবাসা, শৃঙ্খলা আর শাসনে নব্য যুবসমাজ নিশিন্তভাবে নিজেদের সার্থক ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পেরেছিল। তোমরা রিয়েলি ব্লেসড...."

আমার চোখের সামনে দ্রুত দৃশ্যপটের পরিবর্তন। মুহূর্তে এই প্রবীণ তুফান বেগে ছুটে চলেছে সেই নব্য যুবকটিকে ধরতে। জীবনে তার সেই প্রথম সুযোগ।

প্রবীণ/যুবক' আমি আশাবাদী হয়ে তাই ত' চাইব!

(কম্পিউটারে বাংলায় লেখায় অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রইল! সেজন্যে দুঃখিত। ধৈয্য ধরে পড়বার অনুরোধ রইল)।

My Memoir

Sabyasachi Bagchi

[Our good friend is no more with us, but Sabyasachi's presence is immortal in us by his memory or 'Memoir'. This piece is reprinted from the souvenir of our Golden Jubilee Celebration in January'2013]

Fifty years have passed since graduation in Engineering in 1963. So many memories but I wll limit myself only on some incidents in our hostel life of our Jadavpur days.

Being a mofussil boy and coming to Kolkata for the first time, I was apprehensive of Kolkata environment. I was accommodated in main hostel block A, room no. 19. My roommates were also from mofussil town and we became friends in no time. We were the first batch to be ragged by seniors but only with witty questions. This was stopped within two years as seniors felt that control may be lost and may turn into ugly incidents as in other colleges.

In 1959 during puja vacation, we were preparing for going home for the first time after joining Jadavpur but nature was against us. There was heavy rain and flood all over West Bengal There was waist deep water around Jadavpur. Most of the boarders left but few of us were stuck. I and Kalyan Bose were from Berhampore. We hired a rickshaw for Jadavpur station. From Jadavpur to Sealdah by local train and from Sealdah by Lalgola Passenger, we reached Berhampore and that was the last train since both rail and road bridge collapsed at Paglachandi.

All hilsa fishes from Lalgola were dumped at Berhampore and those were sold @3 anna /seer.

I used to get pleasure in walking. My classmate since school days Shankar Chakraborty, first joined B.E.College and later shifted to Jadavpur. When in B.E.College, he came to my hostel and I wanted to see him off on his return. We walked along Prince Anwar Shah Road and via Metiaburuz, Kidderpore, Howrah Bridge to B.E.College Hostel. After a little rest with a cup of

tea and a toast, Shankar wanted to see me off. We walked again up to Howrah Station and there we really saw each other off.

I and Shakti started from Hostel for a walk and on the way, we decided to walk up to Calcutta Coffee House and have coffee there. We reached coffee house and had coffee there and then we realised that our pocket was empty and could not afford a bus ride and so again we had to walk back all the way from College Street to Jadavpur Hostel.

Saraswati puja was a great festival in our Hostel. Once we invited Engineering students from Girls' Hostel to participate in our puja and have khichri bhog with us. They came and enjoyed. In turn, they also invited us to visit their puja pandal in the evening. Four of us went their Ladies' Hostel.They offered us lot of sweets and we consumed very fast. One girl from Arts commented that we were eating like rakshas. We accepted the comment as a pride, though, we told that it was an insult and later we would give proper reply. Later I saw this girl at Berhampore. We recognised each other, though, she was talking to my elder cousin. I learnt from my cousin that this girl's family was very close to my maternal aunt's family.

When we were in 4th year, some of us decided not to go with the immersion procession. After return from Saraswati immersion, we always had 'bhang' drink prepared by the cooks the drink was kept in a locked room and the key was kept with a student. It was decided that key would be with me. Self, Shakti, Pranab, Amar and Manab minutely observed the drink preparation the drink was in concentrated form and needed to be diluted with water. Soon after the immersion party left, we thought the oppotune moment had come. We drank good amount of concentrated bhang and left the remaining portion little diluted, to look everything okay. I took one key of the room with me and left the duplicate with the cook.
After our bhang-drink, we went to Manab's room in B block, 2nd floor. After some time, we realised that all of us were talking nonsense, we decided to break off. I had to escort Amar and Pranab up to C block, since they were insisting for a visit to Jodhpur Park. The gateman took charge of the duo and I returned to my room at A Block, 2nd floor While coming along the corridor, I was continuously hitting the parapet, though. I wanted to avoid it since I could have toppled because of imbalancing force, generated in me because of bhang effect. However, on reaching my room, I soon became deeply asleep very soon. I didn't know when suddenly, I woke up due to heavy knock on the door. I opened the door with key in hand. I found a big assembly of my friends near my door and when I handed over the key, all my friends burst out laughing. I was informed that time was 5-30 p.m. and they had already had bhang-drink with the help of the duplicate key, as they could not wake me up for last 3 hours, soon after their return from immersion. Rather, they were very much worried as, in spite of their repeated efforts for 2 or more hours, they failed to wake me up till 5-30 p.m.

Many such memories are crowding in my mind. But let me call it a day, since space is limited and memories are endless

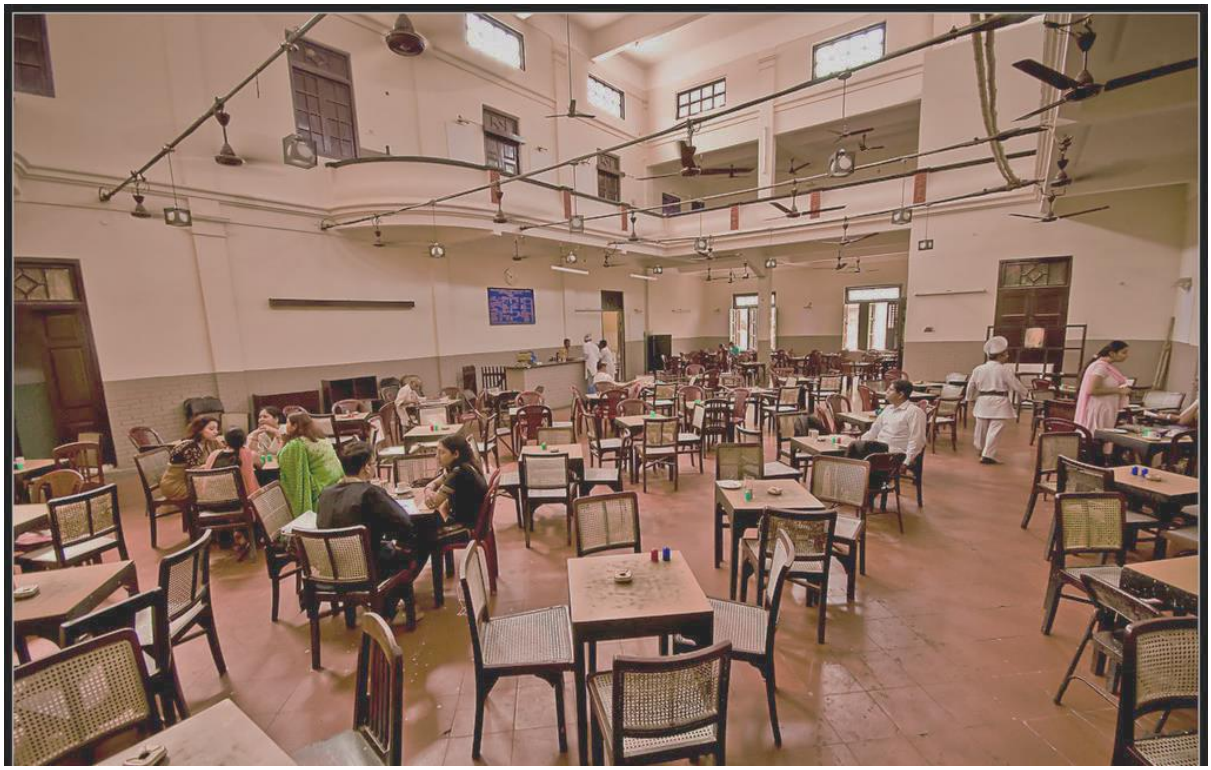

যাদবপুর স্মৃতি -- ডে-স্কলার

On Day-Scholar Friends

Dipak Sengupta

[1]

স্মৃতি মনের ভেতরটাকে অশ্রুসিক্ত করে চলেছে।
যাদবপুর জীবনে আমার প্রিয় বন্ধু তপন, তপন ঘোষ। ডানলপ ব্রীজের অশোকগড়ে নিজেদের বাড়ি আর দমদমে ক্যান্টনমেন্টে আমাদের ছিল ভাড়ার বাড়ি। যাদবপুরে আমাদের প্রথম ক্লাশ শুরু হত অরবিন্দ বিল্ডিংএ সকাল ১০.২০ তে। আমরা যে যার বাড়ি থেকে ট্রেনে ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করতাম। শিয়ালদা সাউথ থেকে এক সঙ্গে যাদবপুরগামী ট্রেনে উঠতাম। আমাদের মত আরও অনেক ছাত্রই যাদববপুর-গামী ট্রেনে যে কোন কামরাতেই উঠত। তবে আমি আর তপন প্রতিদিন একই কামরায় উঠতাম। দুজনে একসঙ্গে সিগারেট খাওয়া শিখেছিলাম। বাড়তি সুবিধে একটা সিগারেট দুজনে ভাগ করে খাওয়া হত।

আরেক সহপাঠী আমাদের সহযাত্রীও থাকতো শিয়ালদা সাউথ থেকে, সে অমর, অমর নাথ ভট্টাচার্য্য। CIT Roadএ তার বাড়ি। অমর height এ short ছিল৷ আমরা বলতাম বেটে অমর। পেছনে লাগার জন্য বলতাম অমর তো কোমরে বেল্ট বেঁধে চার ফুট এগারো ইঞ্চিতে ফুটবল খেলতে পারে! মস্ত বড় গুণ ছিল অমরের, তাকে কোন ভাবেই রাগানো যেতো না।

আর ছিল প্রণব, প্রণব চৌধুরী। শিয়ালদা সাউথ থেকে নিত্য সহযাত্রী। আমি আর প্রণব মতিঝীলের এক স্কুলের সহপাঠী ছিলাম। প্রণব ছিল আমাদের ক্লাশের ফার্স্ট বয়। স্কুলের প্রথমদিকে প্রণবকে একটু সমীহ করেই চলতাম। কিন্ত প্রণবের নিরহঙ্কার বন্ধুপ্রীতির স্রোতে আমি ভেসেই গিয়েছিলাম। আমাদের বন্ধুত্বের জোর ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে।

শিয়ালদা সাউথ থেকে আমাদের আরেক সহযাত্রী ছিল বলদেব, বলদেব বাসু। শ্যামবাজারের গ্রে স্ট্রীটে বলদেবদের তিনমহলা বাড়ি, অর্থবান বনেদী ঘরের ছেলে। আমাদের থেকে বছর দুয়েকের সিনিয়র ছিল, কারণ বলদেব B.Sc করে এসেছিল। কিন্তু যাদবপুরের সহপাঠী হিসেবে এটা কোন দূরত্বই ছিল না বলদেবের স্বভাবগুণে, এত বন্ধুবৎসল, পরোপকারী আর সদাহাস্যময় সহপাঠী বন্ধু পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার।
কোথায় যাদবপুর আর কোথায় কলেজ স্ট্রীট কফি হাউজ কিংবা বসুশ্রীর ওপরে Air Conditioned কফি হাউজ। ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে কিংবা ছুটিছাটার দিনে এসব জায়গায় বলদেবের সৌজন্যে আমাদের জমাটি আড্ডার আসর হত। বলা বাহুল্য এই সব আড্ডার সিংহভাগ খরচা ছিল বলদেবের বদান্যতায়। এ ছাড়াও ছিল আমাদের ফুটবল মরশুমে গড়ের মাঠে গিয়ে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখা।
চার বছরের যাদবজীবনের আজ অর্ধ শতাব্দী পার করেও আমাদের এই পাঁচ বন্ধুর বেশ কিছু অন্তরঙ্গ স্মৃতি এখনও কত উজ্জ্বল।
এই স্মৃতির ডালি থেকেই কিছু পসরা নিয়ে তোমাদের কাছে এলাম, ভাল যদি লাগে, তবেই কিন্তু শুনবে।

শুরুতেই আমাদের কার্য্যকলাপের একটু প্রাক কথন সারতে গিয়ে বলি, পরবর্ত্তি কালে জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে বুঝতে পেরেছি, যাদবপুর-শিক্ষা ক্লাশের বাইরেও আমাদের মধ্যে team-work শিখিয়েছিল আর শিখিয়েছিল Project work এর প্রথম পাঠ।
আমাদের পাঁচজনের মধ্যে অমর ছিল কলেজের বাইরের কাজে খুব উৎসাহী। অমর Project concieve করত, তপন project এর viability study করত, প্রনব আর আমি activity plan chalk-out করতাম,

তারপর আমরা project এর DPR (Detailed Project Report) পেশ করতাম বলদেবের কাছে Project এর Technical আর Financial approval আর জন্য। এই সব হয়ে যাবার পরই আমরা নেমে পড়তাম project implementation এর কাজে।

এরকমই একটা একদিনের Project ছিল টিফিনের পরের ক্লাশগুলো বাঙ্ক্ ক'রে মানিকতলার কাছে খান্না সিনেমা হলে একটা সিনেমা দেখা, অমরের প্ল্যান মত যে সিনেমাটা দেখা হবে, যতদূর মনে পড়ে, তার নাম ছিল 'flight to Assam'. ব্যাতিক্রমী নাম বলেই হয়ত মনে আছে, হিন্দি থ্রিলার। তা, আমাদের গোড়াতেই একটু starting delay হ'ল। আমরা হলে যতক্ষণে পৌঁছালাম, ততক্ষণে শো শুরু হয়ে গেছে। টিকিট কেটে হলে তো ঢোকা হল, অন্ধকার হল্, শো চলছে, বেশি আওয়াজ করা যাবে না, কর্মচারী একজন টর্চ জ্বালিয়ে আমাদের সিট্ দেখিয়ে দিল। একটা সারীর মাঝখানের পাঁচটা সিট। রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলাম আমাদের সিটের ডান দিক, বাঁদিক দুকেই প্রমীলা বাহিনী। সিনেমাটা যেমনই হোক, situation টা কি romantic! আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ নির্ধারিত পাচটি সিটের প্রথমটা কিংবা শেষেরটা। কারণ? কারণ সিটের এপাশে ওপাশে দুপাশেই কাকনের রিণি ঝিনি, নিষিদ্ধতার অমোঘ আকর্শন। আমাদের অবস্থা 'প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।' তাই আমাদের মধ্যে 'পরি গেল কাড়া কাড়ি, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তড়াতাড়ি।' বলদেব group লীডার, বল্ল - 'ডিসিপ্লিন ফার্সট, আমি আগে বাকী সন ফলো মি, শেষে থাকবে অমর'। ব্যাস, আমাদের তিন জনের 'আলী বাবার আরব্য রজনী'র স্বপ্ন ভঙ্গ। আমরা disciplined soldier, সামনে বলদেব আর পেছনে অমর, এই সিকোয়েন্সেই আমরা অন্ধকারে শাড়ি, চুড়ী আর আতরের ইশারা বুকের মধ্যে চেপে রেখে যে যার আসনে স্থিত হলাম। সিনেমা মাথায় উঠেছে, হাফ টাইম অবধি শুধু বলদেব আর অমরের ছট্ফটানি আর উতলা নিশ্বাস ইত্যাদি অনুভব করতে থাকলাম। কি হয়, কি হয় ক্লাইম্যাক্স! শেষ হ'লো হাফ টাইমে। hall এ আলো জ্বলে উঠলো, আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'লো, দেখলাম আমাদের এপাশে ওপাশে ব'সে সব বৃহন্নলার দল। অন্ধকারের চুড়ির রিণিকি ঝিনিকি শব্দ এখন আলোর পরশে বিশেষ এক ব্যাঞ্জনাময় হাততালির শব্দে পরিবর্তিত, শাড়ি পরিহিত মুখ-নিঃসৃত পুরুষ কণ্ঠ এখন যেন বড্ড পরুষ। ট্যারচা চোখে বলদেব আর অমরের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলাম। দেখলাম বলদেবের চোখে ভৈরবনৃত্য, অমরের চোখে সর্বহারার দৃষ্টি, আমাদের মুখেও কথা নেই।
বলা বাহুল্য, সিনেমার দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের পাঁচটা সিটই খালি ছিল।

[2]

যাদবপুর-জীবনের স্মৃতি মনের মধ্যে এক চলমান ছায়াছবি। ছাত্রবন্ধুরা কত উজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত। এবারের স্মৃতিচারণা, আমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের ছাত্রসুলভ দুষ্টু-মিষ্টি কিছু বজ্জাতির কথা নিয়ে, গুরুগম্ভীর কথার ফাঁকে একটু comic relief আর কি! ঠোঁটে একটু হাসির ঝিলিক। এ রকম ঘটনাও কিন্তু আমাদের যাদবপুর জীবনে খুব কম ছিল না।
চলমান ছায়াছবির মত দু একটি ঘটনার স্মৃতি এখনও মনকে হাসির ছোঁয়ায় ভরিয়ে রাখে। এসব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বন্ধুবর অমর, অমর নাথ ভট্যাচার্য্য, লম্বায় ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। আমরা বলতাম, কোমরে বেল্ট বেঁধে ৪-১১ হাইটের ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে পারে। এত বাহ্য, অমর ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র। প্রতিটি স্যারেদের চলন, বলন, কথন খুব ভাল নকল করতে পারতো। একদিনের ঘটনা বলি। General building এ বিভু বাবুর Design and Drawing ক্লাশ হবে। আমরা প্রস্তুত, স্যারের অপেক্ষায়। দূর থেকে শুনতে পেলাম স্যারের আগমন বার্ত্তা, বার্ত্তাবাহক অবশ্যই তাঁর জুতোর হিল থেকে ছন্দময় খট্ খট্ খট্ পাদুকা-ধ্বনি। খট্ খট্ সংগীত ক্রমশ এগিয়ে এসে ক্লাশের দরজার কাছে যেন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হল। বুঝলাম বিভু বাবু ঠিক দরজার ওপারেই, আমরা প্রস্তুত, তার পর গতি বাড়িয়ে বিভু বাবুর সোজা প্রবেশ, ডায়াসের ওপর। আমরা সব উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু একি! অবিকল বিভু বাবুর

ভঙ্গিমায় আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বিভুবাবু নয়, অমর! "Good morning my dear students, please sit down", কণ্ঠে আর বাচনে একদম বিভুবাবু। "Do you remember, what I was telling you yesterday?" স্যারের গতকালের বলা কথাগুলো অমর যেন অবিকল ঠিক বিভু বাবুর মত করেই বলতে লাগলো, "Whether I am ill or you are ill, that doesn't matter," বিভু বাবুর মতই উচ্চারণে 'doesn't' এর 'd'এর ওপর একটু বেশী জোর দিয়ে আর 'ড' কে 'ড' আর 'ঢ' এর মাঝামাঝি উচ্চারণ মানে ডাজ্ন্ট্ কে প্রায় ঢাস্ন্ট্ এর কাছাকাছি আর কি, অমর বলে চলেছে "Whether I am absent or you are absent, that doesn't matter..... ", অমর তার কথা শেষ করার আগেই এবার সত্যি সত্যিই বিভু বাবুর প্রবেশ!!! অমরের গলা তখনও সপ্তমে,সামনের দিকে অর্থাৎ সরাসরি আমাদের দিকে মুখ করে। যখন বিভুবাবু ঢুকছেন অমরের বা দিক থেকে, প্রায় নব্বই ডিগ্রী এঙ্গেলে, তখনও পর্য্যন্ত বিভুবাবুর উপস্থিতি অমর টের পায় নি। আমাদের চোখের সামনে এই দৃশ্য, আমাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা আর চাপা হাস্যরোল। ঘটনার এই অভুতপূর্ব্ব আকস্মিকতা আমি ঠিক ভাষায় রূপ দিতে পারছি না। যাই হোক, আমরা যে অমরকে বিভুবাবুর উপস্থিতি জানান দেব, তাও সম্ভব নয়! কিন্তু হঠাৎ আমাদের মধ্যে থেকেই কারোর ইশারায় অমর তার বাঁ দিকে তাকালো, একেবারে সামনা-সামনি বিভু বাবু, চুড়ান্ত অপ্রস্তুত অমর, তার মুখ-মন্ডলে তখন পাদপ্রদীপের আলো থেকে যেন হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসা অবস্থা আর ক্রমে মুখে ভীতির অভিব্যক্তি, ঘটনার আকস্মিকতায় বিভুবাবু নিজেও অপ্রস্তুত আর আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমুঢ়। আর তার পরেই দেখলাম অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়ে অমর অবস্থার সামাল দিল। উচ্চগ্রামের 'Doesn't matter' উচ্চারণ থেকে ক্রমশ নীচু খাদে 'Doesn't matter' বলতে বলতে ডায়াসের বাঁদিক থেকে ডান দিকে সরতে সরতে একেবারে নীচে নেমে সোজা নিজের seatএ পৌঁছে যাওয়া, ঐ পরিস্থিতিতে অমরের পক্ষেই সম্ভব ছিল। আমরা বিভুবাবুর সামনে কষ্টকরে নিজের নিজের হাসি চাপা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছি,বিভুবাবুর চোখেও তখন অবাক-বিস্ময়, কিন্তূ তাঁর আপাত গম্ভীর ঠোঁটের ফাকে হাসির ঝিলিক। বেশী সময় নিলেন না তিনি উদ্ভুত পরিস্থিতি বুঝতে, মাত্র মিনিটখানেকের খন্ড অংশের মধ্যেই তাঁকে কেন্দ্র করে হঠাৎ এই উদ্ভুত পরিস্থিতিকে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীমায় সামাল দিতে পরিচালকের ভূমিকা নিলেন। অমরকে এতটুকু অপ্রস্থুত না করে বিভুবাবু যেন অমরের কথার রেশ ধরেই বলতে থাকলেন, "Really, it doesn't matter. What matters is, you must be able to visualise the isometric from the plan, elevation and side view of any engineering object." বেশ কিছুক্ষণ স্যারের দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস টুকুও ছিল না, পাছে হাসি চাপতে না পারি!

এর পর অমরকে নিয়ে আরেকটি ঘটনা। সে আমাদের মধ্যে সব থেকে প্রাণবন্ত। তার একটি অসাধারণ গুণ ছিল, সে-যুগের (তখনও স্বর্ণ যুগ হয় নি) শিল্পীদের যে কোনও গান অমর তার গলায় অবিকল বসিয়ে নিতে পারতো। কখনও হেমন্ত, কখনও শ্যামল, আবার কখনও ধনঞ্জয় - অমর তখন বাজারে নতুন আসা যে কোন গানে স্বচ্ছন্দ। দুটি ক্লাশের মধ্যেকার শর্ট ব্রেকে ডায়াসে উঠে কত না তখনকার দিনের নতুন গানের কলি অমর শোনাত! একদিন শুনলাম, "নাম রেখেছি বনলতা যখন দেখেছি", তো একদিন শুনলাম, "ভাঙনের তীরে ঘর বেঁধে কিবা ফল", আরেকদিন শুনলাম, "কার মঞ্জীর বাজে রিণি ঝিনি ঝিনি, মনে হয় যেন তারে চিনি আমি চিনি।" এ হেন অমরের আরেকটা বৈশিষ্ট ছিল যে হঠাৎ হঠাৎ সে কিছু কিছু বিশেষণ শব্দকে মুখের লব্জ করে নিত, তারপর কথা বলার সময় সেই নিশেষণটি দিয়ে সব বিশেষ্যগুলিকে বিভূষিত করতো। একদিন শুনি অমর 'সেক্সি' কথাটাকে ভীষণ ভাবে ব্যাবহার করছে। কোনও স্যারের লেকচার একটু বোরিং লাগছে, তো অমর বল্ল, "স্যারের লেকচারটা কি 'সেক্সি' রে!" সব ব্যাপারকেই অমর 'সেক্সি' করে ছাড়ত। একদিন আগের দুটি ক্লাসের মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে অমর ডায়াসে উঠে গান শোনাল "ঐ কপোলে দেখেছি লাল পদ্ম, যেন দল মেলে উঠেছে সে সদ্য, আমি ভ্রমরের গুঞ্জনে তোমারেই দেখেছি, আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি .... "। গাইবার পরে, অমর বল্ল, "গানটা হেভ্যি সেক্সি, না?" এ রকম আরও কত কি? আমরাও শুনতে শুনতে বোর হচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ যে

ঘটনার জন্য অমর 'সেক্সি' কথাটার ব্যাবহার একদম ছেড়ে দিল, এখন সে ঘটনাটাই বলি। সেদিন ঠিক হল টিফিন টাইমে আমরা টিফিন করবো, সত্যেনদার ক্যান্টিনে নয়, ষ্টেশন রোড থেকে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার মেইন গেটের উল্টো দিকে "কিরণের কাফে" তে। সেখানকার পাঁউরুটি-ঘুগনি আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। তা, সেদিন "কিরণের কাফে" তে পাঁউরুটি-ঘুগনি দিয়ে টিফিন করা তো হল, তার পর, কাফে থেকে বেরিয়ে সামনেই 'মেশোর পানের দোকান' নামে একটা পানের দোকান, অমর গট্ গট্ করে সেই দোকানে গিয়ে স্মার্টলি বল্ল, "মেসো, একটা হেভ্যি সেক্সি করে পান সেজে দিন দেখি!" মেসো কি বুঝলেন, কি জানি! পানটা তো সেজে অমরকে দিলেন। অমর সঙ্গে সঙ্গে পানটা মুখে দিয়ে বল্ল, "এখন আমার ঠোঁট দুটো লাল হয়ে যাবে, খুব সেক্সি কিন্তু না রে?" কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অমরের অনবরত কথা-বলা-মুখ একদম নিশ্চুপ, একটাও কথা নেই, কি ব্যাপার? অমরের মুখখানাই কি সেক্সি হয়ে গেল নাকি ক্লাশে

ও ক্লাশের বাইরে

দীপক সেনগুপ্ত

যাদবপুর-জীবনের স্মৃতি মনের মধ্যে এক চলমান ছায়াছবি। ছাত্রবন্ধুরা কত উজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত। এবারের স্মৃতিচারণা, আমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের ছাত্রসুলভ দুষ্টু-মিষ্টি কিছু বজ্জাতির কথা নিয়ে, গুরুগম্ভীর কথার ফাঁকে একটু comic relief আর কি! ঠোঁটে একটু হাসির ঝিলিক। এ রকম ঘটনাও কিন্তু আমাদের যাদবপুর জীবনে খুব কম ছিল না।

চলমান ছায়াছবির মত দুএকটি ঘটনার স্মৃতি এখনও মনকে হাসির ছোঁয়ায় ভরিয়ে রাখে। এসব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বন্ধুবর অমর, অমর নাথ ভট্যাচার্য্য, লম্বায় ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। আমরা বলতাম, কোমরে বেল্ট বেঁধে ৪-১১ হাইটের ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে পারে। এত বাহ্য, অমর ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র। প্রতিটি স্যারেদের চলন, বলন, কথন খুব ভাল নকল করতে পারতো। একদিনের ঘটনা বলি। General building এ বিভু বাবুর Design and Drawing ক্লাশ হবে। আমরা প্রস্তুত, স্যারের অপেক্ষায়। দূর থেকে শুনতে পেলাম স্যারের আগমন বার্ত্তা, বার্ত্তাবাহক অবশ্যই তাঁর জুতোর হিল থেকে ছন্দময় খট্ খট্ খট্ পাদুকা-ধ্বনি। খট্ খট্ সংগীত ক্রমশ এগিয়ে এসে ক্লাশের দরজার কাছে যেন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হল। বুঝলাম বিভু বাবু ঠিক দরজার ওপারেই, আমরা প্রস্তুত, তার পর গতি বাড়িয়ে বিভু বাবুর সোজা প্রবেশ, ডায়াসের ওপর। আমরা সব উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু একি! অবিকল বিভু বাবুর ভঙ্গিমায় আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বিভুবাবু নয়, অমর! "Good morning my dear students, please sit down", কণ্ঠে আর বাচনে একদম বিভুবাবু। "Do you remember, what I was telling you yesterday?" স্যারের গতকালের বলা কথাগুলো অমর যেন অবিকল ঠিক বিভু বাবুর মত করেই বলতে লাগলো, "Whether I am ill or you are ill, that doesn't matter," বিভু বাবুর মতই উচ্চারণে 'doesn't' এর 'd'এর ওপর একটু বেশী জোর দিয়ে আর 'ড' কে 'ড' আর 'ঢ' এর মাঝামাঝি উচ্চারণ মানে ডাজ্ ন্ট্ কে প্রায় ঢাস্ ন্ট্ এর কাছাকাছি আর কি, অমর বলে চলেছে "Whether I am absent or you are absent, that doesn't matter..... ", অমর তার কথা শেষ করার আগেই এবার সত্যি সত্যিই বিভু বাবুর প্রবেশ!!! অমরের গলা তখনও সপ্তমে,সামনের দিকে অর্থাৎ সরাসরি আমাদের দিকে মুখ করে। যখন বিভুবাবু ঢুকছেন অমরের বা দিক থেকে, প্রায় নব্বই ডিগ্রী এঙ্গেলে, তখনও পর্য্যন্ত বিভুবাবুর উপস্থিতি অমর টের পায় নি। আমাদের চোখের সামনে এই দৃশ্য, আমাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা আর চাপা হাস্যরোল। ঘটনার এই অভুতপূর্ব্ব আকস্মিকতা আমি ঠিক ভাষায় রূপ দিতে পারছি না। যাই হোক, আমরা যে অমরকে বিভুবাবুর উপস্থিতি জানান দেব, তাও সম্ভব নয়! কিন্তু হঠাৎ আমাদের মধ্যে থেকেই কারোর ইশারায় অমর তার বাঁ দিকে তাকালো, একেবারে সামনা-সামনি বিভু বাবু, চুড়ান্ত অপ্রস্তুত অমর, তার মুখ-মন্ডলে তখন পাদপ্রদীপের আলো থেকে যেন হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসা অবস্থা আর ক্রমে মুখে ভীতির অভিব্যক্তি, ঘটনার আকস্মিকতায় বিভুবাবু নিজেও অপ্রস্তুত আর আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমুঢ়। আর তার পরেই দেখলাম অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়ে অমর

অবস্থার সামাল দিল। উচ্চগ্রামের 'Doesn't matter' উচ্চারণ থেকে ক্রমশ নীচু খাদে 'Doesn't matter' বলতে বলতে ডায়াসের বাঁদিক থেকে ডান দিকে সরতে সরতে একেবারে নীচে নেমে সোজা নিজের seatএ পৌঁছে যাওয়া, ঐ পরিস্থিতিতে অমরের পক্ষেই সম্ভব ছিল। আমরা বিভুবাবুর সামনে কষ্টকরে নিজের নিজের হাসি চাপা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছি,বিভুবাবুর চোখেও তখন অবাক-বিস্ময়, কিন্তু তাঁর আপাত গম্ভীর ঠোঁটের ফাকে হাসির ঝিলিক। বেশী সময় নিলেন না তিনি উদ্ভুত পরিস্থিতি বুঝতে, মাত্র মিনিটখানেকের খন্ড অংশের মধ্যেই তাঁকে কেন্দ্র করে হঠাৎ এই উদ্ভুত পরিস্থিতিকে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীমায় সামাল দিতে পরিচালকের ভূমিকা নিলেন। অমরকে এতটুকু অপ্রস্তুত না করে বিভুবাবু যেন অমরের কথার রেশ ধরেই বলতে থাকলেন, "Really, it doesn't matter. What matters is, you must be able to visualise the isometric from the plan, elevation and side view of any engineering object." বেশ কিছুক্ষণ স্যারের দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস টুকুও ছিল না, পাছে হাসি চাপতে না পারি!

এর পর অমরকে নিয়ে আরেকটি ঘটনা। সে আমাদের মধ্যে সব থেকে প্রাণবন্ত। তার একটি অসাধারণ গুণ ছিল, সে-যুগের (তখনও স্বর্ণ যুগ হয় নি) শিল্পীদের যে কোনও গান অমর তার গলায় অবিকল বসিয়ে নিতে পারতো। কখনও হেমন্ত, কখনও শ্যামল, আবার কখনও ধনঞ্জয় - অমর তখন বাজারে নতুন আসা যে কোন গানে স্বচ্ছন্দ। দুটি ক্লাশের মধ্যেকার শর্ট ব্রেকে ডায়াসে উঠে কত না তখনকার দিনের নতুন গানের কলি অমর শোনাত! একদিন শুনলাম, "নাম রেখেছি বনলতা যখন দেখেছি", তো একদিন শুনলাম, "ভাঙনের তীরে ঘর বেঁধে কিবা ফল ", আরেকদিন শুনলাম, "কার মঞ্জীর বাজে রিণি ঝিনি ঝিনি, মনে হয় যেন তারে চিনি আমি চিনি।" এ হেন অমরের আরেকটা বৈশিষ্ট ছিল যে হঠাৎ হঠাৎ সে কিছু কিছু বিশেষণ শব্দকে মুখের লব্জ করে নিত, তারপর কথা বলার সময় সেই নিশেষণটি দিয়ে সব বিশেষ্যগুলিকে বিভূষিত করতো। একদিন শুনি অমর 'সেক্সি' কথাটাকে ভীষণ ভাবে ব্যাবহার করছে। কোনও স্যারের লেকচার একটু বোরিং লাগছে, তো অমর বল্ল, "স্যারের লেকচারটা কি 'সেক্সি' রে!" সব ব্যাপারকেই অমর 'সেক্সি' করে ছাড়ত। একদিন আগের দুটি ক্লাসের মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে অমর ডায়াসে উঠে গান শোনাল "ঐ কপোলে দেখেছি লাল পদ্ম, যেন দল মেলে উঠেছে সে সদ্য, আমি ভ্রমরের গুঞ্জনে তোমারেই দেখেছি, আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি .... "। গাইবার পরে, অমর বল্ল, "গানটা হেভ্যি সেক্সি, না?" এ রকম আরও কত কি? আমরাও শুনতে শুনতে বোর হচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ যে ঘটনার জন্য অমর 'সেক্সি' কথাটার ব্যাবহার একদম ছেড়ে দিল, এখন সে ঘটনাটাই বলি। সেদিন ঠিক হল টিফিন টাইমে আমরা টিফিন করবো, সত্যেনদার ক্যান্টিনে নয়, ষ্টেশন রোড থেকে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার মেইন গেটের উল্টো দিকে "কিরণের কাফে" তে। সেখানকার পাঁউরুটি-ঘুগনি আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। তা, সেদিন "কিরণের কাফে" তে পাঁউরুটি-ঘুগনি দিয়ে টিফিন করা তো হল, তার পর, কাফে থেকে বেরিয়ে সামনেই 'মেশোর পানের দোকান' নামে একটা পানের দোকান, অমর গট্ গট্ করে সেই দোকানে গিয়ে স্মার্টলি বল্ল, "মেসো, একটা হেভ্যি সেক্সি করে পান সেজে দিন দেখি!" মেসো কি বুঝলেন, কি জানি! পানটা তো সেজে অমরকে দিলেন। অমর সঙ্গে সঙ্গে পানটা মুখে দিয়ে বল্ল, "এখন আমার ঠোঁট দুটো লাল হয়ে যাবে, খুব সেক্সি কিন্তু না রে?" কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অমরের অনবরত কথা-বলা-মুখ একদম নিশ্চুপ, একটাও কথা নেই, কি ব্যাপার? অমরের মুখখানাই কি সেক্সি হয়ে গেল নাকি, যে কথা বলতেও লজ্জা করছে? না, না, হয়েছে টা কি, না অমরের জিভ পানের মধ্যে দেওয়া অতিরিক্ত চুনের জন্য পুড়ে একাকার। মেসোবাবু অমরের সেক্সি-পানের অর্ডার কমপ্লাই করতে গিয়ে, সাজার সময় পানটির মধ্যে একগাদা চুন ঠেসে দিয়েছিলেন। সেদিনের সে ঘটনার পর থেকে কিন্তু অমরের মুখে 'সেক্সি' কথাটা কখনও আর শোনা যায় নি।
এ সমস্তই আজ কত বছর আগেকার কথা। প্রাণবন্ত অমর তার প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অনেক আগেই অমরলোকে যাত্রা করেছে, আমরা তার কয়েক জন বন্ধুরা, তার স্মৃতি নিয়ে এখনও এ পারেই রয়ে গেছি।

[3]

বলদেব, অমর, তপন, প্রণব আর আমি - আমরা এই পঞ্চ-যাদব, অসংখ্য স্মৃতি জড়ানো সেই প্রারম্ভিক যৌবনের, যাদবপুর আর যাদবপুর-বাইরের, মধুময় দিনগুলি। তার একটা নিয়ে আজকের মালাগাঁথা।

এবার বড় মাঠে খেলা দেখতে যাবার প্রজেক্ট। বলদেব আর অমর মোহনবাগানের সমর্থক, আমরা বাকী তিনজন ইষ্টবেঙ্গলের। কিন্তু অমর প্রজেক্ট concieve করে আর বলদেব তাকে করে approve. তাই এবারের প্রজেক্ট হ'লো বড় মাঠে মোহনবাগান vs ইষ্টার্ণ রেলওয়ের খেলা দেখা। আমাদের থেকে এক বছরের সিনিয়র ইলেক্ট্রিকালের বিমল দা (বিমল চক্রবর্ত্তি) তখন মোহনবাগানের নিয়মিত লেফট হাফের খেলোয়াড়। বিমলদার standing advice ছিল, মোহনবাগানের খেলার দিন মাঠে দু টো আড়াইটার মধ্যে পৌঁছানোর, না হলেই লাইন দিয়ে টিকিট পাওয়া মুশকিল। যেদিনের কথা, সেদিন আমাদের অনেকগুলো গুরূত্বপূর্ণ ক্লাশ ছিল। এক প্লেট ঘুগনি, একটা ডাবল ডিমের ওমলেট আর একটা ক্যাপস্টান-চুক্তিতে সন্দীপ পাত্রকে রাজী করানো হল আমাদেরকে সেদিনের ক্লাশ-নোটস গুলো দেবার জন্য। সুতরাং প্রথম দুটো ক্লাশ করে বাকী গুলোতে প্রক্সির ব্যাবস্থা করে আমরা নিশ্চিন্তে বাঙ্ক। বলদেবের মোহবাগানের মেম্বারশিপ কার্ড ছিল। কথা হ'ল, বলদেব কার্ড নিয়ে মেম্বারস গ্যালারীতে গিয়ে বসবে, আমরা লাইন দিয়ে টিকিট কেটে অন্য দিকে বসবো। খেলার শেষে নির্ধারিত স্থানে বলদেবের সাথে আমাদের দেখা হবে, বলদেব আমাদের আমীনাতে চাপ খাওয়াবে, তারপর যার যার বাড়ী ফেরা।
আমরা যখন মাঠে পৌঁছালাম, serpentine লাইন এক কিলো মিটারের কাছাকাছি। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট পাওয়া ছিল তখনকার দিনে চাঁদে যাবার মতই কষ্টকল্পনা। আমাদের group লীডার বলদেব মোহনবাগানের মেম্বারশিপ কার্ড আমাদের চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে মেম্বারস গেটের দিকে চলে গেল। বলে গেল আমীনার জন্য অপেক্ষা ক'রো কিন্তু। বলদেবের সঙ্গে আমরা তুমি থেকে তুই তে নামতে পারিনি, বাকীরা আমরা অবশ্য নিজেদের মধ্যে তুই-তোকারিই করতাম। যাই হোক, অমর অস্ফুট কণ্ঠে বল্ল -'আমিও স্লা এর পর মোহনবাগানের একটা কার্ড যোগাড় নেব।' বলদেব না থাকলে অমরই ছিল আমাদের অঘোষিত লীডার। অমর বল্ল, 'চল্, আমরা মাঠের হালচালটাই দেখি ঘুরে ফিরে' দেখলাম অমর ধীরে ধীরে চারিদিকের ভীড় ভাড় ঠেলে লাইনের মাথার দিকেই যাচ্ছে। কি আর করা! আমরা অর্থাৎ তপন, প্রণব আর আমি কোনমতে গুতিয়ে গাতিয়ে এগিয়ে চলেছি। লাইন ছাড়াও তখন গড়ের মাঠ লোকে লোকারণ্য, জন সমুদ্র। চারিদিকে অগুণতি শুধু মানুষ আর মানুষের মাথা। আর লাইনের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু Mounted Police মানে ঘোড়ায় চড়া পুলিশ। যেখানে মানুষের ঢল, সেখানে মানুষের লাইনে তো বিশৃঙখলা তো হবেই। আর এই বিশৃঙখলা রুখতেই mounted Police। লাইনের বাইরে মানুষের ঢল, লাইনে কোন রকম গন্ডোগল বাধিয়ে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে গায়ের জোরে লাইনে ঢোকার সুযোগ পেলেই হয়। আর এইসমস্ত অপকর্ম রুখতেই mounted Police.
অমর দেখলাম লাইনের সামনে ঘোরাফেরা করছে। লাইনের বাইরের কিছু লোকের জটলাও সেখানে। একটা mounted Policeও ওই জটলার খুব কাছ থেকে ঘোরাফেরা করছে। অমর চোখের ইশারায় আমাদের কাছে ডাকলো। হঠাৎ বল্ল, 'আইসক্রিম খাবি?' আমরা হ্যাঁ বলাতে এক আইসক্রিমওয়ালাকে ডেকে পাঁচ পয়সা দামের চারটে লাল রঙের কাঠিওয়ালা বরফ-আইস্ক্রিম কিনে নিজে একটা রেখে বাকীগুলো আমাদের দিল। আমি একটু বিস্মিত, কারণ আগে কোনদিনও অমরের এ ধরণের পাঁচ পয়সা দামের মিষ্টি বরফের প্রতি কোন আকর্ষণ দেখিনি। অবাক হয়ে দেখলাম কিছুটা কামড়ে, ফেলে, কিছুটা চুষে, কিছুটা গিলে অমর তাড়াতাড়ি আইস্ক্রিমটা শেষ করে, কাঠিটা হাতে নিয়ে কি যেন লক্ষ করছে। বুঝতে পারলাম, অমর মনে মনে কিছু একটা প্ল্যান করছে। তখনও আমাদের আইস্ক্রিম শেষ হয় নি। অমর আমাদের আরও কাছে ডাকলো, তারপর খুব নীচু স্বরে, যাতে আর কেউ শুনতে না পায়, বল্ল "আমার দিকে আর লাইনের দিকে নজর রাখিস, যাই ঘটুক না কেন, সুযোগের সদব্যাবহার করিস।"

অমরের কি প্ল্যান, কি করতে চাইছে আমরা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিনা। দেখলাম অমর ধীরে ধীরে mounted Police টার পেছনে গিয়ে দাড়াল। আমরা বিস্মিত হয়ে শুধু দেখতেই থাকলাম। কিন্ত আমাদের বিস্মিত হবার আরও কিছু বাকী ছিল। এর পর যা ঘটলো, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না, না আশে পাশের জটলার মানুষেরা, না লাইনের লোকেরা, না police নিজে। হঠাৎ দেখতে পেলাম mounted Police এর ঘোড়াটি পাগলের মত সামনের দিকে দু পা তুলে নাচানাচি শুরু করেছে, তার মনিবের কোন আজ্ঞাই সে মানছে না। Police টির নিজেরও ঘোড়ার ওপরে বসে বেসামাল অবস্থা। আর তার পরেই ঘোড়াটি পাগলের মত লাইন-ফাইন ভেঙে দিয়ে পাগলের মত ছুটে চলেছে। এদিকে লাইন ভেঙে ছত্রাকার, আমরা তিনজন এই সুযোগে লাইনে ঢুকে গেছি। ইতিমধ্যে আরেকটি ঘোড়সওয়ার পুলিশ এসে লাইন ঠিকঠাক করে আবার চারিদিক ডিসিপ্লিনে নিয়ে এলো। কিন্তু অমর কোথায়? জানিনা। খোঁজ করার উপায়ও নেই। যাই হোক, আমারা মহানন্দে খেলা দেখলাম। মাঠে action এ বিমলদার বিক্রম দেখে গর্বিত হলাম। মোহনবাগান ২-০ গোলে জিতলো। বলদেব নিশ্চয়ই খুশী, অমরটাও খুব খুশী হত।
খেলা ভাঙার পর নির্দিষ্ট স্থানে দেখি বলদেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পাশে একমুখ হাসি নিয়ে অমর দাড়িয়ে। আমাদের দেখে জিগেস করল, 'কিরে, খেলা কেমন দেখলি? আমিও দেখলাম, তবে র‍্যামপার্টে দাড়িয়ে।' আমাদের মুখে অবাক করা হাসি ছাড়া কোন কথা যোগাল না। বলদেব বল্ল, 'চলো, আমাদের নেক্সট ষ্টপ আমীনা।'
বলদেব ট্রিট্ দিল, আমরা ঔৎসুক্য আর ধরে রাখতে পারছিলাম না! অমরকে বল্লাম, 'এখন তো বল্,,ব্যাপারটা কি হ'লো?'
আমাদের অবাক হবার শেষ ঘটনাটা অমর এবার একটু হেসে রসিয়ে রসিয়ে অম্লান বদনে বল্ল, 'আমি আইস্ক্রিমের কাঠিটা সোজা ঘোড়াটার পশ্চাদ্দেশে ..... '

স্মৃতির মণিকোঠায় এই সব ঘটনা এখনও কত উজ্জ্বল!

[4]

আজ রইল আরেকটা পঞ্চ-যাদব কাহিনী-
ডে-স্কলারদের নিয়ে লিখতে বসে দেখছি, আমাদের এই 'পঞ্চ-যাদব' অর্থাৎ বলদেব, অমর, তপন, প্রণব আর আমি - এই পাঁচজনের স্মৃতিতে আমার মধ্যে কোনও ধুসর ছায়ার প্রলেপ্ তো এখনও পড়ল না!

একদিন বলদেব জানালো, "অমুক তারিখ শনিবার, ধমঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আসছেন গান শোনাতে। ঐদিন কলেজের পরে তোমরা সবাই সোজা আমাদের বাড়ীতে আসবে, আর নিজের নিজের বাড়ীতে বলে আসবে ফিরতে দেরী হবে।"
সে দিনের ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দেবো না, শুধু প্রিয় শিল্পী ধনঞ্জয়ের একটি গানের প্রসঙ্গ নিয়েই দুএকটি লাইন লিখব। পানের ডাব্বা সামনে রেখে ধনঞ্জয় তাঁর জনপ্রিয় গানগুলি একের পর এক গাইবার পরে, বল্লেন, "এখন আজকের শেষ গানটি গাইব। তবে তার আগে আমি দুটি কথা কই। আজ আমার স্বর্গত গীতিকার বন্ধু অনিল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যুদিন। তিনি আমার কাছে আমার দাদার থেকেও প্রিয় মানুষ ছিলেন। আজ তাঁরই কথায় গানটি গাইবার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি, এই কারণে বল্লাম কারণ এই গানটা গাইতে বসলে আমি ভীষণ emotional হয়ে পরি। জানি না কতক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারবো। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি গানটির অন্তরা দিয়ে শুরু করছি।" মুদিত-চক্ষু ধ্যানমগ্ন মগ্ন কণ্ঠে তিনি শুরু করলেন,
"মালা আমি গেঁথেছিনু সেদিন অনেক সাধে, পথ যে আমার কাঁদে, তোমার চরণচিহ্ন ধরে পথ যে আমার কাঁদে, পথ যে আমার কাঁদে এ এ এ,' গাইতে গাইতে তিনি সময় নিলেন নিজেকে আত্মস্থ করতে, তারপর

আবার শুরু করলেন, "ওগো আমার পথিক প্রিয় কখন তুমি এলে, সাড়া দেবার আগেই তুমি কখন গেছ চলে, মালা আমি গেঁথেছিনু সেদিন অনেক সাধে ..... . ", অশ্রুধারা বিগলিত তাঁর দুটি গাল, কান্না মেশানো তাঁর সেদিনের সেই গান, আমরাও প্রায় অশ্রুশিক্ত ছিলাম। স্মৃতি যেন মনের ভেতর কথা বলে।

ঠিক হল, আমাদের পরবর্ত্তি আড্ডা বসবে কলেজ ষ্ট্রিট কফি হাউজে, সময় রবিবার বিকেল চারটে, উদ্দেশ্য - 'সৌমিত্র' দর্শন। খবর ছিল, নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাকি প্রায় ফি রবিবারেই তাঁর কিছু বন্ধু নিয়ে কফি হাউজে আসেন আড্ডা দিতে। বলদেবের নির্দেশে আমরা পাঁচ মুর্ত্তিমান কোনো এক রবিবার অপরাহ্নের শেষ প্রহরে কফি হাউজে একটা টেবিলে পাঁচটা চেয়ার নিয়ে বসলাম। আমাদের আড্ডা জমে উঠেছে। পাশের টেবিলে জনা চারেক বিদগ্ধ জন, ইংরাজীতে এবং মাঝে মাঝে বাংলার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেশোদ্ধার করে চলেছেন, হাওয়ায় নস্যির ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসছে। আমাদের মধ্যে তপন ছিল চুপচাপ থেকে গম্ভীর গলায় অন্যের পেছনে লাগতে ওস্তাদ। হঠাৎ তপন গম্ভীর কণ্ঠে অমরকে বল্ল, " এই অমর, যা না, ঐ টেবিলে!ওদের ঐ ঘন ঘন নস্যিটানা যদি ডিসটার্ব করে আসতে পারিস, তবে তোর জন্য একটা চিকেন কাটলেট আমার তরফ থেকে।" অমর তপনের কথা শুনে যেন কিছু একটা ভাবলো, অশ্রুত গলায় নিজেই কি যেন কিছু বিড়বিড় করলো, শুনতে পেলাম না ঠিকই, কিন্তু বিড়বিড় করা ভাষাটা যে ইংরাজী ছিল, সেটা বুঝলাম। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে অমর বলে উঠল, "I accept the challenge." এ কিরে, অমর হঠাৎ ইংরাজীর ফোয়ারা ছোটাচ্ছে কেন! নিশ্চয়ই আবার কিছু প্ল্যান করছে। খেলার মাঠের ঘটনার পর থেকে আমরা ভয়ে ভয়েই থাকি, আমাদের না শেষে মারধোর খেতে হয়! তপনকে বল্লাম, "কেন ওকে খেপালি রে!" তপন বলে, "দেখ্ না কি হয়!" দেখলাম। অমর উঠল, পাশের টেবিলের সামনে দাড়াল, একজন নস্যি নিচ্ছিল, তার নস্যি টানা হয়ে গেলে অমর যেন সে লোকের নস্যিটানার স্টাইলটা লক্ষ করল, তারপর সেই তাকেই হাত পা নেড়ে আর তাদের নস্যির ডিব্বাটার দিকে আঙুল তুলে কি যেন বল্ল। কফি হাউজের সেই গম্ গম্ করা reverberant আওয়াজের জন্য কান পেতে রাখলেও অমর যে কি বল্ল কিচ্ছু শুনতে পেলাম না। তবে লক্ষ্য করলাম ওই টেবিলধারী চার জনের চোখে প্রথমে অবাক হয়ে যাওয়া দৃষ্টি এবং এর পর ক্রমশ অবাকদৃষ্টি বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হাসিতে রূপান্তরিত। অবাক হয়ে দেখলাম ওদেরই একজন ওই ঢাকনা খুলে নস্যির ডিব্বাটা অমরকে এগিয়ে দিয়ে ওকে নস্যি অফার করল। আমাদের আরও অবাক করে অমরও একটিপ নস্যি নিয়ে স্মার্টলি নিজের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাল। এবং তাৎক্ষণিক প্রতিকৃয়ায় অমরের নাসিকা থেকে উদগত 'হ্যাঁচ্ছো' ধ্বনি যেন কফি হাউজের গমগমে ধ্বনিকে আরেকটু উচ্চগ্রামে পৌঁছাল। পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকটাক পুছে 'It's OK, thank you' আমাদের টেবিলে ফিরে এলো। এসেই বেয়ারাকে ডেকে নতুন করে একটা চিকেন কাটলেটের অর্ডার দিয়ে তপনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।
প্রায় প্রায় সাথে সাথেই দেখলাম প্রবেশপথে যেন একটু বেশী বেসামাল চেঁচামেচি। প্রবেশ করছেন সঙ্গীবেষ্টিত নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। হস্তধৃত পঞ্চাশটা Capstan সিগারেটের একটা টিনের কৌটো। নায়কের রূপবর্ণনা না হয় নাই বা দিলাম, তবে এটুকু নিশ্চয়ই বলবো যেন সামনা সামনি চাক্ষুষ করলাম এক নিখুঁত গ্রীক-ভাস্কর্য্য। বলাই বাহুল্য, চোখের সামনের সৌমিত্র, পর্দ্দার সৌমিত্রের অনেকবেশী মোহময়। আমাদের সৌমিত্র দর্শন হ'লো।

যাক, আমাদের অর্থাৎ পঞ্চ-যাদবের কথায় আরেকবার ফেরা যাক। সৌমিত্র-পরবর্তী অবস্থা একটু থিতু হতেই দেখলাম ঐ নস্যি-টেবিল থেকে একজন, আমাদের টবিলে এসে সটান অমরের কাছে বল্ল, 'ভাই, আপনি যে লাইনটা আমাকে এসে বল্লেন, সেটা আমাদের এত ভাল লেগেছে যে কি বলব? সেই লাইনটা কাইন্ডলি এই কাগজটাতে একটু লিখে দিন না, please, আমাদের রেফারেন্সের জন্য!" আমরা নির্ব্বাক,

বিস্ময়ভরা চোখ মেলে এর ওর দিকে তাকাচ্ছি। অমর তো ফসফস করে ওই লোকের দেওয়া কাগজটায় কি যেন লিখে দিল, কাগজটা পেয়ে সে লোকতো খুশীতে ডগমগ হয়ে নিজেদের টেবিলে চলে গেল। আমরা অমরকে চেপে ধরলাম। অমর বল্ল, "উঁ হুঁ, এখন আর শুধু চিকেন কাটলেটেই হবে না। সাথে একটা Capstan ও চাই।" সঙ্গে সঙ্গে বলদেব বল্ল, "Approved." এতক্ষণে অমর খুস্।

ওর বলা লাইনটা আজও মনে আছে,
"Would you please be kind enough to allow me to dip the digits of my finger into that odouriferous concavity to pull out some pulverised atoms to mitigate my nasal titilisaion?"

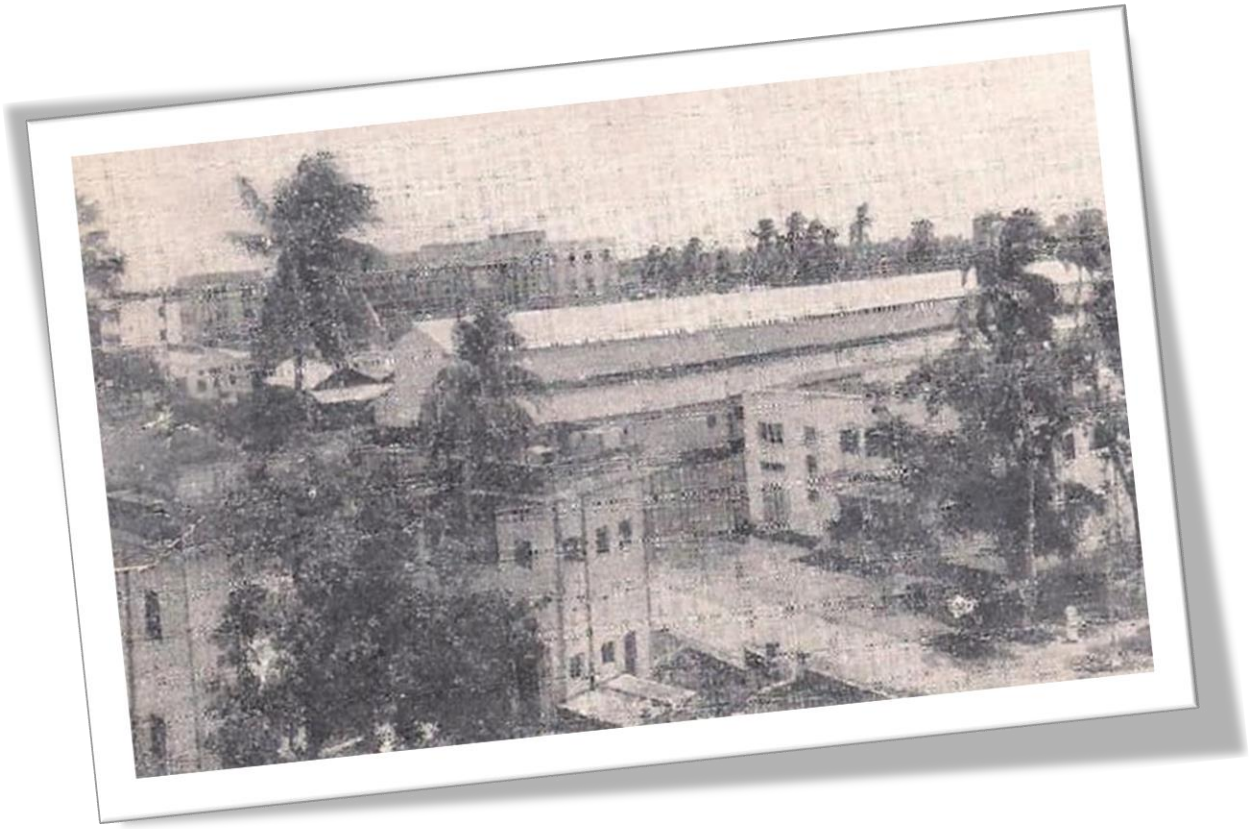

যাদবপুরের আরও গল্প

'৬২র টেবিল টেনিস ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত এক অধ্যায়

শিবশঙ্কর ঘোষ

"রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান" : (একটি সত্য কাহিনী)

আজ থেকে 58 বছরের আগেকার ঘটনা। 1962 সালে অল ইন্ডিয়া ইন্টার ইউনিভার্সিটি টেবিল টেনিসের নর্থ জোনের ফাইনালের আসর বসে ছিল ইন্দোরে। উদ্যোক্তা ছিল বিক্রম ইউনিভার্সিটি। যাদবপুরের অধিনায়ক নন্দন ভট্যাচার্য, এবং ম্যানেজার ছিলেন প্রফেসর অশোক শর্মা।

পথের বিভ্রাটের জন্য ইন্দোরে পৌঁছতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বম্বে এক্সপ্রেসে বিলাসপুর৷ বিলাসপুর থেকে বিলাসপুর-ইন্দোর প্যাসেঞ্জারে ইন্দোরের পথে যাত্রা, যাত্রাপথে ট্রেনের টিকিট এবং ফান্ডের পুরো টাকা সমেত অনেক মূল্যবান জিনিস চুরি, তাই ভুপালে বাধ্য হয়ে নামা, এরপর কোনমতে বাসের টিকিট কেটে ভুপাল থেকে ইন্দোরে পৌঁছানো। ইন্দোরে থাকার ব্যাবস্থা ছিল সেখানকার Christian College hostel এ। North Zone এর ফাইনালে পরের দিন বিকেলে যাদবপুরের খেলা ছিল। এই খেলাতে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজয়ী হয়। রমেশ ব্যানার্জী (ইলেক্ট্রিকাল), যে নিজে বিজয়ী দলের একজন খেলোয়ার, লিখছে, "Following evening our matches for North Zone fixtures started. We eventually reached final mostly for outstanding performance of Dipak, won final there. Col. Naidu, a resident of Indore came for distribution of prizes in that evening."

ম্যাচের আগে একজন দীর্ঘদেহী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রৌঢ় এসে জিজ্ঞেস করলেন, "যাদবপুরের ক্যাপ্টেন ও ম্যানেজার কোথায়?" প্রফেসর শর্মা ও নন্দন ভট্টাচার্য এগিয়ে এলেন। তিনি দুজনের সংগে করমর্দন করে বললেন, আমি C.K. Naidu. ডাঃ ত্রিগুণা সেন পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের টেবিল টেনিস দলটিকে আজ আমার নিজের শহরে পেয়ে খুব ভাল লাগছে। 1944 সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আমি একটা ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলাম এবং সেই ম্যাচে লাঞ্চের সময় ডাঃ সেন নিজে দুদলের খেলোয়াড়দের দেখাশোনা করেছিলেন। তাঁর সেইদিনকার আন্তরিক ব্যবহার আমি আজও ভুলতে পারিনি। আমার মুখ থেকে ওনার গল্প শুনে আমাদের পরিবারের সবাই ডঃ সেনের ভক্ত হয়ে যায়।আমি চাই তোমরা, তাঁর ছাত্ররা চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি নিয়ে কোলকাতায় ফেরো। আমার নাম সি.কে. নাইডু । উনি যদি নাম শুনে আমাকে চিনতে না পারেন, তাহলে বলবে ঐ ম্যাচে আমার মারা একটা "সিক্সার" মাঠ ও রাস্তা পার করে একটা বিল্ডিং এ ধাক্কা খেলে উনি বলেছিলেন এতবড় "সিক্সার" এর আগে কখনো দেখেননি।" এরপর কর্নেল নাইডু দলের সবাইকে আশীর্বাদ জানাবার পর বললেন,"কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানাতে সংকোচ বোধ করবে না। ডঃ সেনের ছেলেদের কোন রকম সাহায্য করতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।"

সুদূর ইন্দোরে এরকম এক অপ্রত্যাশিত শুভানুধ্যায়ী পেয়ে নন্দন ভট্টাচার্য, দীপক ঘোষ, রমেশ ব্যানার্জি, মলয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি সবাই ভীষণভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং নর্থ জোন চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠে। এর পর মূল ফাইনাল। প্রতিদ্বন্দী সাউথ জোন বিজেতা শক্তিশালী ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, দুদিন পরেই খেলা আমেদাবাদে। উদ্দীপ্ত যাদবপুরের ছেলেরা সেখানেও এক বিরাট উত্তেজনাময় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এর পর ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে দিতে সক্ষম হল। সেদিন নন্দনরা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টেবিল টেনিস চাম্পিয়ন হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবে আরেকটি পালক যুক্ত করল। এই ফাইনাল খেলার কথায় রমেশ, যে নিজে বিজয়ী দলের একজন খেলোয়ার ছিল, লিখেছে, "In the final, we played against Osmania University as south zone winner. For the first time, through out in this tournament, Dipak lost fourth match against Azam. At the end of 4th round, result was 2 each. Now it was Nandan's turn to win the last and deciding match against their second player to win the final. Nandan played the fifth and the

deciding set and displaying a brilliant class, won the last game, having thrilling finish at 26/24 points to win last and deciding match against their second player to win the final.
We came back triumphantly with the Champion's trophy, to Howrah station, though in unreserved compartment, only to see our VC, Dr. Sen himself waiting to greet us.

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ঢোকার সময় বিজয়ী দলের সদস্যরা লক্ষ্য করলেন প্ল্যাটফর্মে প্রচুর লোক, তাঁরা মনে করলেন ঐ ট্রেনেই বোধহয় কোন V.I.P আছেন। ট্রেন থামলে দেখা গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের "রেক্টর" ডাঃ ত্রিগুণা সেন স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন বিজয়ী দলটিকে নিজে অভিনন্দন জানাবার জন্য, আর সংগে আছেন অসংখ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভাকাঙ্ক্ষীগণ।

ON cricket
Biswajit das

Dipak. Thank you for adding another feather in the cap of JU golden team of TT along with Cricket and football. CK Naidu episode was not known to me.
I have seen CK Naidu, CS Naidu, Mustaq Ali, Jagdel, Sarvate etc playing for Holkar team in early fifties at Guwahati with our local combined club team in one day frieldy match. Every minute, seconds, every ball of the Game was memorable. One episode I cannot forget. After Jagdale quick 50 and Mustaq Ali 94 (he took batting stance at mid crease). Then came to bat CK Naidu. Hush silence. Bowler was our school team Hero young Nirmal Guha.He was off break bowler like Harbhazan. First ball wide outside off stump. CK lifted the bat and gracefully left the ball. The ball after hitting the pitch viciously turned in and uprooted the the off stump. CK could not believe. He patted the back of Nirmal and congratulated him. Anyway, Holker made unreachable 280+ in 3 down. Then our team came to bat. Within hour we were 6 down below hundred. Our young hero Nirmal Guha came to bat with thunderous applaud. Then suddenly CK Naidu decided to ball. Hush silence. CK ran two steps to deliver a flighted ball, wide outside leg stump. Nirmal gracefully left the ball copy book style, and we saw with unbelievable eyes that ball turned viciously, uprooted the middle stump. Normal went to CK and touched his feet. CK hugged and blessed him.
That is my Story of past memories.

On Annual Exhibition
Dipak Sengupta

যাদবপুরের স্মৃতি-কথায় গতকাল জেনারেল কারিয়াপ্পাকে পেয়েছিলাম। আজ আমি নিয়ে এলাম যাদবপুরে আমাদের সময়কার Annual Exhibition এর কথা।

এই exhibition ছিল যেন যাদবপুর-ছাত্রদের এক বার্ষিক আনন্দোৎসব। ১৯৫৯ এ যখন ভর্ত্তি হলাম, এই exhibition এর সময় দেখলাম organising senior দাদাদের সে কি উন্মদনা! প্রত্যক বছর, কলেজ কতৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে 3rd year এর ছাত্রদের ছিল সব দায়িত্ব, একাধারে organisers, show-men and participants. প্রতিটি জুনিয়র ছাত্রই 'মাদার'এর মাধ্যমে এই exhibition-উন্মাদনা গায়ে মেখে, 3rd year এ কবে উঠবো, কবে exhibition এ স্বক্রিয় অংশগ্রহন করব, এই আবেগেই দিন গুনতো।
অবশেষে আমাদেরও অপেক্ষা শেষ হল, আমরা 3rd yearএ পৌঁছালাম। Exhibition এর ব্যাপারে হাতে স্বর্গ এল, এবার তো exhibition এর দায়িত্বে আমরাই!
প্রায় মাসেকখানেক আগে থেকেই exhibition এর প্রস্তুতি শুরু হত। বর্ত্তমানে কি হয় জানি না, এখন হয়ত exhibitionই হয় না! যাক্ সে কথায়, exhibition এর প্রস্তুতির জন্য শুরু থেকে তখকার নিয়ম-টিয়ম গুলো, ক্রমানুসারে সাজালে মোটামুটি এই রকম :

প্রতিটি মডেল নিয়ে নিজেদের মধ্যে group discussion করা।
প্রতিটি মডেলের জন্য নিজেদের আলোচনার ভিত্তিতে ৫/৬ জনের group তৈরী করা।
প্রতিটি মডেলের সংক্ষিপ্ত Write-up তৈরী করে ভারপ্রাপ্ত কমিটিকে মনোনয়নের জন্য পাঠানো।
মনোনীত হবার পর শুরু হত মডেলটি assembly করে তাকে working model এ রূপান্তরিত করা।
শেষ ধাপটি ছিল, নিজের নিজের groupএর জন্য বরাদ্দ ষ্টল সব সাজিয়ে গুছিয়ে মডেলগুলোকে যার যার বরাদ্দ ষ্টলে কমিশনিং করা, আর ঠিকমত কাজ করছে, সেটা দেখে নিয়ে একটু নিজেদের মধ্যে রিহার্সাল দিয়ে নেওয়া।
আর এই শেষ ধাপটি exhibition open হবার আগের দিনেই করে ফেলা।

এবার আসা যাক আসল কথায়। এই exhibition টা ছিল C.E.T আর C.A.S combined, কিন্তু Engineering. আর Arts & Science এর একই মাঠে আলাদা আলাদা ষ্টল থাকতো। যতদূর মনে পড়ে, Civil Engg. Deptt. এর পাশে, অনেকটা খালি মাঠ ছিল, সেই মাঠটাই ছিল Exhibition এর জন্য dedicated. আমাদের সময় হয়েছে কি, আমাদের ষ্টলের ঠিক পাশের ষ্টলটাই ছিল C.A.S এর জন্য বরাদ্দ, History Department এর। তাই exhibition শুরু হবার দুএক দিন আগে থাকতেই সব রঙীন প্রজাপতিদের আনাগোনা লেগে থাকতো। আমাদের মডেলটি ছিল Axial Flow Pump. আমাদের groupএ আমরা ছিলাম চার জন। group লিডার সন্দীপ পাত্র, আর বাকীরা হল আমি, হরিপদ লালা, মাধব পুরুষোত্তম গোরে। প্রতিবেশী ইতিহাসের ষ্টলের পাঁচজনের groupএর লীডার ছিল একজন ছাত্রী, groupএ আরও দুটি ছাত্রী আর দুজন ছাত্র। কান পেতে পাশের group, লীডারের নাম জেনেছিলাম আমরা, নাম ছিল টীনা দেশাই। Exhibition এর প্রথম দুদিনে আমাদের ষ্টলের দর্শক কম, সৌজন্যে টীনা দেশাই। আকর্শনীয় বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ, চড়া মেক-আপ, সুন্দর শাড়ি, সুন্দরতর চেহারা - দর্শকবৃন্দ চুম্বকের টানে তো আসবেই! আমাদের ষ্টলে দর্শক-সংখ্যা অনেক কম। Exhibition এর দুদিনের মাথায় আমাদের লীডার সন্দীপ বল্ল, "এ ভাবে তো চলতে পারে না, কিছু একটা করতে হবে।" জানতাম, চুপচাপ অন্যের পিছনে লাগতে বা ফিচলেমি বুদ্ধিতে সন্দীপের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু এ ব্যাপারে তার কি অভিসন্ধি, তা ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না। যাক, পরের দিন অর্থাৎ প্রদর্শনীর তৃতীয় দিন তো শুরু হল। আমার প্রতি লীডারের নির্দেশ, একটু ভিতরে দিকে swich board এর কাছাকাছি থাকা আর তার সিগনাল

পেলেই Pump এর switch on করা, গোরের প্রতি নির্দেশ, পাশের ষ্টলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সেদিকে নজর রাখা, আর হরিপদর প্রতি নির্দেশ দর্শকদের attend করা। যাই হোক, লীডারের নির্দেশ মত আমরা যে যার পজিশন নিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনলাম, Start. আমি পাম্প চালু করলাম। একটু পরেই পাশের ষ্টলে উচ্চ কোলাহলের ধ্বনি, দৌড়াদৌড়ি, কি হল কি হল, এ রকমই এক বিমুঢ় বিশৃঙখলতা -- আমি নার্ভাস হয়ে পাম্প বন্ধ করলাম, আর তখনই বাইরের দিকে ফিরে দেখি পাশের ষ্টল থেকে টীনার ছুটে এসে সামনে-পাওয়া গোরের গালে সপাটে এক চপেটাঘাত। আমরা হতবাক, গোরের চোখে অবাক বিস্ময়, আমাদের লীডারের ঠোঁটে হাসির ঝিলিক, দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, কিন্তু চোখে রোষাণল। উপস্থিত স্যারেদের হস্তক্ষেপে অবস্থা শান্ত হল কিছুক্ষণের মধ্যেই। একটু পরে দেখলাম সামান্য দূরে গিয়ে, তখনও ঘটনার আকস্মিতকতায় আমরা হতভম্ব, গোরের হাত ধরে টিনার ক্ষমা চাইবার অভিব্যক্তি। ভাল করে নজর করে বুঝলাম টিনার শাড়িটি জলে ভেজা। দিনের শেষে সন্দীপ গোপনীয়তার অঙ্গীকারে অত্যন্ত নিম্ন কণ্ঠে রহস্যটা উন্মুক্ত করল। আগের দিন রাতে সন্দীপ, আমাদের পাম্পের ডেলিভারী পাইপটা ঠিক পাশের ষ্টলের দিকে সরিয়ে নিয়ে, তাতে সামান্য angle করে একটা প্রায় ১০ মিলি ডায়ার ফুটো করে রেখেছিল। তাতেই বাজী মাত। পরদিন এতটা স্থির নিশানায় লক্ষ্যভেদ, এটা কিন্তু আশাতীত ছিল লীডারের কাছ।
শান্তি ফিরলো, উদ্ধত টীনা এর পর থেকে আমাদের মত সাধারণত্বেই নেমে এল। এরপর আমি এ ঘটনাকে আর বেশি টানব না।
উপসংহারে বলি, Exhibition শেষ হয়ে যাবার কয়েকদিন পরে ক্লাশে এসে একেবারে ফিস ফিস গলায় সন্দীপ আমায় বল্ল, "জানিস দীপক, আমাদের গোরে আর ওদের টীনা গড়িয়াহাটার মোড়ে একসাথে পাশাপাশি হাটছিল। এরপর থেকে কিন্তু গোরে আর টীনার ঘনিষ্ঠতার সংবাদ নিয়মিতই আমাদের গোচরে আসছিল।

দেখতে দেখতে পরের বছর এল, আমরা Engineering পাশ করলাম। যাদবপুর-জীবনে আমাদের যবনিকা পড়ল। বিদায় বেলায় গোরের সংগে আমাদের আন্তরিক সৌহার্দ্য বিনিময় হল। এরপর গোরে আমাদের জীবন থেকে হারিয়েই গেল। জানিনা, এটা হ'তে-হ'তে-হ'য়ে-গেল'র গল্প নাকি হ'তে-হ'তে-হ'লনার গল্প!

স্মৃতি মনের পর্দায় ছায়া ছবি হ'য়ে ভাসছে। পরের কিস্তিতে আমাদের আরেকজন অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধেও প্রফেসর মধু সুধন সেনগুপ্তকে শ্রদ্ধা জানাবো তাঁর দু একটি মহামূল্যবান উপদেশ নিয়ে।

On Annual Exhibition
Prafulla Roy

Jadavpur University Annual Exihibition. 1962.
এই Exihibition এর কথা দীপক আগেই লিখেছে। আমি আমাদের groupএর কথা লিখছি। তপন গুপ্ত, সুভাষ, আমি ও আরও দুজন। নাম মনে করতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমাদের group লিডার তপন গুপ্ত অনেক কিছু যোগ করতে পারবে।
আমাদের stall এর নাম ছিল Auto Package Labelling Machine.
লেখা লেখি করে approval নেওয়া হ'ল। তারপর বড়বাজারের বিভিন্ন দোকান ঘুরে পুরান ball bearing, belt conveyer জন্য belt, cam, cam shaft এবং আরও কত কি। তারপর একমাস ধরে চললো workshop এ কাজ। testing হ'ল। Exihibition এর দুদিন আগে সেট করা হল। দেখে নিলাম সকলে

মিলে। চালালাম। cam, conveyer belt, 3 position auto stoppage etc..অনেকটা দেশলাই বক্সের দুদিকে লেবেল লগানর মত।
Exihibition এর দিন অধীর আগ্রহে দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করা। আমার দায়িত্ব ছিল সমস্ত বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া। খুব simple ভাবে। তারপর প্রশ্ন উত্তর। আমরা সবাই মিলে উত্তর দিতাম।
একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক বিজনেস ম্যান বললেন আপনারা চকলেট / লজেন্স এর মোড়ক তৈরী র জন্য এরকম একটা কিছু বানাতে পারবেন? আমরা হ্যা বলাতে নাম, কন্ট্যাক্ট নং দিয়ে যান।
খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। দর্শক সকলেই চলন্ত m/c দেখে খুব খুশি।
তারপর একদিন Auditorium এ সকল দল কে ডাকা হয়েছিল। পুরষ্কার বিতরনের জন্য। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি আমি নিজে কোন পুরষ্কার পাব।
হঠাৎ নাম ঘোষনা হ'ল Best demonstrator 's prize goes to Prafulla, Mechanical. আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।
পরে জানলাম সব ডিপার্টমেন্ট থেকে ছাত্র নিয়ে একটি বিচারকমন্ডলী গঠন করা হয়েছিল। যারা প্রতিদিন বিভিন্ন স্টল এ ঘুরে তাদের কাজ কর্ম দেখতো। এই দলে ছিল '৬২ মেকানিকাল এর Apurba Mukherjee, now in USA.
অপূর্ব এবিষয়ে বলতে পারবে।
সঙ্গের মেডেল টা আমার নামে হলে ও সবার প্রাপ্য।
তপন গুপ্ত কে ধন্যবাদ।

Further on Exhibition
Tapan Gupta

প্রফুল্ল— তোমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর (শিক্ষকতা করেছ তো!—এত প্রাঞ্জল ও ঝরঝরে ভাষায়,ভঙ্গীতে আমাদের ক্রিয়াকান্ডের বর্ণনা করেছ তার জন্য ধন্যবাদ। তবে Group Leaderএর পদে বসিয়ে লজ্জায় ফেললে— আমি অনেক কিছুই ভুলে গিয়েছিলাম— কত নিখুঁত পরিবেশন।
যতদূর মনে পড়ে সুভাস ভট্টাচার্য্য ছিল প্রকৃত Leader,পরামর্শদাতা ও দক্ষ করিগর। তবে এই modelএর concept পেয়েছিলাম আমাদের library তে বসে একটা technical journalএর পাতায় simple line diagram এবং short brief থেকে. পরে workshopএর শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায় সুধীর দাস স্যারের সহযোগিতায় সুভাষ (mainly) এবং আমি রূপদান করি design & developementএ।
তোমাদের অকুন্ঠ পরিশ্রম আমাদের প্রয়াসকে সাফল্যমন্ডিত করেছিল ও প্রসংশা পেয়েছিল।আমার ভালবাসার সেই বন্ধু সুভাষের সঙ্গে এর পর দেখাই হয়নি— ও ছিল আমার প্রেরণার উৎস, প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছিল ওকে জীবনে,খুব কাছ থেকে দেখা। মনে পড়ে আশীষ রায়, অশেষ রায়চৌধুরী হয়ত ছিল আমাদের দলে।
Best Demonstrator's prize পাওয়াতে আমরা গর্ব্বিত আর এর সুরক্ষা আমাদের সফল প্রয়াসের স্মৃতিচিহ্নও বটে।

On JU Convocation of 62'
Tapan Gupta

আমরা ছিলাম Day Scholar (শব্দটা বিস্ময়সূচক)— ১০.২০ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা, সব ক্লাশ, lab, workshop করে বাড়ী ফিরে যাওয়া— এই নিয়ম পালনের পর আমার অন্য সুযোগের আনন্দ নেওয়ার অবকাশ ছিল না।
আবাসিক ছাত্রদের স্মৃতির ঝাঁপিতে অনেক রত্ন সঞ্চিত আছে— হাসি, মজা, ঝগড়া,গাড বন্ধুত্ব, প্রেম, বিচ্ছেদ প্রভৃতি।
আমার ঝাপসা স্মৃতিতে একটা ঘটনা এখনো অমলিন হয়নি - উপলক্ষ্য ১৯৬২ সালের সমাবর্ত্তন উৎসব— উৎসবই বটে, এখনকার মত নয়।

আজ এখানেই শেষ করছি— ঘটনাটা পরে লিখে পাঠাব— এমন কিছু বিশেষত্ব নেই, শুধুই সাদামাটা।

আর লেখার অভ্যে হারিয়ে ফেলেছি টানা ৩০ বছর shopfloorএ worker ঠেঙ্গিয়ে।

ঘটনার বিবরণে ভুলভ্রান্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। তোমার উপর দায়িত্ব দিলাম সংশোধনের।

সাদামাটা ঘটনার "প্রাককথন":-

গতবছর MIT, Sloan School of Management"এর Executive Developement Programme এর সমাবর্ত্তনের live telecast দেখছিলাম আমাদের জামাইয়ের সৌজন্যে।সেখানে সারিবদ্ধভাবে প্রাক্তনীদের যোগদান আমাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি উসকে দিয়েছিল। আজ সেই কথাই লিখছি।
শীতকালের অপরাহ্ন। মিঠে রোদে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ সবুজ প্রান্তর, libraryর দিকে সুশোভিত সমাবর্ত্তন সভাগৃহ— তখনকার সময়ে এত আকর্ষনীয় pandal আমাদের গর্ব্বের বিষয়।
আমরা NCC cadet রা যে যার unit এ formationএ দাঁড়িয়ে commandএক অপেক্ষায়— তুমি, প্রফুল্লও ছিলে নিশ্চয়ই। মনে পড়ে যেন Prof Arun Gupta(ভুল হতে পারে) Command lead করছিলেন। Chief Guest(কে ছিলেন মনে নেই) এলেন, আমাদের VC সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং আমরা সুশৃঙখলভাবে Guard of Honour দিলাম drum beatএর তালে পা মিলিয়ে paradeএক মাধ্যমে।
এরপর সারিবদ্ধভাবে ওনারা সভাগৃহে প্রবেশ করার পর আমরা স্বস্থানে ফিরে formationএ দাঁড়ালাম। তখনই এল সেই সুদৃশ্য। যাদবপুরের আমন্ত্রিত প্রক্তনীরা Year of Passing orderএ সুবেশে হাসিমুখে placard নিয়ে এগিয়ে আসছে, তাতে বছরের সংখ্যা লেখা।মাঠের চারপাশে দর্শক হাততালি দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, তারাও এই উষ্নতায় অভিভূত, প্রত্যুত্তরে তারাও placard উঁচিয়ে ধরছে— সেই দৃশ্য আমাদেরও অভিভূত করেছিল।মনে পড়ে যেন প্রাক্তনীদের সবচেয়ে বরিষ্ঠতম সদস্যের Pass out year ছিল ১৯০৩। এখন আর এসবের বালাই নেই— NCEর সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষণ।

On JU Annual Exhibition
Sankar Chakrabarty

10th JU Exhibition. Thinking of the JU days I remember our 10th Annual Exhibition 1962 and the Cup we won as the best model of Mechanical Court with Syamal Das Sarma, Malay Bhattachariya, Durgadas Ray Choudhuri and myself with the Idea and guidance of Prof. Madhu Bhattachariya who came few months ago from Germany and inspired us for a model Sonic Sieving Machine to sieve very fine articles viz. Mica without any clogging during sieving as the sieve vibrates vertical and not horizontal. In JU Workshop the structure was welded and the model worked from the First hour of Exhibition. We we're diclared the best model Maker in Mechanical Court.

কিছু কথা যাদবপুরর দিন গুলোর
Dipak Sengupta

স্মৃতি গোপনে হৃদয়ে কাজ করে, মনের পর্দায় আমাদের সেই কোন ফেলে আসা কালের ঘটনাক্রম চলমান ছায়াছবির মত দৃশ্যমান হতে থাকে।
দুএকদিন আগে লিখেছিলাম আমাদের সময়ের JU Social এর কথা। বন্ধুবর অনুজ সিদ্ধার্থ (দত্ত) বল্লেন, "..... ওটা ছিল যাদবপুরের স্বর্ণযুগ ।" আমরা ভাগ্যবান, সত্যিকারের স্বর্ণযুগ আর সে সময়ের যাদবপুর ছিল সত্যিকারের সমার্থক আর সেটাই এখনও আমাদের মননে।
আমাদের সময়কার সত্যেনদার ক্যান্টিন, ক্যান্টিনের ডবল-হাফ চা, ক্যান্টিনে ঢুকতেই বারান্দার বাঁদিকে Techno Stores, যেখানে ইঞ্জিনীয়ারিংএর প্রয়োজনীয় স্টেশনারিজ, Dr Bhattacharya র Log table বা College Sessonal লেখার প্রয়োজনীয় খাতাপত্তর, কিছু ইঞ্জিনীয়ারিং বই ইত্যাদি, ছোট্ট Techno Stores এর ছোট চেহারার মালিকের হারুদার সুদর্শন চেহারা আর সহাস্য ব্যাবহার - এ সমস্ত ছিল আমাদের কলেজ জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই সত্যেনদার Canteenই আমাদের শিখিয়েছিল যাদবপুরে সবাই আমরা একই পরিবারভুক্ত, আমরা যদুবংশী, আমরা একাত্ম।

আজ এতযুগ পরে সিদ্ধার্থের স্বর্ণ যুগের কথায় এখন মনে হচ্ছে, আমাদের যাদবপুরে ছিল আশ্রমিক আবহাওয়া, তাই প্রথাগত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান VC নয়, আশ্রমিক প্রধানের সমার্থক আমাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রধান ছিলেন আপামর প্রিয় ডাঃ. ত্রিগুণা সেন।
স্বর্ণযুগের আবহাওয়া শুধু আমাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াতেই নয়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও এই আবহেই, আমাদের কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণ।
প্রসঙ্গত আমাদের প্রিয় এক সহপাঠী বন্ধু কল্যান (ভৌমিক) এর কথা মনে পড়ে। কল্যান চলনে বলনে আর সত্যিকার অর্থেই অভিজাত, মাঝে মাঝে গাড়ি চালিয়ে কলেজে আসতো কিন্তু ব্যাবহারে বন্ধু-বৎসল, অমায়িক। থাকতো অভিজাত বালীগঞ্জ প্লেসে। গল্পচ্ছলে গর্বিত মুখে আমাদের বলতো জানিস, 'আমি সুচিত্রা সেনের প্রতিবেশী!' ভাল কথা বলতে পারতো কল্যান। একদিন বল্ল, 'শোন্ আমরা পাঁচ ভাই, আমি ছোট। আমার বড়দা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মেজদা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সেজদা উত্তম কুমার আর ছোড়দা চুণী গোস্বামী।'
আশা করি জীবনের সর্বক্ষেত্রের - সাহিত্য, সংগীত, অভিনয় আর ফুটবল জগতের, এই সব সর্বকালের স্বর্ণযুগের দিকপালদের কথায়, তোমরা স্বর্ণযুগ প্রত্যক্ষ করতে পারছো।

কিশোর দীপকের মনশ্চক্ষে এখন চলমান তার কিশোর বন্ধুর দল - অলক, কল্যান, তপন, প্রভাত, চন্দন, অরূণাভ, বিশু, পল্লব, প্রিয় এবং আরও অনেকে। সবার সাথে সত্যেনদার ক্যান্টিনে বসে ঘুগনী, ডবল হাফ চা আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করা সিগারেট।
Social এর দ্বিতীয় অংশ লিখতে গিয়ে কোথায় ভেসে গেলাম। কালের অমোঘ টানে আমি ছাড়া ওই বন্ধুর দল আজ অমর-লোকে, কেবল আমিই পড়ে আছি, 'ভার মুক্ত' বন্ধুরা হেথা নেই।
অলমিতি, social নিয়ে আরও কিছু কথা অন্য কোন দিন, অন্য মনে।

Manas writes on above:

Dipak, your write-up is like a photograph. We will never forget Satyen da and his canteen always filled with flavour of our tasteful snacks. Spent much time with different types of discussions with Priya, Rabi, Giri, Himangshu and many others. Sometimes discussions end with the Theory of structures and Hydraulic jump calculations.

No matter how much suffering you went through, you never wanted to let go of those memories. The past beats inside me like a second heart. What I like about photographs is that they capture a moment that's gone forever, impossible to reproduce.

On our friend Ashish Das Sharma
Pranab Mukherjee

Ashish, among many memories of JU days I can still remember your hero-like hair appearance and your love for football. But I was very close to Nandan (Bhattacharya) of your dept. Mainly due to Bengali literary magazine of our college which he edited and where I was also a contributor for poems mainly. To reveal a secret, I was also in the team of few boys to pursue Respected Dr. Triguna Sen, not once but thrice, to approve the relationship of Nandan with his daughter Surhita for future marriage, which most of you might not be knowing.

Memoir of Jadavpur Days
Sujan Das Gupta

ডাঃ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন পণ্ডিত এবং বদ-মেজাজি। কোনটা আগে বলব জানি না। আমরা যাদবপুরে ঢোকার আগেই উনি অবসর নিয়েছিলেন। ওঁর পান্ডিত্ব বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু রাগের পরিচয় পেয়েছিলাম। এক্সটারনাল হয়ে এসে আমাকে স্ট্রাকচারে ফেলই করিয়ে দিচ্ছিলেন... আমার উত্তরে নাকি বাচালতা প্রকাশ পেয়েছিল। দশ মিনিটের মৌখিক পরীক্ষার সিংহভাগ ব্যয় হয়েছিল আমার ভর্ৎসনার খাতে। শেষ মুহূর্তে আমার মুখচোখের অবস্থা দেখে বোধহয় একটু করুণা হয়েছিল। তার ওপর ইন্টারনাল পরীক্ষক ভোলা সেন বললেন, "স্যার, ছেলেটা ভালো, একটু ভুলভাল কথা বলে।" পরে শুনেছিলাম ভোলাবাবুর অনেক অনুরোধ উপরোধের পর টায়টায় পাশ মার্কস দিতে রাজি হয়েছিলেন।

এ হেন সতীশচন্দ্রের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো কিছু বেপরোয়া ছাত্রও যাদবপুরে ছিলেন, যেমন গজানন হেমাডি। ছাত্র অবস্থাতেই খ্যাতনামা। ব্যাডমিন্টনে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, না কি দু'নম্বরে ছিলেন? তবে মনোজ গুহ-গজানন হেমাডি জুটি বিশ্ব-র‍্যাঙ্কিং-এ একবার সেকেন্ড পজিশনে উঠেছিলেন মনে আছে। ফাইনাল পরীক্ষায় সতীশবাবু গজাননকে কোকরান বয়লারের ক্রস-সেকশনাল ভিউ আঁকতে বললেন। উত্তরে গজানন চিন্তাটিন্তা করে কাগজে মধ্যিখানে একটা ছোট্ট ডট দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন... ইন অ্যান্টিসিপেশন।
"এটা কি... ক্রস-সেকশনাল ভিউ?" হুঙ্কার দিয়েছিলেন সতীশবাবু।
"না স্যার, ডিসট্যান্ট ভিউ... তিন মাইল দূরে থেকে।"
সতীশবাবু কথা বলতে পারেননি বেশ কিছুক্ষণ। টাকের লাল রঙ মিলিয়ে গেলে বলেছিলেন, " ঠিক আছে, হাঁটতে শুরু কর। আসছে বছর যদি ওটার কাছাকাছি আসতে পারো, তখন এসো, পরীক্ষা নেব।"

বেশ কয়েক বছর আগে প্রাক্তনীদের এক মিটিং-এ গজাননদার পাশে বসেছিলাম। কথায় কথায় সতীশবাবুর কথা উঠল।
"আপনি কি সত্যিই এই কথা বলেছিলেন সতীশবাবুকে?"
"আরে না, না, অনেক দুষ্কর্ম করেছি জীবনে, এটা নয়। ওটা লালু-র কেস। তারপর শুরু হল কলেজের নানান গল্প। একজন সিনিয়র পাশ থেকে বললেন, শোনো, লালুদা বা তপন পাশ করতে হয়ত সময় একটু বেশি নিয়েছে, কিন্তু একটু আধটু পড়াশুনোও করেছে – একদম শূন্য নয়। হাসান (এই নামটা ভুল হতে পারে) পাশ করেছিল শ্রেফ চোখের জোরে।"
হাসান?
"হাসানের নাম শোনোনি?"
"না।"
"লাস্ট বেঞ্চে বসে তিন-বেঞ্চ আগে একটু সাইড করে বসা ছেলের খাতা থেকে হুবহু টুকতে পারত।
সেট কী করে জানলেন?
একবার ধরা পড়ে গিয়েছিল। অঙ্কের উত্তর ঠিক, কিন্তু অনেকে উত্তর পেয়েছে হঠাৎ 11 দিয়ে গুণ করে। পরে বোঝা গেল দূর থেকে হাসান 11-র মাথার টুপিটা (^) দেখতে পায়নি। ওটা 'পাই' ছিল...আর হাসানের পাশে বসা গুণমুগ্ধ চ্যালারা হাসানের খাতা থেকে টুকেছিল।

আমি কিন্তু হাসানের গল্প আর কারো কাছে শুনিনি, হয়তো অন্য কলেজের গল্প। যেমন, নীচের এই গল্পটা একজন যাদবপুরের বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন...
গ্র্যাভিটেশন বোঝাতে মাস্টারমশাই ডাস্টার ফেলে দিয়ে বললেন..."এই দেখ, ছেইরা দিলাম, ফৈরা গেল।"
তারপর একটা চক ফেলে বললেন, "আবার দেখ, চকটা ছেইরা দিলাম, ফৈরা গেল।"
পেছন থেকে এক ছোঁড়া বলল, "গ্যাস বেলুন, ছেইরা দিলাম উইড়া গেল।"

এটা শোনা মাত্র আই আই টির এক ছেলে আপত্তি জানাল। বেশ রেগেই বলল, ওটা ওদের গল্প।
আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, "আরে বাপু, গল্প কোত্থেকে এসেছে, সেটা বড় কথা নয়। হিরে দেখে আমরা কি কোন খনি থেকে এসেছে - সেটা নিয়ে তর্কাতর্কি করি? মালটা কেমন সেটাই বিচার্য।"
সে কি মানে!

আমাদের লালুদা
দীপক সেনগুপ্ত

লালুদাকে নিয়ে অনেক গল্প আমাদের সময় থেকে যাদবপুরে মুখে মুখে ঘোরে। লালুদা মানে লালবিহারী চ্যাটার্জী। '৫৮ মেক্যানিকাল, এক বর্ণময় চরিত্র। লালুদার ইংঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র হিসেবে যাদবপুরে প্রবেশ ১৯৫০ সালে। শুনেছিলাম লালুদার যাদবপুরে ঢোকার ইতিহাসও ছিল চমকপ্রদ। খ্যাতিসম্পন্ন Bengal Ronji player ক্রিকেটার বেণু দাশগুপ্ত ১৯৫০ সালে যাদবপুরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আর রেক্টর ডাঃ ত্রিগুণা সেনের প্রিয়পাত্র। শিক্ষাজগতের মত খেলাধুলোর ব্যাপারেও ডাঃ সেন সমান উদ্যোগী ছিলেন। যাদবপুরের ক্রিকেট টিমকে আরও শক্তিশালী করার জন্য একজন নতুন প্লেয়ার-সন্ধানের দায়িত্ব ডাঃ সেন তাঁর প্রিয় ছাত্র বেণু (দাশগুপ্ত) কে দিলেন। বেণু খবর আনল, একজন 3 in 1 অর্থাৎ ক্রিকেট, ফুটবল ও হকিতে সমান দক্ষ প্লেয়ার আছে, St. Xaviers এ B.S.C র Chemistry Honours পাঠরত। ইঞ্জিনিয়ারিং এ সুযোগ পেলে, সে যাদবপুরে ভর্ত্তি হতে রাজী। নাম লালবিহারী চ্যাটার্জী।
ভর্তির আগে ইন্টারভিউতে ডাঃ সেনকে লালবিহারী বলেছিলেন, ইচ্ছা-পাশের সুযোগ পেলে সে ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হ'তে রাজী। ইচ্ছা-পাশ! সে আবার কি? আঁৎকে উঠেছিলেন ডাঃ সেন। ইচ্ছা-পাশ হ'চ্ছে নিয়মের চারবছর কমপ্লিট করার পর, যে বছরে তাঁর ইচ্ছে হবে, সে বছরেই তাঁকে পাশ করাতে হবে। লালুদা তাঁর ইচ্ছা-পূরণের সর্ত্তেই মেকানিকালের player-quota তে মেকানিকালেই ভর্ত্তি হয়েছিলেন যাদবপুরে। তাঁর পাশ করার ইচ্ছে বোধহয় হয়েছিল নিয়মমত চার বছরের আরও চার চার বছর পরে। তাই লালুদা ১৯৫০ এ ঢুকে সম্ভবত ১৯৫৪ বদলে ১৯৫৮ এর pass-out. এহেন লালবিহারী তাই ছিলেন সব ছাত্রেরই প্রিয় লালুদা। ছাত্র হিসাবেও লালুদার ভুমিকা ছিল 3 in 1 --- একাধারে ছাত্রদরদী, ছাত্র-অভিভাবক এবং খেলোয়াড়। খেলোয়াড় লালুদার অনেক গল্প তো আছে, আমি লালুদার অন্য ভূমিকাদুটির থেকে একটি করে কাহিনী শোনাই। বলা বাহুল্য, এ দুটোই কিন্তু আমার শোনা কাহিনী, শুনেছিলাম বন্ধু শিবুর থেকে।

প্রথমে --- অভিভাবক লালুদা।
১৯৫৬/৫৭ এর ঘটনা। দেবব্রত দত্ত, অর্থাৎ দেবুকে দেখা গেল সত্যেনদার ক্যান্টিনে বসে অঝোর নয়নে কেঁদে চলেছে। ক্যান্টিনে দেবুকে ঐভাবে কাঁদতে দেখে লালুদার প্রশ্ন, "মেয়েদের মত ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদছিস কেন? কি নাম তোর?" নাম ধাম তো জানা হল, এবার কান্নার কারণ? না --
সারা বছরের Work shop sessional এর একটা মাদার-রিপোর্ট এর মলাট পাল্টে নতুন মলাটে নিজের নাম লিখে সাবমিট করা হয়েছিল Workshop এর বিখ্যাত স্যার গিরীণদাকে। রিপোর্টের ভেতরের পাতায় আসল ছাত্রের নাম সই দেখে দেবব্রতর চুরি ধরে ফেলেছিলেন গিরীণদা, এবং "চুরিটাও ঠিক করে করতে পারলি না!" বলে প্রচন্ড ধমকের পর একটা পুরো বছরের শাস্তি ঝুলিয়ে দিলেন দেবব্রতর নাকের ডগায়। এই পর্য্যন্ত শুনলেন লালুদা। আর ঠিক এখান থেকেই অভিভাবক লালুদার কাজ শুরু হ'ল।
লালুদা বল্লেন, "তোর দাদা তো গতকাল বম্বেতে ট্রেন-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।" হতচকিত দেবু, অবাক হ'য়ে বলে, "কিন্তু লালুদা, আমার তো কোন দাদা নেই!" লালুদার ধমক, "নিশ্চয়ই ছিলেন। এ ব্যাপারে আর কোনও কথা বলবি না। এখন চল্ আমার সঙ্গে গিরীণদার কাছে। তোর মুখে কিন্তু কোন কথা থাকবে না! যা বলার, আমি বলব। তুই শুধু কাঁদবি, কেঁদেই যাবি। সেটুকু পারবি তো? এখন আমার পেছনে পেছনে আয় গিরীণদার কাছে। কাঁদতে কাঁদতেই আমার পেছনে দাঁড়াবি।"
এবার কিন্তু লালুদার সাথে দেবব্রত-দর্শনে গিরীণদা ভীষণ খেপে গেলেন। বল্লেন, "লালু, এ তোমার ভীষণ অন্যায়। আমি কোনও কথা আর শুনতে চাই না। তুমি দেবব্রতর হয়ে কেন সুপারিশ করতে এসেছ?"
লালুদা বলেন, "আসতাম না স্যার, যদি না দেবু সুব্রতর ভাই হ'ত?"
গিরীণদা বলেন, "সুব্রত! মানে কে সুব্রত?"

লালুদার উত্তর, "ওই যে স্যার, '৫৩ র মেকানীকাল টপার। দেবব্রতর একমাত্র দাদা। বম্বেতে বিরাট কাজ করছিল। বেচারা গতকাল train accident এ মারা গেল, স্যার।"
দেবু তখন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে।
"এখন তো স্যার, দেবব্রতর ওপরেই তার বিধবা মায়ের দায়িত্ব। তাই বলছিলাম, একটা বছর নষ্ট হলে ওদের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।"
: গিরীন বাবু, "সে কি! কৈ, দেবব্রত তখন তো সে কথা বল্লো না আমায়!"
: লালুদা, "স্যার, ও বলবে কখন? ও তো স্যার বলার মত অবস্থাতেই ছিল না", একটু থেমে আবার লালুদা, "আমি বলি কি স্যার, শাস্তিটা আপনি ঠিকই দিয়েছিলেন, কিন্তু ওর অবস্থাটা একটু বিবেচনা করে, দেবুকে না হয় আরেকটা সুযোগ দিলেন, আপনার স্যার দয়ার শরীর, বলছি চারটে দিন সময় দিন না দেবুকে, এর মধ্যে ও সেশনাল কমপ্লিট করে রিপোর্টখানা জমা দিক! না যদি পারে, তবে না হয় আপনার কথাই থাকবে স্যার, এক বছরের জন্যই বসিয়ে রাখবেন!" কৈতবাবাদে দেবতাও গলেন। গিরীণদাও গল্লেন।এদিকে দেবু হাপুস নয়নে কেঁদেই যাচ্ছে।

: গিরীণদা, "ঠিক আছে, যাও, চার দিন সময় দিলাম।"

বেরিয়ে এসে দেবু বলে, "লালুদা, আমার দাদা নেই, তুমি আমার দাদাকে তৈরী করে, তারপর মেরেও দিলে! আমার বাবা জীবিত, অথচ আমার মাকেও বিধবা বানালে, কিন্তু এখন বল, এত বড় রিপোর্ট আমি চার দিনে শেষ করব কি করর?"
দেবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে লালুদা বল্লেন, "কাজ আদায় করার জন্য অনেক কথাই বলতে হয়, ও সব কিছু মনে রাখিস না, আর, চার দিনে রিপোর্ট জমা দেবার সমস্যার কথা ব'লছিস? সমস্যা তো বটেই, তবে সে সমস্যার সমাধানও আছে, চল্, আগে সত্যেনদার ক্যানটিনে যাই"।

এরপর সত্যেনদার ক্যান্টিনে বসে পুরো রিপোর্টটা লালুদা চার ভাগ করে একেক ভাগ চারজনকে দিলেন কপি করার জন্য।
তিন দিনে রিপোর্ট শেষ হল। লালুদা বল্ল, " দে, রিপোর্টখানা আমায় দে, তোর রিপোর্ট আমি জমা দিয়ে আসি, তা না হলে চার রকমের হাতের লেখার জন্য তুই আবার ধরা পড়ে যাবি!"

গিরীণদা খুস্, দেবব্রতরও বছরটা নষ্ট হ'ল না।

এবার অভিবাবক লালুদা।

শুনেছিলাম সেটা ছিল ১৯৫৬ সালের ঘটনা। একদিন CAS চত্বরে নীচের করিডোরের রেলিংএর সামনে দাঁড়িয়ে একটি ছাত্র সিগারেট খাচ্ছিল। লালুদা কি কারণে যেন সে সময় CAS Building এর করিডোর দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। ঐ সিগারেট খাওয়া ছেলেটি সামনা সামনি পড়ল। লালুদা জ্বলন্ত-সিগারেট হাতে ছেলেটিকে বল্লেন, "কলেজের বিল্ডিংএ দাঁড়িয়ে এভাবে সবার সামনে সিগারেট খাওয়া মোটেও শোভন নয় হে। তুমি বোধহয় নতুন ভর্তি হয়েছ, তাই আমাকে চেন না। আমি মেকানিকালের ছাত্র, সবাই আমাকে লালুদা নামে ডাকে।"
ছেলেটি কিছুক্ষণ অবাক চোখে লালুদার দিকে চেয়ে থেকে বল্ল, "হ্যাঁ, তা --- ঠিক আছে", বলে হাতে ধরা আধ খাওয়া সিগারেটটা ফেলেই দিল।

পরের দিন কোন কারণে রেক্টর ডাঃ সেন তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠেলেন লালবিহারীকে। লালুদা দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকে দেখেন গতকালের সিগারেট খাওয়া ছেলেটি ডাঃ সেনের পাশের চেয়ারে বসে। লালুদা বুঝতে পারলেন গতকাল কোথাও একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছেন। ডাঃ সেন কাজের কথা কি সব বল্লেন, কিছুই মাথায় ঢুকলো না। লালুদার তখন ধরণী দ্বিধা হও গ্রস্থ অবস্থা। কাজের কথা সেরে নেবার পর ডাঃ সেন বল্লেন, "লালু, এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি CAS এ নতুন জয়েন করেছেন, আমাদের youngest Faculty Amartya Sen !!"
নতুন স্যারের চোখে তখন স্মিত হাসি, আর লালুদা? ঘটনাস্থল থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন।

স্মৃতির সরণী বেয়ে
শিবানী দাস

২০ শে জানুয়ারী ২০১৩ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রছাত্রীর ১৯৬৩/৬৪ সালে পাশ করার ৫০ বছর। উদযাপিত হ'য়েছিল। ভাবতেই অবাক লাগছিল, পাশ করবার পর ৫০ বছর কেটে গেল। সময় থেমে থাকে না, আমাদের জীবনের গতিও থেমে নেই, তারপর আরও সাত বছর কেটে গেছে, যখন চিন্তা করার জন্য একটু থামতে হয়, তখন কিন্তু অবাক বিস্ময়।

আমাকে বলা হলো ক্লাসে কোনো মজার ঘটনা যা ঘটেছে, সে সম্পর্কে লিখতে। রোজ কত কী ঘটেছে, মনের ভেতরের স্মৃতির ওপর ৫০ বছরের প্রলেপ পড়ছে। একটা ঘটনা লেখা যায় সহপাঠিনী সঞ্চিতাকে নিয়ে। আশা করি সঞ্চিতা কিছু মনে করবে না।
আমরা ফাইনাল ইয়ারে পড়ি। Blood donation এর ক্যাম্প ব'সেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সঞ্চিতা গেল রক্ত দান করতে। সেদিন বাড়ী গিয়ে ও খুব বকুনি খেয়েছিল । কারণটা জানি না।

Class হচ্ছে আমরা ক্লাস করছি, Prof. Banerjee ক্লাশ নিচ্ছেন, মন দিয়ে শুনছি, হঠাৎ দেখি সঞ্চিতার মাথা আমার বাঁ কাঁধের ওপর - bench-এর ধারে ও বসেছে, গাশে আমি আর রুবি। পিছন থেকে জ্যোতি চেঁচিয়ে উঠলো -- স্যার, সঞ্চিতা অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। Prof. Banerjee অতি ভাল মানুষ, নার্ভাস হ'য়ে Prof. Kundu কে ডেকে নিয়ে এলেন। সঞ্চিতাকে bench-এ শুইয়ে দেওয়া হলো। Prof, Kundu জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন, তারপর যথারীতি প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ওকে বাড়ী পাঠানো হলো, এবং আমাদেরও আর class হলো না।
এরপর আবার একদিন ক্লাস হচ্ছে - হঠাৎ Prof. Kundu-র ক্লাসে সঞ্চিতা অজ্ঞান হয়ে গেল, ওর মাথাটা আমার ডান কাঁধের ওপর। যথারীতি Prof. Kundu first aid এর ব্যাবস্থা করলেন, সঞ্চিতা একটু সুস্থ হলে বাড়ীতে গেল।

এরপর বেচারাকে অনেক জ্ঞান, উপদেশ শুনতে হত, ও অবশ্য কেবল শুনেই যেত, কোনো উত্তর দিত না। আর আমরা অবধারিতভাবে ওকেই support করতাম।
এবার পরীক্ষা প্রায় সমাগত, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত class-এর বিরাম নেই। আমরাও হাঁপিয়ে উঠেছি। একদিন tiffin-break-এর পরে class হ'চ্ছে topic টা খুব uninteresting হ'লেও class ছেড়ে বেরিয়েও যাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ পেছন থেকে একটা চিরকুট সঞ্চিতার কাছে ---
"সঞ্চিতা তুমিই ভরসা।"

চিরকুটের কল্যানে ক্লাশে তখন হাস্যরোল।

Memoir

যে পথে নিলে বিদায়

আমার কৈফিয়ৎ

Engineering to right of them,
Engineering to left of them,
Engineering in front of them
Into to the realm of engineering
400 plus brief souls, not fearing.

১৯৫৯ এর কোন শুভ প্রভাতে আমাদের যাত্রা শুরো হ'লো। প্রতিষ্ঠান আমাদের সোভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধল, আমরা একাত্ম হলাম।

Friends in front of us,
Philosophers behind us
Guides surrounding us
Into the valley of engineering
Rode the 400 plus souls without fearing.

আজ জীবনের প্রান্তবেলায়, রোল কলে দেখছি অনেকের নাম চিরতরে কাটা পড়েছে, শুরুর আর এখনকার সংখ্যার এ এক ব্যাথাতুর দুস্তর ব্যাবধান। জানি, এ কালের নিয়ম -- নিরবধি কাল এ ভাবেই এগিয়ে চলেছে।
হারিয়ে যাওয়া প্রিয় নামগুলো আমরা এই সংকলনের শুরুতেই স্মরণ করেছি, কিছু নাম হয়ত স্মৃতির দৌর্ব্বল্যে হারিয়েও গিয়েছে। আজ বুক ভাঙা বেদনায় সে নামগুলো স্মরণ করি। কয়েক জনের স্মৃতি শুধু বেদনাই নয়, চোখের কোনদুটিও শিরশির ক'রে দেয় - তপন, বিশু, রঞ্জন (দাশগুপ্ত)। প্রভাত, অরুণাভ, সব্যসাচী, পল্লব - ভারাক্রান্ত মন।
এই সংকলনে হারিয়ে ফেলা বন্ধুদের মধ্যে থেকে, মাত্র তিন বন্ধুর জন্যই শুধু কিছু বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে -- কেন?? না, কোন পক্ষপাতিত্বের কারণে নয়, এই স্মৃতি-সংকলনখানির রূপায়ন কালে, এই তিনজনের স্মৃতিচিত্রনরূপে কিছু না কিছু লিখিত চিত্র হস্তগত হয়েছিল, কেবলমাত্র সেই কারণেই।

দীপক

On Nandan

1. *Jyotirmoy Banerjee (Telecommunication)*

Today since morning one name is again and again coming back in mind. Nandan. It is exactly a year back he had left us. Such a multi facet character who could fit in any company talk on so many subjects. It is really very sad that I could get his association for such a short time. Now I regret that immediately after leaving Jadavpur I hardly had practically no contact with Kolkata for 47 long years. And now internet evening of life one thinks that in our long innings Jadavpur was just a short span of life but how it occupies most space of our heart. Why it could not be of a longer duration.

2. *Ashis Das Sharma*

Wonderful reminiscence Jyoti. Yes, a year passed. Around the same time, myself and my wife were frequent er in hospital. I couldn't even go to bid him the last farewell. Still remember his craze for সিঙ্গারা when we all met in Calcutta club. Nandan my dear friend, stay in peace wherever you are.

3. *Prasun Kumar Dey*

Thank you, Jyoti
For reminding about Nandan.
I last met him about 4-5 yrs back at Calcutta club meet of telecom batch
Where I was called to join. We had Nandan, Santi, Pratyush, Sahedul, Asish, yourself, Sibani, Kasturi & few others. Of course, during late 90s I had several official meetings with Nandan when CMC & Webel was signing a MOU for west Bengal govt e governance projects. Remember Nandan taking a leading role during engg students agitation over semester exam & seating in front of JU 8b gate. He had joined Philips Light in DVN for some time was a chain smoker .he used to stay near Gariahat Fern road. Stay in peace dear friend.

4. Apurba Mukherjee

Dear Prasun, you remind me Nandan,I attended his daughter's wedding in Kolkata where Dr Triguna Sen was the host, he was talking to each guest to make sure that he or she took dinner. I used to meet him every time I visited Kolkata. Last year I was present at his "Life Celebration" in Salt Lake. We all Miss him.

On Prasanta Chakraborty

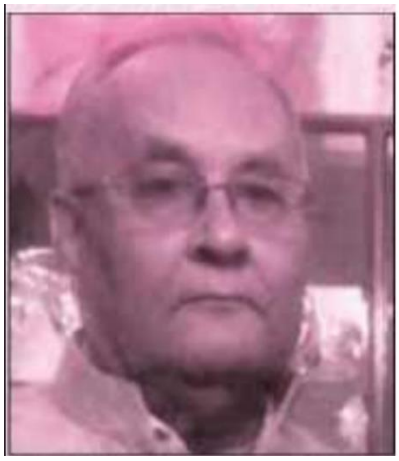

Dipak Sengupta

বন্ধুরা,
গতকাল প্রশান্ত '৬৩, মেকানীকাল. এ পারের মায়া কাটালো, আমি group এ জানিয়েছিলাম। বিগত-বন্ধুরা বিস্মৃতিতে গেলে মনটা ভারাক্রান্ত থাকে।
প্রশান্ত সম্পর্কে দুয়েকটা কথা তোমাদের জানাতে চাই। সময় সুযোগ মতো চোখ বোলালে খারাপ লাগবে না।
প্রশান্তর পিতৃদেব ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী আর আমাদের Friend, Philosopher, Guide শ্রদ্ধেয় ত্রিগুণা সেনের ঘুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক সঙ্গে কারান্তরালেও ছিলেন। জেলের অত্যাচার তাঁর শরীর ভেঙে দিয়েছিল। ছাড়া পাবার পর মাসেক তিনেক মাত্র জীবিত ছিলেন। তিন ছেলে নিয়ে প্রশান্তর মা যাদবপুরে তাঁর আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠলেন, প্রশান্ত বঙ্গবাসীতে পাঠরত। খুবই দুঃস্থ অবস্থা। Tution করে মা আর তিন ভাইএর দায়িত্ব প্রশান্ত নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। ISc result এর ভিত্তিতে যাদবপুরে সুযোগ এল প্রশান্তর। ভর্ত্তি হবার প্রাথমিক অর্থও হাতে নেই, বাবার পরিচয় দিয়ে প্রশান্তর হাতে যাদবপুরের রেক্টরের কাছে একটা চিঠি লিখলেন ওর যাদবপুরের আত্মীয়। পায়ে পায়ে ডাঃ সেনের বাড়ীতে পৌঁছাল প্রশান্ত, কারোর হাত দিয়ে চিঠি ভেতরে পাঠানো হল। এর পর ঋষি ত্রিগুণা সেন বাড়ীর ভেতর থেকে অনতিবিলম্বে বেরিয়ে এলেন, প্রশান্তকে বুকে জড়ালেন আর তারপর প্রশান্তর ভর্ত্তি হওয়া, সম্পুর্ণ freeship এ যাদবপুরে পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। যাদবপুরে পড়াকালীনও নিজেদের খরচ Tution করেই চালিয়েছিল প্রশান্ত।

প্রশান্তর মৃত্যুর প্রেক্ষিতটা খুবই বেদনাদায়ক। প্রশান্তর স্ত্রী জয়তী বছর তিনেক আগে ক্যান্সারে বিগত হয়েছেন। Salt Lake এর লাবনীতে প্রশান্ত ভাল বাড়ী করেছিল। ওদের দুই কন্যা, সুশিক্ষিতা সুপ্রতিষ্ঠিতা,

কর্মোপলক্ষে একজন মুম্বাই এবং আরেকজন সম্ভবত পুনের বাসিন্দা। স্ত্রী গত হবার পর, প্রশান্ত ধীরে ধীরে বোধ এবং বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে পড়েছিল। কন্যাদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে ২৪ ঘণ্টার nurse আর CC TV র আওতায় কন্যাদ্বয়ের remote পর্যোবেক্ষণে লাবনীর বাসভবনে একা একা থাকতো প্রশান্ত। কাউকে চিনতে পারতো না, শুন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো, চোখের জলে ভাসতো।
গতকাল প্রশান্ত যখন শেষ নিশ্বাস ফেলেছে, সে সময়ে শয্যা পাশে শুধু nurse এর উপস্থিতিই ছিল।
আজ মেয়েরা এসেছে, আজ দাহকর্ম সম্পন্ন হবে।
প্রশান্ত এখন জীবনধারণের যন্ত্রণা-মুক্ত।
অনন্তযাত্রায় শান্তিতে যাও বন্ধু।

ঘটনা কিছু জানা, কিছু বন্ধু কানাইদাস চৌধুরীর কাছ থেকে সংগৃহীত।

On Alok Chakraborty

[Kalyan Das]

I am writing with heavy heart that our dearest friend Aloke Chakraborty - Deshapriyo Park, left for heavenly abode to day morning due to heart attack in hospital.
The information received from my friend Chitta Konar (1962ChE). I am speechless to express my grief.
My mind is totally upset with loss of Aloke
May his departed soul rest in eternal peace

[Pranab Mukherjee]

Cannot believe Kalyan. I was thinking of calling him over phone someday. I am speechless. Let Aloke's Soul Rest in Peace.

Lots of memories with Aloo (Aloke) since JU days.
Along with Dipak and Kalyan, it was Aloke's initiative and sincerity which brought JU '63 ENG batchmates together through picnics, reunion and get-together. Much grateful to you friend. Miss you. RIP

মানুষ দোষে-গুনে হয়। তবে ওর মধ্যে যে ঊচ্ছলতা ছিল খুব কম মানুষের মধ্যেই তা পাওয়া যায়।

[Biswajit Das]

Omg. I was today recollecting and telling Penny our tour to Darjeeing with Rs.100/- in pocket immediately after final Exam. Too sad.

Alok was my very close friend from beginning in hostel days. Besides our adventurous and memorable tour to Darjeeling in 1963 and way back in his home at Burdwan, we used to meet later in his home in Kolkata and during his Delhi visits and churned out our memories over a glass of drink. I can't believe still that he left us. Pray for his soul rest in peace.

[Ashish Das Sharma]

Oh God... Only a few days back talked with him on mobile. He expressed he was fine. This is hard to believe. He was a frequent visitor to my house during my ailing days. A great friend. God keep him well in your warm lap. Live in peace my dear friend.

[Subrata Deb]

Omg! Can'nt believe. Yes, Aloke used to take active part for arranging picnic. He was one of our close housemates. Shall miss him badly
May his soul rest in peace.

[Manas Bandyapadhay]

Can't imagine. A few days back I talked to him over phone. Today he is no more. I knew that he was not well. It is a great loss to our group. Swapna and me convey our deep condolences to his bereaved family. May his soul rest in eternal peace.

[Prasun Dey]

OH MY GOD! CANNOT BELIEVE
THIS SAD NEWS!
JUST NOW TRIED CONTACTING CHITTA KONAR (62 CH) AT BURDWAN.
PHONE SWITCHED OFF.
I LAST MET ALOKE 5-6 YRS BACK AT OUR BATCH PÌCNIC AT KOLKATA.
SUCH A NICE SOFT-SPOKEN FRIEND, HE TOLD ME HE HAS SOME WORK ACTIVITY AT GURGAON & VISITS DELHI OFTEN.HE TOLD ME HE WILL VISIT US HERE
I WAS LOOKING FOR HIM AT THE LÀST JAN SALT LAKE GET TOGETHER & CAME TO KNOW HE IS NOT KEEPING WELL.
WE LOST ONE MORE OF OÙR BATCH MATE.
MAY HIS SOUL REST IN ETERNAL PEACE.

[Sanjib Basu]

Alok must have inkling, he called many friends in last 7 days or so. He was a bonding force for many many people beyond JU friends. When he would write down name and contact no in his tiny diary. A great admirer of Dr Sen he would not miss an opportunity to speak about him.

The stars of Chemical engineering started leaving us starting with Chandan. Can't believe.

His daughter is arriving tomorrow and his elder brother's son with his wife is there now. COVID do not allow me to visit his home. Suggest for 24 hrs at least we do not write jokes at WhatsApp. as a tribute to one of our dear friends! RIP ALOK. We do remember you!

[Shibshankar Ghosh]

অলোকের চলে যাওয়াটা আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক। যাদবপুরে পড়ার সময় কিন্তু আমরা খুব একটা ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। পরবর্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার আন্তরিকতা আমায় মুগ্ধ করেছিল এবং আমি ওর ভক্ত হয়ে যাই।একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিল কেমন করে সে ডঃ ত্রিগুণা সেনকে কন্‌খল থেকে হরিদ্বারের নিয়ে এসে বিপ্লবী বীনা দাশের মৃতদেহ সনাক্ত করণে সাহায্য করেছিল।অলোক তুমি যেখানই থাক ভাল থেকো।

[Tapan Gupta]

যাদপুরের যে কোন বন্ধুর (বিশেষত: JU 62,63,64) মৃত্যু-সংবাদ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও মর্ম্মান্তিক. তাই অলোকের মৃত্যু সংবাদে আমিও ব্যাথিত ও মন ভারাক্রন্ত।
ওঁর আত্মা চিরশান্তিতে বিরাজ করুক -- প্রার্থনা করি।

[Debdas Ghoshal]

Meera and I are very sad to know about the demise of Aloke. He and PK (Ghashu) visited our Washington house about 4 years ago and we resurrected our days in JU main Hostel. It is a tough loss. I was looking forward to meeting him on my next visit to India. Presently Pronab (Ghashu) is living in a group care house. His faculties are on decline. I called him yesterday and had some happy chat. Time is having its toll.
Wishing you all the very best of your life on 4th of July, America's Independence Day.

[Siddharta Datta]

অলোকদা আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন । খুব স্নেহ করতেন । গতকাল রাতে থক্কারদার কাছ থেকে খবরটা পেলাম । মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে ।
অলোকদা কে শ্রদ্ধা জানাই ।

[Amit Basu]

Aloke's demise is a severe shock to me and my family. Let his departed soul rest in peace.

[Utpal Sengupta]

I just learned about Alok's demise belatedly. I am shocked at the news like all of you. Alok was so dear to us, so loved by all - he will never be forgotten. I talked with him in January, in Kolkata and can still see that smile, that kindness and love in his face - will never forget him.
যেখানেই থাকো, ভালো থেকো বন্ধু!

[Sujit Sen]

I received the shocking news now. I am speechless. May his soul rest in peace.

[Shankar Chabraborty]

হঠাৎ অলোক চলে গেল? আমার কাছে আমাদের পিকনিকের মধ্যমণি ছিল অলোক। full of energy! again a sad news। অলোকের কি হয়েছিল? শঙ্কর চক্রবর্তী

[Dipak Sengupta]

২ জুলাই, সকালের দিকে ১০ টা/ ১১টা নাগাদ অলক সারা শরীরে অস্বস্তি নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছট্ ফট্ করছিল। ছেলে সুমিত কাছেই ছিল, কিছুটা সময়, ১৫/২০ মিনিট ঐ ভাবে কাটার পর অলকই বলে আমায় হাসপাতালে নিয়ে চল্, সাথে সাথেই সুমিত গাড়ি বার করে সোজা AAMRI তে নিয়ে যায়। পথে অলক খুব ঘামছিল আর শরীর ঠান্ডা হচ্ছিল। হাসপাতালেও ডাক্তার immediately investigation শুরু করেছিলেন, যে ডাক্তার কয়েক মাস আগে অলকের pace maker লাগিয়েছিলেন, তাঁকেও খবর দেওয়া হল। তিনি এলেন, ইতিমধ্যে angiogram করে দেখা গেল, severe blockage. Angioplast করার সিদ্ধান্ত হল, বোধ হয় সেটা আর হয় নি। দেখা গেল kidneys were not functioning properly. I.C.U তে রেখে necessary treatment শুরু করা হল। ঠিক হয়েছিল, একটু steady হলে angioplast করা হবে, pace makerও বোধহয় আবার reset করা হবে। কিন্তু অলক সে সুযোগ আর দিল না। ৩ তারিখে রাতের দিকে massive heart attack (mio cardial infuction) হল, ৪ তারিখ ভোরের দিকে ওকে ventilator এ দেওয়া হল, আর তারপর সকাল ১০.৪৫ এ ventilator থেকে অলক বেরোল, কারোর ডাকেই আর সাড়া দিল না। ছেলে সুমিত কাছেই উপস্থিত ছিল।

Demise of our dear Alok

Dipak Sengupta

হে বন্ধু আমার, যে পথে নিলে বিদায়
আমায় ব্যাথায় ব্যাথায় কেন যে মিছে সে পথ চাওয়ায়।
এখনও ফুলের চেনা সুবাসে, কত যে কথা স্মরণে আসে,
তোমারি মুখের ও হাসি যেন হাতছানিতে ডাকে আমায়,
তুমি যে পথে নিলে বিদায়

নয়নে আমার নামে যে এখন ব্যাথার সজল ছায়া,
কি করে ভুলি তোমার ও দুটি চোখের প্রীতির মায়া
আর তো কখনও পাব না দেখা,
হৃদয়ে এখন ঝরে যে অশ্রু, মনে সে কথা ভাবায়,
তুমি আজ যে পথে নিলে বিদায় .....

বিদায় - ৪ জুলাই, সকাল - ১০.৪৫, ২০২০
পারলৌকিক কর্ম - ১৪/০৭/২০২০
যাদবপুর বন্ধুবর্গ

Genesis of Blood Donation

রক্তদান প্রসঙ্গ
Dipak Sengupta

আজ বন্ধু শিবু (শিবশঙ্কর ঘোষ)র লেখা থেকে একটু ছোট করে 'রক্তদানের পথিকৃৎ'কে রাখলাম। শিবুর এই লেখাটি ডাঃ ত্রিগুণা আর আমাদের সময়কার যাদবপুরের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ আর আমাদের প্রিয় দেবুদার ('৬৩ মেক্যানীকাল) নেতৃত্বে ইঞ্জীনিয়ারিং ফ্যাকালটির ছাত্রবৃন্দের এক গর্ব্বিত অধ্যায়।
দীপক

রক্তদানের পথিকৃৎ - প্রথম পর্ব
শিবশঙ্কর ঘোষ

সেন্ট জেভিয়ার্সের প্রাক্তন শিক্ষক প্রয়াত ফাদার বেকারের রক্তদানের রেকর্ড ভেঙেছিলেন দেবব্রত রায়, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় দেবুদা। তিনি রক্ত দিয়েছেন ১২৭ বার। দেবুদা বল্লেন- ১৯৬২ সালে রক্ত দেওয়া শুরু করে বছরে চার বার করে রক্ত দিয়েছেন। মাঝে জন্ডিস হওয়ায় কয়েকবার দিতে পারেন নি। রক্তদান আন্দোলনের আর এক সংগঠক আমাদের প্রয়াত বন্ধু এবং সহপাঠী অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়, অরুণাভ রক্ত দিয়েছেন ১০৭ বার।
প্রথমবার রক্ত দিতে দেবুদা ১৯৬২ সালটা কেন বেছে নিয়েছিলেন? সেটার সন্ধান পেতে সাংবাদিক পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা পড়তে হবে আনন্দবাজার পত্রিকার(২২/১১/২০১২ তারিখ)। তিনি লিখেছেন খুব সমস্যায় পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। রক্তের আকাল। তার সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে সমানে প্রচার চালাচ্ছে।কয়েকটা কালো রঙের জবরদস্ত ভ্যান আর বেশ কিছু কর্মী বরাদ্দ হয়েছে ঘুরে ঘুরে রক্ত সংগ্রহের জন্য। কিন্তু কিছুতেই স্বেচ্ছা-রক্তদান সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ ভাঙা যাচ্ছে না। কেউ রক্তদানে রাজি নন কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় প্রচারে গেলেই লোকে 'রক্তচোষা' এসেছে বলে পালাচ্ছে। ১৯৬২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রেক্টর ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ ত্রিগুণা সেন এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। দু-জনের মধ্যে সু-সম্পর্ক ছিল। আবার ডাঃ সেনের সঙ্গে ওই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংগঠনের অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ডাঃ সেনের আগ্রহে ও দেবব্রত রায়, অরুশাভ চটোপাধ্যায়, নন্দন ভট্টাচার্য, মনন দেব প্রভৃতি কিছু ছাত্র নেতাদের উদ্যোগে ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে তাদানীন্তন ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সংগঠিত হল একটি বড়সড় স্বেচ্ছা-রক্তদান শিবির। ৪ থেকে ১৬ আগষ্ট পর্যন্ত টানা ১৩ দিনে ৩০১ জন রক্ত দিলেন। ওই শিবির কে সাফল্যমন্ডিত করবার জন্য, কয়েক দিন আগে ২৭ জুলাই একটি ঐতিহাসিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় দেবব্রত বিশ্বাস বিনা পারিশ্রমিকে মনপ্রাণ দিয়ে গান গেয়ে সবাইকে উৎসাহিত করেন। ওই সভাতেই ডাঃ সেন সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রতিদিন দু-জন শিক্ষক রক্ত দিয়ে শিবিরের সূচনা করবেন এবং ছাত্ররা এরপর অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসবে। প্রথম দিনের সর্বপ্রথম রক্ত দাতার নামও তিনি ঘোষণা করে দিলেন। নামটি ছিল ডাঃ ত্রিগুণা সেন, রেক্টর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। দুর্ভাগ্যবশত রক্তদানের ঠিক আগে, মেডিক্যাল চেকআপের সময়, লো প্রেসারের কারণে ডাঃ সেনকে বাতিল ঘোষণা করা হ'লো। তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর জায়গায় অধ্যাপক গোপাল সেন এগিয়ে এসে, হাসিমুখে রক্ত দিয়ে শিবিরের সূচনা করলেন। ডাঃ সেনের হতাশা ভাবটা কেটে গেল। গোপালবাবু ছাড়াও বিভিন্ন দিনে যে সব শিক্ষক স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়ে শিবিরের সূচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন বিনোদলাল দাস, অরুন কুমার গুপ্ত, গিরিজাভূষণ পাল, দানীন্দ্র নাথ রায় বর্ধন, বি বি চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র কুমার দাস তালুকদার, জয়ন্তানুজ গন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর রায়চৌধুরী, এবং আরও অনেকে।

দেবব্রত, অরুণাভ, নন্দন, মনন-রা এর পর আর থেমে থাকেননি। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম পাথেয় করে, Students Health Home' এর মাধ্যমে সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এই রক্তদান আন্দোলন।
ক্রমশ প্রয়োজন দেখা দিল একটি সংগঠনের, যেটা শুধুমাত্র স্বেচ্ছা-রক্তদান নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং সমাজের সবস্তরের মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হবে যে, 'রক্তদান' প্রতিটি সুস্থ নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।' ১৯৮০ সালের ২০ জানুয়ারি জন্ম হল Association of Voluntary Blood Donors, West Bengal বা AVBD, WB, পথ-প্রদর্শক এর ভূমিকায় দেবু দা এবং সঙ্গী অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়, লাবন্য গাঙ্গুলি, শৈবাল গুপ্ত, কল্যাণ দাশগুপ্ত, বিমল চক্রবর্তী, অরুণ সেন, গৌরী ভদ্র, বীরেশ্বর ঘোষ সুজিত দত্ত, অর্ধেন্দু দত্ত, প্রশান্ত স্যান্যাল,নন্দন ভট্টাচার্য, পঙ্কজ দাশগুপ্ত, তপন ধর, গৌতম ব্যানর্জি প্রমুখএকঝাঁক তরুণ। ২০১৭সালে আজও AVBD, WB কাজ করে চলেছে সমান উদ্যমে।

রক্তদানের পথিকৃৎ - শেষ পর্ব
শিবশিঙ্কর ঘোষ

(এটা রক্তদানের 'পথিকৃৎ' এর দ্বিতীয় বা শেষ পর্ব। এখানে জানিয়ে রাখি, রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে '৬৩-৬৪ র ইঞ্জীজিনিয়ারিং এর ছাত্র সমাজ বিশেষ অরুণাভ, নন্দন, মনন প্রমুখরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর এদের পুরোধা বা অবিসংবাদিত নেতা হ'চ্ছেন আমাদের প্রিয় দেবুদা। তাই
দেবুদাকে আরেকটু চেনানো প্রয়োজন, সংগে প্রয়োজন রক্তদান সম্পর্কিত আরও কিছু তথ্য। তাই এই প্রতিবেদন
দীপক)

১৯৬২ সালে ইডেন গার্ডেনে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে দিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেবুদা ছিলেন বিজয়ী দলের সদস্য। ১৯৬৩ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করতেই, ক্রিকেট খেলার সুবাদে দেবুদার ডাক আসতে থাকে এম এন দস্তুর, জেসপ প্রভৃতি নামকরা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার জন্য। প্রথমে এম এন দস্তুর ও পরে জেসপে বেশ কিছুদিন কাজ করার পর দেবুদার মনে হয়েছিল কর্পোরেট অফিসে চাকরি করলে তিনি ছাত্র সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। দেবুদার বাবা শশীভূষণ রায় ছিলেন ডাক্তার (এমবি) এবং মা একজন আদর্শ গৃহবধু। বাবা ও মা দুজনেই ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত এবং দীক্ষা নিয়েছিলেন যথাক্রমে সারদানন্দ জি এবং বিরজানন্দজির কাছ থেকে। দেবুদা নিজেও ব্যক্তিগতভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। তাই বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প পীঠ থেকে অধ্যাপনার সুযোগ আসতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যোগ দেন। অবসরের দিন পর্যন্ত ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তিনি শিক্ষকতা করেছেন এবং সেই সঙ্গে ছাত্রদের রক্ত দান করতে উদ্‌বুদ্ধ করে গেছেন। শিক্ষাপীঠের 'টিচার্স কাউন্সিল' এর তত্ত্বাবধানে, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মোট ৫৬ টি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে তিনি ৫২০৯ জন রক্তদাতাকে রক্তদানে উৎসাহিত করেন।

রক্তদাতা সংগ্রহ করা ছাড়াও 'স্টুডেন্ট্স হেল্থ হেমস' এর ছাত্রদের কল্যাণমূলক আরও অনেকরকম কাজ ছিল সম্পাদন করার মতন, তাছাড়াও জনসাধারণের মনে ধীরে ধীরে ধারণা হয়ে যাচ্ছিল যে, রক্ত দেওয়া শুধুমাত্র ছাত্রদেরই কাজ। ফলে প্রয়োজন দেখা দিল এমন একটি সংগঠনের, যে সংগঠন শুধুমাত্র এবং একমাত্র স্বেচ্ছা-রক্তদান নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হবে যে, 'রক্তদান' প্রতিটি সুস্থ নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। এই প্রয়োজন থেকেই ১৯৮০ সালের ২০ জানুয়ারি জন্ম হল Association of Voluntary Blood Donors, West Bengal, বা AVBDর আর এর

পথ-প্রদর্শক এর ভূমিকায় অধ্যাপক দেবব্রত রায় অর্থাৎ আমাদের প্রিয় দেবুদা এবং সঙ্গী অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়, লাবন্য গাঙ্গুলি, শৈবাল গুপ্ত, কল্যাণ দাশগুপ্ত, বিমল চক্রবর্তী, অরুণ সেন, গৌরী ভদ্র, বীরেশ্বর ঘোষ, সুজিত দত্ত, অর্ধেন্দু দত্ত, প্রশান্ত স্যান্যাল,নন্দ ভট্টাচার্য, পঙ্কজ দাশগুপ্ত, তপন ধর, গৌতম ব্যানর্জি প্রমুখ একঝাঁক তরুণ। আজও AVBD, WB কাজ করে চলেছে সমান উদ্যমে। যে কোনও দিন সন্ধ্যায় (রবিবার ছাড়া) AVBD'র অফিসে গেলে দেবুদার দেখা পাওয়া যাবেই। যদিও তিনি ওই সংস্থার কোনও পদ কোনওদিনও অলংকৃত করেননি। AVBD বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ছোটছোট শিবির করে রক্ত সংগ্রহ করতে লাগল নানারকম অভিনব প্রচারের মাধ্যমে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, সংস্থাটির নিজস্ব কোনও ব্লাড ব্যাঙ্ক নেই, কর্মীরা নিরলসভাবে পরিশ্রম করতেন শুধুমাত্র যাতে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের কোনও অভাব না থাকে তার জন্য।
১৯৮১ সালে মনে করা হল যদি পশ্চিমবাংলার ক্রীড়ামোদীদের এই রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যদি যুক্ত করা যায় তাহলে বড় বড় শিবির করা অসম্ভব নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে একটা ক্রিকেট ম্যাচে ভারতের অধিনায়ক নারি কন্ট্রাকটারের মাথায় বল লেগে প্রচুর রক্তপাত তাঁকে বাঁচাবার জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে সেই সময়ের সংবাদের একটা অংশ তুলে দিলাম --

On India's tour to West Indies in 1961-62, Indian skipper Nari Contractor faced what was probably the deadliest bouncer till that point. A quick short-pitched delivery by pacer Charlie Griffith hit Contractor on the head. He never played international cricket again.

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল স্বত:স্ফুর্ত্ত ভাবে এগিয়ে এসে তাঁর জন্য রক্তদান করেন। নারি কন্ট্রাকটার বেঁচে যান। এই ঘটনাটিকে সামনে রেখে ক্রীড়ামোদীদের প্রভাবিত করতে ১৯৮১, সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইডেন গার্ডেনে CAB র সহযোগিতায় আয়োজন করা হল রক্তদান শিবিরের, নাম দেওয়া হল ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ডে। প্রথম বছরেই নারি কন্ট্রাক্টার সস্ত্রীক এসে, দুজনেই রক্ত দিয়ে প্রয়াত ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যান।
এরপর থেকে প্রতিবছর সিএবি-র প্রতিষ্ঠা দিবসে (৩রা ফেব্রুয়ারি) ইডেনে (ক্লাব হাউসে) সারাদিন ধরে পালন করা হয় ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ডে। দূর দূরান্ত থেকে হাজারেরও বেশি রক্তদাতা সেদিন এখানে এসে রক্ত দিয়ে যান। প্রতিবছরই একজন খ্যাতনামা ক্রিকেটারের সই করা সুন্দর সার্টিফিকেট দেওয়া হয় রক্তদাতাদের। ডন ব্র্যাডম্যান, গারফিল্ড সোবার্স, সুনীল গাভাস্কার, পঙ্কজ রায়, মুস্তাক আলি, ভাগবত চন্দ্রশেখর, সৌরভ গাঙ্গুলি প্রমুখ বিশ্বের অনেক নামকরা ক্রিকেটার এই রক্তদান উৎসবের সঙ্গে যুক্ত।

এক বছর ১৬ আগস্ট ইডেনে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচে খুব আয়োজন হয় এবং ১৬ জন দর্শক মারা যান। ওই দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিবছর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এভিবিডি ও আইএফএ-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় ১৬ আগস্ট আয়োজিত হয় আরেকটি বিশাল রক্তদান শিবির। এই শিবিরের নাম দেওয়া হ'লো 'ফুটবল লাভার্স ডে'। এই শিবিরের শৈলেন মান্না, পিকে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী এবং আরও অনেক বিখ্যাত ফুটবলারদের স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। শাহু মেওয়াল, সুকুমার সমাজপতি, সুরজিৎ সেনগুপ্তের মতন বহু কৃতী ফুটবলাররা আমন্ত্রণের তোয়াক্কা না করে, একাধিকবার শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেছেন।

রাখী বন্ধনের দিন প্রতি বছর যে, 'নেহরু চিলড্রেন্সস মিউজিয়াম'এ রক্তদান শিবির হয়, সেটা আর নতুন করে বলার দরকার হয় না। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে ওই ভবনের একতলাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। যাদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। কয়েক বছর আগে ডাঃ রণবীর মুখার্জির মতো প্রবীণ ও ব্যস্ত মানুষকে দেখা গিয়েছিল ওই হলে বেশ কিছুটা সময় কাটাতে।

২০১৭ সালে দেখা গেল একটি অসাধারণ প্রয়াস। পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবছর দুর্গাপূজা হয় এবং পূজা কমিটি থাকে সেকথা সবার জানা। বেশ কিছু পূজা কমিটি প্রতিবছর জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য নানারকম কাজ করে থাকে সেটাও অজানা নয়। ২০১৭ সালে সমস্ত পাড়ায় পূজা কমিটিগুলি একত্রিত হয়ে, এভিবিডি-র সহযোগিতায় একটি বড়সড় রক্তদান শিবির করে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিকে রক্তের যোগান দিয়েছে, এই খবরটা অনেকে জানে না। শুধু তাই নয়, পূজা কমিটির উদ্যোক্তারা ঠিক করেন প্রতি বছর এই ধারা বজায় রাখা হবে।

আজ সারা ভারতবর্ষে দেবুদা এবং এভিবিডির অসংখ্য অনুরাগী এবং ভক্ত ছড়িয়ে আছেন এবং নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন নতুন রক্তদাতাদের স্বেচ্ছা-রক্তদানে উৎসাহিত করতে। দেবুদার এক অনুগামীর উদ্যমে এবং এভবিডি, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, ১৯৮৩ সালের ১ অক্টোবর, রাঁচিতে গড়ে উঠেছে Voluntary Blood Donors Association, Ranchi বা VBDA, Ranchi. এই সংস্থাটি আজও রাঁচি শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়মিতভাবে রক্তের যোগান দিয়ে যথেষ্ট নাম করেছে।
ভারত সরকারের কাছেও এভিবিডি পশ্চিমবঙ্গের কাজকর্ম কতটা গ্রহণযোগ্য, সেটার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৯০ সালে, যখন ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিশেষ অনুরোধে National Guide Book on Blood Donor & Motivation. এই বইটি লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অধ্যাপক দেবব্রত রায়কে এবং তিনি দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাকে যাঁরা এই কাজে সাহায্য করেছিলেন তাদের কয়েকজন হলেন অরুণাত চট্টোপাধ্যায়, অর্ধেন্ধু শেখর দত্ত, অরুণাংশু সরকার, দীপক বসু, সত্যব্রত রায়, ভাস্কর ভট্টাচার্য ও সুব্রত রায় প্রমুখ জনেরা।

Further on Blood Donation

1. Dipak Sengupta

রক্তদান প্রসঙ্গে দেবুদার কাছ থেকে শোনা একটা ঘটনা বলি।
দেবুদা, নন্দন, অরুণাভ, চন্দন অনুপ্রাণিত প্রথম রক্তদান শিবিরের প্রথম দিন যাদবপুরে। অনেক সহপাঠী বন্ধুরা এগিয়ে আসছে রক্ত দেবার জন্য। টেলি-কম্যুনিকেশনের সহপাঠিনী সঞ্চিতা দে, বর্ত্তমানে আমেরিকা নিবাসী আরেক-সহপাঠী বন্ধু দীপ্তেন এর জীবন-সাথী, সঞ্চিতা দেব। এ যাদবপুর সঞ্চিতার কাহিনী।
রক্তদান শিবিরে সঞ্চিতা এল রক্ত দান করতে। লম্বা আর অতিরিক্ত রোগা। না, সঞ্চিতার রক্ত দেওয়া হলনা, প্রয়োজনের তুলনায় সঞ্চিতার দেহের ওজন দু কেজি কম। করুণ মুখে সঞ্চিতা সে দিনের মত বিদায় নিল। পরের দিন দেখলাম উজ্জ্বল মুখে আবার রক্তদান শিবিরে হাজির। কিন্তু এদিন সঞ্চিতা স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল, তার রক্তদান নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হল।
আমরা হতভম্ব, আগের দিনের ২ কেজি shortfall, পরের দিন কি ভাবে make up হল, কি রহস্য?
কে যেন রহস্য ভেদ করেছিল। শাড়ির ভাজে একটা ২ কেজি ওজনের বাটখাড়া লুকিয়ে আটকে নিয়ে সঞ্চিতা এসেছিল রক্তদান শিবিরে।

2. Biswajit Das

I did not know such a detailed management of blood donation that started in JU. Amongst many, my heroes in 62 JU group is Nandan. I did not know anything of blood donation campaign. That Sunday suddenly Nandan came to my room in hostel. I was dumb struck. Never before I spoke to him but admired his TT game, arts and as a young leftist leader. He straightaway without introduction gave me a sheet of paper and told, "Write your name and sign". In that sheet I was the first. Without a word I went on to sign. He interrupted and told me "listen first. by signing you promise to donate blood." I just agreed by head movement. Then he told me to follow him to other rooms. From that day I became " blood sucker Babu" in hostel. Many of my friends were hesitant to sign, giving excuses that his health was not good. Nandan instantly pointed finger to me and told "look at him, are you thinner or weaker than him?" We got 100+ volunteers to sign on that day. Next day in our community hall my name was displayed in no.4. I was thrilled and proud. Then the D day came. I was little bit disappointed as my name was relegated to no.8 as Dr Triguna Sen led by other faculty members were in the line. Yes, I remember Dr Sen was disqualified by BP. I was afraid if I get disqualified by weight??? I was actually below 50kg. I watched carefully the weighing scale. It has an initial correcting knob. So, when I stood up on scale, I hoodwinked the Doc and manipulated initial reading to +4 by my toe and stood on. It read 52. I passed. I felt like a hero, when my blood was flowing to glass jar. That is my story of blood donation.

3. Kalyan Das

Debuda's contribution to Blood Donation duly supported by Arunava and Nandan is very well known. In this regard, I am prompted to write about my experience. I was Member of 322B district Lion's Club during my stay at Rishra. Among various activities inter alia Blood Donation was one of them. Every year we used to donate Blood and, on each occasion, a celebrity used

to be a guest. To name a few, Ajit Panja, Utpal Dutta, Victor Banerjee, Shubhendu Chattopadhyay, Tapati Ghosh etc. A certificate from Health Deptt, West Bengal was issued. Club Meetings were held mainly in Hastings Jute Mills Club, Hind Motor Club Bose House, ICI etc. So, I have had the privilege of donating blood every year about a decade and used to have divine feelings.

4. Tapan Gupta

আমাদের বন্ধু শিবু, তোমার অবদানের কাহিনী তো যাদবপুরের বন্ধুদের অজানা রয়ে গেল - অবশ্য তুমি তা কখনও স্বেচ্ছায় কোনদিন প্রকাশ করোনি।
সম্ভবত: দেবুদার উৎসাহে আমাদের HEC, Ranchi তে এক নতুন চেতনা তৈরী করেছিল আমাদের শিবু। Conservative Employee দের মধ্যে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে তৈরী করেছিল HEC Employees Voluntary
Blood Doners Association একার হাতে যেটা সারা বিহার ও পরে ঝাড়খন্ডে স্বীকৃতি পায় ও প্রশংসা পায়।
শিবুকে কাহিনীর একটা চিত্র পেশ করতে অনুরোধ করছি।
যদি কিছু ভুল লিখে থাকি সংশোধন করে দিস।

ভয় থেকে জয়
শিবশঙ্কর ঘোষ

১৯৬২ সালে একদিন রক্তদানের আয়োজন করা হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐ কলেজের ছাত্র শ্যামলও হুজুগে মেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল রক্তদাতাদের লাইনে। এর আগে সে কোনদিন রক্ত দেয়নি, কাজেই লাইনে দাঁড়ালেও মনে মনে একটু ভয় ছিল। গন্ডগোল বাঁধল যখন আর মাত্র চারজনের পরেই ওর পালা এসে গেল। উঁকি দিয়ে দেখতে গেল রক্তদাতা কতটা কষ্ট পায়—আর তখনই নজর পড়ল রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে এরকম একটি বোতলের ওপর। ব্যাস্, মাথাটা গেল ঘুরে, তার মনে হল শরীরটা হাল্কা হয়ে গিয়ে শূন্যে ভাসছে। লাইন ছেড়ে চলে যাবার আগে পেছনের ছেলেটাকে বলে গেল, "আমি একটু টয়লেট করে আসছি। ফিরতে দেরী হলে আমার জন্য অপেক্ষা না করে তুমি দিয়ে দিও।" এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সে সোজা যাদবপুর স্টেশনের সামনে ৯-নম্বর বাস স্ট্যাণ্ডে পৌছে গিয়ে, প্রথম যে বাসটা ছাড়বে, তার দোতলায় উঠে চুপচাপ বসে পড়ল। গন্তব্যস্থল রাসবিহারী, ওর নিজের বাড়ি। বাস না ছাড়া পর্যন্ত খুবই উদ্বেগ ছিল যদি কোন সহপাঠী তার পালিয়ে যাওয়া দেখে ফেলে। ঢাকুরিয়া পৌছালে সে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল যে তার চালাকি কেউ ধরতে পারেনি। নির্বিয়ে বাড়ি ফিরে এসে কিন্তু তার অন্যরকম ভাবনা শুরু হয়ে গেল। বারবার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে চলল কাপুরুষের মত ভয়ে পালিয়ে আসার জন্য। এ এক অন্য রকম অশান্তি। দু দিন কলেজ যাওয়া, এমনকি নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। বাড়িতে অভিভাবকেরা কিছু বুঝতে না পেরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তৃতীয় দিনে অশান্ত মন নিয়ে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, শ্যামল নিজের চিকিৎসা নিজে করতে চড়ে বসল একটা দোতলা বাসে (নম্বর বাসে), এবার কিন্তু গন্তব্যস্থল ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক। কলেজের স্টপে নেমে সোজা চলে গেল ব্লাড ব্যাঙ্কে। কিন্তু ঘরে ঢুকে নাম লেখাবার পর আবার বেশ ভয় পেয়ে গেল। অবশ্য রক্ত না দিয়ে পালিয়ে গিয়ে যে যন্ত্রণায় সে ভুগছিল তার তুলনায় এটা কিছুই নয়। একটা সাদা কাগজে বাবার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে, বুক পকেটে রেখে, চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে। বুদ্ধিমান ছেলে ভেবে নিয়েছিল রক্ত দিতে গিয়ে যদি হাতের কোন ক্ষতি হয়ে যায় সেজন্য ডান হাতটা বাঁচিয়ে রাখা উচিত, আর যদি মরেই যায় তাহলে বাড়িতে নিশ্চয়ই খবর পৌঁছে যাবে বুক পকেটে রাখা কাগজের দৌলতে। চোখ বন্ধ করে যতরকম ঠাকুর-দেবতা আছেন তাঁদের ডাকতে শুরু করে, বলা যায় না তো, এই পরিস্থিতিতে কে বেশী উপকারী! এই সমস্ত প্রস্তুতি তার বেকার মনে হল যখন তিন মিনিটের মাথায় ডাক্তার বাবু জানালেন যে রক্ত নেওয়া হয়ে গেছে।

বাড়ি ফেরার পথে শ্যামল একটা কথাই বার বার বলতে থাকল, "আমি তাহলে রক্ত দিতে পারি।" ছেলেটার কাছে এরপর রক্তদান হয়ে গেল একটা নেশা। পরবর্তীকালে চাকরী নিয়ে কোলকাতার বাইরে চলে গেলেও সে বছরে দু বার (হোলি ও দুর্গাপূজার সময়) কোলকাতায় এসে, কাউকে না জানিয়ে সেন্ট্রাল ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্ত দিয়ে প্রথমবারের পালিযে যাবার প্রায়শ্চিত্ত করে যেত। তাছাড়া নিজের কর্মক্ষেত্রের হাসপাতালেও প্রয়োজনে রক্ত দেওয়া ওর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। এই কাজে বেশ আনন্দ পেলেও শ্যামল খুব গোপনীয়তা রক্ষা করে চলত, কারণ তার ধারণা ছিল যে একবার জানতে পারলে তার বৃদ্ধ পিতা নিশ্চিতভাবে এই কাজে বাধা দেবেন। কিন্তু ১৯৭২ সালের এক ঘটনায় সব কিছু ফাঁস হয়ে যায়। ঐ বছর একদিন ওর কাছে টেলিগ্রাম পৌছায় যে দাদার অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং শীঘ্র কিছু 0+ রক্ত তাঁর শরীরে ঢোকাতে না পারলে জীবন সংশয়। সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া গোটা পাঁচেক Credit Card সঙ্গে নিয়ে শ্যামল পরের দিন বাড়ি এসে গেল। দাদার ঘরে ঢুকে দেখতে পেল হয়-সাত জন বন্ধু মিলে হা-হুতাশ করে চলেছেন আর পাড়ার একজন ডাক্তারবাবু তাদের বলে যাচ্ছেন, "আপনারা দয়া করে মরা-কান্না বন্ধ করে রক্ত যোগাড় করে নিয়ে আসুন।" শ্যামল কাঁধের ব্যাগটা রেখে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, "ক'টা বোতল লাগবে?" ডাক্তারবাবু বললেন, "আপাততঃ দু-বোতল

লাগবে, কিন্তু তুমি রক্ত কোথায় পাবে? বরঞ্চ এঁদের অনুরোধ কর যাতে দু-জন অন্ততঃ রক্ত দিতে তৈরী থাকেন।" তিনি আরও বললেন, অবশ্য দেবার হলে এঁরা আগেই দিতেন। শ্যামল যখন জানাল যে সে এখন সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কে যাচ্ছে। এবং প্রয়োজন হলে নিজের রক্ত donate করে বদলে O+ রক্ত নিয়ে আসবে, তখন ডাক্তারবাবু বললেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি ঐ কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র, দেখি জানাশোনা কেউ যদি পেয়ে যাই।"

ব্লাড ব্যাঙ্কের আধিকারিক ছিলেন কলেজ জীবনে ডাক্তারবাবুর মাষ্টারমশাই। ডাক্তারবাবু তার স্যারকে বললেন, "স্যার, আমার দু-বোতল O+ রক্ত দরকার, আপনি আমাদের দুজনের থেকে donation নিয়ে একটু ব্যবস্থা করে দিন, স্যাম্পেল এনেছি।" শ্যামল তখন পকেট থেকে Credit Card গুলি বার করে বলল, "এগুলি কি এক্ষেত্রে কোন কাজে লাগতে পারে?" আধিকারিক কার্ডগুলি হাতে নিয়ে যাচাই করে বললেন, "তিনটি এক বছরের আগেকার donation, তাই expire করে গেছে, আপনাকে আমরা দু-বোতল দিতে পারব, একটু বসুন। আপনার Credit Card থাকায় preference, ফলে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।" Cross-matching এবং অন্যান্য formalities হয়ে গেলে, দুটো গরম বোতল (১৯৭২ সালে পাউচ ছিল না) হাতে পেয়ে শ্যামল সে-দুটিকে বুকে চেপে ধরল পরম আনন্দে। ডাক্তারবাবু এই সময় আধিকারিকের কাছে গিয়ে নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যার, আমাদের কত দিতে হবে?" স্যাব খুব জোরে হেসে উঠে বললেন, "সে কি হে, তুমি তাতো এই কলেজের ছাত্র ছিলে, ভুলে গেলে নাকি যে Voluntary Donation-এর Credit Card থাকলে টাকা-পয়সা লাগে না? যাও, আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে, রক্ত চড়িয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোল।"

বাড়ি এসে সিলিং ফ্যান থেকে একটা বোতল ঝুলিয়ে রক্ত দেবার বন্দোবস্ত করতে করতে ডাক্তারবাবুটি ফলাও কবে ব্লাড ব্যাঙ্কের ঘটনা বলে গেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রোগীর বৃদ্ধ বাবা ও মা। চার-পাঁচ দিন পরে দাদা একটু সুস্থ হলে, শ্যামল তার কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবার জন্য তৈরী হয়। হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে, বাবাকে প্রণাম করার সময় বৃদ্ধ তাঁর ছেলের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করার সময় বললেন, "এত সব কাণ্ডের পর তোমাকে আমি রক্তদান করতে নিষেধ করতে পারি না, কিন্তু আশা করব নিজের শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখবে।"

বাবার অনুমতি এবং আশীর্বাদ পাবার পর শ্যামল আরও সক্রিয় হয়ে পড়ল স্বেচ্ছা-রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে। ফলস্বরূপ ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রসদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত রক্তদাতাদের সম্বর্ধনা সভায় সে-ও আমন্ত্রিত ছিল। শ্যামলের এই গঠনমূলক নেশা কাজে লাগিয়ে তার কোম্পানী নিজেদের হাউস জার্নালে স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে এক আবেদন বার করল। আর তলায় লিখে দেওয়া হয়, কারুর মনে যদি কোন প্রশ্ন বা সংশয় থাকে তাহলে তাঁরা শ্যামলবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।" পরিচিতি পেয়ে শ্যামলের দায়িত্ব গেল বেড়ে। রাতদিন জানা অজানা অজস্র মানুষ তার কাছে আসতে লাগলেন রক্তদান সম্পর্কে জানতে। বেশ কিছু লোক আসেন তাঁদের প্রিয়জনদের জন্য রক্ত যোগাড় করে দেবার অনুরোধ নিয়ে। রক্তের যোগান দিয়ে অনুরোধকারীদের খুশী করার চেষ্টা করার পরও দেখা গেল যে সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়, কারণ আবেদন আসতে লাগল খুব ঘন ঘন। এই সময় দশ মাথা এক করে ঠিক করা হল 'Blood Cooperative'ই হচ্ছে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। কাজ শুরু হয়ে গেল তখন থেকেই। Association of Voluntary Blood Donors, West Bengal-এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৮৪ সালের ১লা অক্টোবর, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) রাঁচী শহরে জন্ম নিল এক অভিনব সংস্থা, Voluntary Blood Donors' Association, Ranchi. এক বছরের মধ্যেই সদস্য সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়াল। ভারত সরকারের 'Guide Book on Blood Donation'-এ সংস্থাটির নাম নথিভুক্ত হলে সেটি বিশ্বের বহুলোকের

নজরেও চলে এল। রক্তদানের এই নিরন্তর এই সেবাব্রত, সমাজের বৃহত্তরে কল্যানের জন্য এক অনন্য ব্রত।

* শ্যামল একটা ছদ্ম নাম। আসল নাম : শিবশঙ্কর ঘোষ

QUIZ CORNER

Shibshankar Ghosh

[1]

যাদবপুরের প্রথম বছরের ক্লাসে Modern World নামে একটি subject ছিল। এটি পড়াতেন একজন নামকরা ইতিহাসবিদ অধ্যাপকের কন্যা। সরকার পদবীধারী এই পিতা ও কন্যার নাম কি?

Asish DS: সুশোভন সরকার।
কন্যার নাম Dr. Shipra Sarkar
Utpal Sengupta Elec: পুত্র - সুমিত সরকার।

[2]

রক্তদানের পথিকৃত আমাদের দুই সহপাঠী বন্ধু ব্যক্তিগতভাবে রক্তদান করেছেন যথাক্রমে 127 ও 107 বার। প্রথম জন Mechanical এর দেবব্রত রায় বা দেবু দা। দ্বিতীয় জন পড়তেন Electrical এ। এনার নাম কি ?

Asish DS: অরুণাভ চ্যাটার্জি।
আমি দিয়েছিলাম অন্তত 30 বার। একবার রক্ত দিয়ে মাঠে ফুটবল খেলতে নেমেছিলাম।

[3]

আমাদের সহপাঠী বন্ধু। শিবপুরের M.E ও দিল্লী I.I.T এর Doctorate. মেডিক্যাল সরঞ্জাম নিয়ে গবেষণা দীর্ঘ দিনের। খুবই কম খরচে কর্কটের বাসা খুঁজতে ডাক্টোস্কোপির সুযোগ করে দিয়ে, কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রের শিরোনামে চলে এসেছিলেন। প্রবাসী এই গুণী ব্যক্তি টি কে ?

Dipak: অপূর্ব মুখার্জী

[4]

আমাদের প্রথম বছরে ইংরাজি পড়াতেন একজন অধ্যাপিকা। এনার স্বামীও ছিলেন ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক, যদিও ইনি বেশি পরিচিত ছিলেন বাংলা ভাষার কবি হিসাবে। এই দম্পতির নাম কি ?

Prafulla :কবি বিষ্ণু দে, ও প্রনতি দে।
আমি অধ্যাপক বিষ্ণুদের কাছে পড়েছি। মৌলানা আজাদ কলেজে। উনি ছিলেন Dy principal.
পরে যাদবপুরে পড়লাম ওনার স্ত্রী প্রণতি দে র কাছে।

[5]

যাদবপুরের একজন প্রাক্তন ছাত্র (আমাদের থেকে Junior) একটি খেলাতে World Champion হয়ে ছিলেন। খেলোয়াড়টি ও খেলাটার নাম কি ?

মনোজ কুঠারী।
খেলার নাম - বিলিয়ার্ড (এমেচার)

[6]

মোহনবাগান ক্লাবের নামকরা Linkman এই Electrical Engineer টি ফুটবল জীবন শুরু করেছিলেন Inside Forward হিসাবে । পরবর্তী কালে মোহনবাগানে বিদ্যুত্ মজুমদার ও যাদবপুরে বেনু গোস্বামীর সঙ্গে জুটি বেঁধে সুনামের সংগে অনেকদিন ফুটবল খেলেছেন। 1962 সালের পাশ করা এই প্রাক্তনীটির নাম কি ?

Dipak: বিমল চক্রবর্তী, এক বছরের সিনিয়ার

[7]

বিগত শতকের সত্তরের দশকে যাদবপুরের প্রাক্তনী অমিতবিক্রম দাশগুপ্ত ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের একজন অপরিহার্য খেলোয়াড় । তিনি কোন্ খেলার সংগে যুক্ত ছিলেন ?

Ramesh: Out side left of Mohonbagan club in foot ball, used to be popularly known as Jhantu or Jhantuda to his batch mates or juniors

Sibu further adds: সত্তর দশকের অনেক আগেকার খেলোয়াড় ছিলেন। অমিতবিক্রম আমাদের থেকে junior ছিল এবং আরও একটি সূত্র হচ্ছে অমিত নরেন্দ্রপুরেরও প্রাক্তনী ।

[8]

ডাঃ ত্রিগুণা সেন যখন শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে প্রথমবার পার্লামেন্টে যান, তখন যাদবপুরের এক প্রাক্তনী ও তখনকার M.P , স্যারের কাছে এসে প্রণাম করলে ডাঃ সেন তখন খুব আস্তে করে তাকে বলেন, এ কি, তুমি এখানে কি করছ? আমি তো জানতাম শুধু বেকার ও অলস লোকেরাই পার্লামেন্টে আসে। সাঁতার ও Rowing এ দক্ষ এবং সিওল অলিম্পিকের শেফ্ দ্য মিশন এই প্রাক্তনীটির নাম কি ?

কামাখ্যা প্রসাদ সিংদেও

[9]

Chemical Engineering এর প্রবাদপ্রতীম মাস্টারমশাই নিজের ছাত্রাবস্থায় বিদেশে গিয়ে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। ওঁর example দিয়ে বিদেশের ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতবর্ষে এক অনুরোধ পাঠায় যাতে এইরকম আরও কিছু মেধাবী ছাত্রদের তাদের কাছে পাঠানো হয় । এই মাস্টারমশাই হতেন সত্তরের দশকের যাদবপুরের এক উইকেট কিপারের দাদু। নাতি ও দাদু দুজনের নাম কি ?

হীরালাল রায় (দাদু)
সুবীর দত্ত (নাতি, '৬৩ মেকানিকাল)

[10]

পঞ্চাশের দশকে যাদবপুরের দুইজন খেলোয়াড় ছাত্রের নাম যথাক্রমে লালুদা ও গজুদা যারা প্রায় এক দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিভিন্ন রকম খেলাধূলায়। এই দুই প্রাক্তনীর পুরো নাম কি ?

Ramesh: লালবিহারী (লালুদা) চ্যাটার্জি, গজানন শিবশঙ্কর হেমাডি

[11]

সাঁতারের কথা উঠলেই 1962 সালের যে প্রাক্তনীটির ছবি চোখের সামনে ভেসে আসে, তিনি চাকরিসূত্রে দীর্ঘদিন Bhlai Steel Plant এর সংগে যুক্ত ছিলেন। ঐ সময়কার বাংলার 100 মিটার ফ্রিস্টাইলের দ্রুততম এই সাঁতারুটির নাম কি ?

দেবপ্রসাদ চন্দ ('৬২ ইলেকট্রিকাল)

[12]

ষাটের দশকের প্রথমার্ধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলটি ছিল দুরন্ত। ঘনশ্যাম অধিকারী ছাড়াও ঐ দলে ছিলেন আমাদের অন্তত আরও দুজন সহপাঠী বন্ধু । এদের একজন আবার ছিলেন দলটির অধিনায়ক। এই দুজন সহপাঠীর নাম কি ?

আসীম চ্যাটার্জ্জী (অধিনায়ক), দ্বিতীয় জন - আশিস দাশ শর্মা

[13]

ষাটের দশকে নন্দন ভট্টাচার্যের অধিনায়কত্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের টেবিল টেনিস দলটি ছিল অপ্রতিরোধ্য । ঐ দলে নন্দন ছাড়াও আমাদের অন্য দুজন সহপাঠী ছিলেন। সেই দুজনের নাম কি ?

Ans : রমেশ ব্যানার্জি, অশোক চ্যাটার্জি, দীপক ঘোষ, মলয় ভট্টাচার্য।

Ramesh Banerjeea: Ashok was not in TT team, he was a.good hockey & football player. Name of the fifth player was Prabir Bhattacharya but all three were slightly junior to both Nandan & myself

[14]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেক্ট। আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ।1989 সালে দেশে ফিরে বাবার সংস্থায় যোগদান।পরে ঐ কোম্পানীরই কর্ণধার হন। ভালভাবেই হাল ধরেছিলেন ,কেউ বলতে পারেনি যে ছেলে নেই,তাই ব্যবসাটা চলল না। সফল মহিলা কর্ণধার ও কোম্পানিটি নাম কি ?

শান্তা ঘোষ, D.C.P.L

[15]

বাংলার রঞ্জি ট্রফি দলে একসময় বেনু দাশগুপ্ত ছিলেন একজন অপরিহার্য Batsman ও Leg Spinner. তিনি যাদবপুর থেকে Mechanical Engineering পাশ করেছিলেন 1953 সালে। তার অপর দুই ভাই অনিল দাশগুপ্ত ও অজিত দাশগুপ্ত ছিলেন নামকরা ক্রিকেটার । বেনুদার ভাল নামটা কি ?

অশোক দাশগুপ্ত

[16]

একসময়ে স্রেফ তার নামেই কোলকাতার অপরাধ জগত সচকিত ছিল। সারাদিন তাকে সেলাম ঠুকতো লালবাজার। অর্থনীতিতে নিয়ে যাদবপুর থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রথম শ্রেণীতে প্রথম । U.P.S.C তে বসলেন। Target ছিল I.A.S, পেলেন I.P.S । সেটা ছিল 1996 সাল। Challegeটা নিয়ে নিলেন। মহিলা প্রাক্তনীটির নাম কি ?

Prasun: Ms Damayanti Sen .IPS (jt comm. Of police late 90's). Famous for pursuing the rape case & provide justice to the victim in spite of political pressure.
Ju graduate & PG in Eco with brilliant results.

Damayanti Sen was pushed out to Barrackpore, quite unceremoniously, from Kolkata because of her contradiction in a rape case. Recently she has been brought back to Kolkata.

[17]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কে প্রথম Doctorate ডিগ্রি পান এবং কার অধীনে গবেষণা করেছিলেন?

ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য

[18]

কোলকাতায় ডাঃ ত্রিগুণা সেনের নামে একটি রাস্তা আছে। এটি কোন জায়গায় ?

Ramesh: On connector between by-pass & Anwar Shah road, nearly half of that is MN Roy road and half towards Anwar Shah is in the name of Dr Sen.

[19]

1935 সালে যাদবপুরের Electrical Engg. এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের হাত থেকে স্বর্ণপদক পান। যাদবপুরের হয়ে ইলিয়ট শীল্ডে এক মরসুমে (1933 সালে) দশটি গোল করে ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টান্ত আকর্ষণ করেন ।এর থেকেই পরবর্তী কালে মোহনবাগান ক্লাবে প্রতিনিধিত্ব।একশো বছর পেরিয়েও চশমা পড়তে হত না, চলাফেরা করতে লাঠির দরকার হত না। B.I.T পিলানী ও মেসরার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও যাদবপুরের এই শিক্ষকের নাম কি ?

Dipak: Dr.Amiyo Chatterjee

Kalyan adds further: He was alive till 103 years. He used to live in Moore Avenue ,Tollygunge. Used to attend all the functions at Alumni Association, JU.He used to come by public transport (Auto Rickshaw.) Gusto!! Hats Off to him

[20]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Engineer (আমাদের থেকে Junior) ও প্রাক্তন ONGC র চেয়ারম্যানের মৃত্যু হয় মাত্র 62 বছর বয়সে। এনার নাম কি ?

Prasun: Subir Raha JU telecom '68.

Prasun further adds: He was also IOC director hr before ONGC
I hàd regular interaction with Subir Raha at ONGC & since CMC was the solution provider for both these all India Customers. extremely dynamic & action-oriented person, Raha led ONGC oil exploration to greater heights.
My post retirement from CMC in 2002 I had joined as Director & Professor of JIMS, a premier MGMT Inst. in north India with two Universities.
invited Raha on several MGMT seminars of JIMS & also he visited JIMS to address MBA PGDM students. He had rare qualities of a successful top executive. His chain-smoking habit led to his early health problems.

[21]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো টি যে ভারত বিখ্যাত শিল্পী ডিজাইন করে দিয়েছেন তার নাম কি ?

Prasun : Nandalal Bose!! the famous artist of Biswabharati.
Sibu.. Pls excuse me
Asish DS: কোথায় খাপ খুলেছ শিবশঙ্কর?
এটা পলাশীর (প্রসুনের) প্রান্তর!

সঠিক উত্তর এবারেও প্রসূন, আশীষের ভাষায় তুমি সত্যিই অসাধারণ। -শিবু।

[22]

যাদবপুরের সবাই এনাকে চেনেন ।1960 সালের পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরী নানা বিষয়ের ক্লাবগুলো এঁরই হাতে গড়া। ড্রামা ক্লাব,ফোটোগ্রাফি ক্লাব,ফিল্ম সোসাইটি, মিউজিক ক্লাব,মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব, সায়েন্স ক্লাব প্রভৃতি তালিকা থেকেই স্পষ্ট যে ভদ্রলোক নানা বিষয়ে আগ্রহী ।যাদবপুরের ক্যাম্পাসে তিনি সবাইকার বিশ্বাস দা।ভদ্রলোকের নাম কি এবং এনার সেলিব্রিটি দাদার নামটাই বা কি ?

Himendu Biswas (Our beloved Biswas Da)
Celebrity elder brother – Hemanga Biswas (Folk Song Singer)

[23]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই প্রাক্তন অধ্যাপক দশকের পর দশক ধরে বাংলা অভিধান চর্চা আর প্রযুক্তি বিদ্যাকে অবলীলায় মিলিয়ে এসেছেন।এনার অমূল্য সংকলন সম্ভারের মধ্যে আছে "সমার্থ শব্দকোষ ", "ব্যাকরণ অভিধান " ও "বানান অভিধান "।ইনি কে?

Ashoke Mukhopadhay

[24]

নামে "এদেশী" হলেও,যাদবপুরের প্রাক্তনী এই অনাবাসী মার্কিন শিল্পপতি আজ বিদেশে বিপুল ভাবে সমাদৃত ।ইলেকট্রিক্যালের এই প্রাক্তনী টির নাম কি?

Swadesh Chatterjee

[25]

1952 হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের ভারতীয় ফুটবল দলে একজন যাদবপুরের প্রাক্তনী ছিলেন ।তাঁর নাম কি?

Jhontu (Arun) Dasgupta

প্রসঙ্গ ছাত্র ইউনিয়ান

-- আমাদের সমকালের

ছাত্র ইউনিয়ন
দেবব্রত রায়

বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষে সি. ই. টি.-র ছাত্র ইউনিয়ন ছিল বেশ শক্তিশালী সংগঠন। সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হত সব ছাত্রের ভোটের ভিত্তিতে। ছিল শ্রেণীর প্রতিনিধি ও ইউনিটের আর করপোরেশন অ্যাপ্রেনটিসদের প্রতিনিধিত্ব। চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষ মনাোনয়ন করতেন রেক্টর, শিক্ষকদের মধ্যে থেকে। নির্বাচনে প্রচার হত, ভোট পরিচালনা করতেন অধ্যাপকরা, ভোট গণনাও তাঁরাই করতেন। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, নির্বাচন কোনো রাজনৈতিক দলের নামে হ'তো না। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী ছাত্র এবং অরাজনৈতিক ছাত্রদের নিয়েই গঠিত হত ছাত্র ইউনিয়ন। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের বন্ধু ছিল, ক্লাসে তারা পাশাপাশি ব'সতো। একই mother একজন আর একজনকে দিতে, পরীক্ষার আগে অনেকে একসঙ্গে হস্টেলে বা কারও বাড়িতে বসে পড়াশোনা করত। কোনোদিন রাজনীতির ভিত্তিতে ছাত্রে ছাত্রে মারামারি হয়েছে, এরকম কোনো ঘটনার কোনো হদিস নেই।

ইউনিয়নের মিটিং নিয়মিতভাবে হত, হত ক্লাস ছুটির পরে। উপস্থিতির হার থাকত যথেষ্ট, প্রায়শই 90% 100%, প্রচুর কাজ থাকায় এক একটা কাজের দায়িত্ব নিত আলাদা আলাদা উপ-সমিতি। উপ-সমিতিগুলিতে সদস্যরা ছাড়াও থাকত একজন করে আহ্বায়ক ও শিক্ষক-সভাপতি।

ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল Industrial Exhibition এর আয়াোজন। দুর্গাপূজার পর থেকে ৩ মাস ধরে প্রতিদিন ছুটির পরে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী মিলে exhibition হিসাবে মডেল তৈরি করত। উদ্বোধনের আগে, শেষের ৫ দিন তো সারা রাত ধরেই কাজ হত। এই কাজ করতে গিয়ে অনেক কিছু নতুন বিষয় লিখতে হয়েছে। - যেমন Bill of Materials, Requisition, Specification, কোথায় কোন জিনিস পাওয়া যায় ইত্যাদি। Exhibition-এ দর্শক টানতে সারা রাত ধরে শহরে পাোষ্টার লাগানো হত, ফলে দেখার জন্য ভিড় হত প্রচুর। এই আয়াোজনের জন্য কিছু টাকা দিত বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞাপন মারফৎ কিছু টাকা তোলা হত আর গেটের দর্শক-টিকিট থেকে বাকি টাকা উঠত। খবরের কাগজে ছবিম্ন সহ প্রতিবেদন বার হত। Industry-র অনেকে Exhibition দেখতে আসতেন। কিছু কিছু মডেল BITM নিয়েছিল, একটি মডেল নিয়েছিল Post & Telegraph বিভাগ আর ঢাকুরিয়ার Flyover-এর নকশাটি নির্মাণের জন্য নেওয়া হয়েছিল এই Exhibition থেকেই। এই Exhibition এর সঙ্গে যুক্ত অনেকেই ভবিষ্যতে ছোটো কারখানা চালানোর অভিজ্ঞতা লাভ করত। প্রখ্যাত মিউজিয়াম-বিশেষজ্ঞ ডাঃ সরোজ ঘাোষ বলেছেন, তার মিউজিয়ামের মডেলে হাতেখড়ি হয়েছে এই Exhibition থেকেই। যারা মডেল তৈরি করত, তাদের অনেকেই পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ত, তবুও সেই ছেলেরাই Blazer ও Tie পরে বীরদর্পে Exhibition চলাকালীন demonstration দিত। মডেলগুলির অনেকগুলি এমনই সচল, যে সেগুলি চালিয়ে দেখাতে হত।

অন্যতম আর একটি কাজ ছিল Convocation Pandal -এ সারারাত ব্যাপী গানের জলসা যা Annual Social বলে পরিচিত ছিল। দেশের নামি দামি শিল্পী রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক গান, Classical এবং বাজনা পরিবেশন করতেন। মান্না দে, সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, শ্যামল মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, হেমন্ত মুখার্জী, বড়ে গুলাম আলি, রবিশঙ্কর, আলী আকবর খাঁ প্রভৃতির মতো অনেকেই এই অনুষ্ঠানে এসেছেন। ১৪ হাজার মানুষের জমায়েতে সব শিল্পীই অংশ নিতে আগ্রহী ছিলেন। ছাত্ররা Guest Card পেত। এত বড় জমায়েত সামলাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কখনও পুলিশ ঢোকার প্রয়োজন হয়নি, ছাত্ররাই সব দিক সামলাতো– কোনাোবারই কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটে নি।

Cultural কমিটির কাজ ছিল বসন্ত উৎসব, রবীন্দ্রজয়ন্তী, বিতর্ক সভা, কুইজ ইত্যাদি যুব উৎসবের বিভিন্ন ধরণের
প্রতিযোগিতার আয়াোজন।

Social Service কমিটি শিয়ালদহ স্টেশনে রিফিউজি রিলিফ, কালিকাপুরে বন্যা ত্রাণে কাজ করত।

ছাত্র ইউনিয়নের ছিল একটি ভালো Text Book Library, একটি Students' Cheap Store, আর Students canteen – এগুলো পরিচালনার দায়িত্বে ছিল কোনো contractor নয়, ছাত্ররাই। ইউনিয়নের তরফ থেকে ছাপানো হ'ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোর বিগত ৫০ বছরের পুরানো প্রশ্নগুলি। Students' Aid Fund টি ছিল অভাবী ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য।

ইউনিয়নের একটি আলাদা Journal Committee ছিল যা একটি Technical Journal আর একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের বন্দোবস্ত করে।

University Sports Board আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধূলার Team তৈরি, Coaching-এর ব্যবস্থা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দায়িত্বে থাকলেও CET Sports Club ছিল আন্ত-শ্রেণী খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার পরিচালনা ও
ব্যবস্থাপনার জন্য।

সব ছাত্রদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে Students' Health Home-এর একটি Medical Unit স্থাপিত হয়েছিল প্রতিদিন টিফিন বিরতির সময় দেখাশাোনা করার দায়িত্ব ছিল ইউনিয়নের Students' Health Home Sub Committee র উপর।

সে যুগে ছাত্র ইউনিয়ন কিন্তু সারা পৃথিবীর যাবতীয় রাজনৈতিক বিষয়-আশয় নিয়ে ভাবত না। ছাত্র ইউনিয়ন ছিল একান্তভাবেই ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত ছাত্রদের জন্যই ছাত্রদের একান্ত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

From the pen of our Junior Batchmates

Tribute to Bhola Babu Sir, Prof. Civil Engg Deptt.

Dr. Indrajeet Chowdhury

[1]

Our respected Bhola Babu Sir,

১৯৭০-৯০ দশকে যারা যাদবপুরে সিভিল ইঞ্জীনিয়ারিং পড়েছেন, প্রফেসর ভোলানাথ ঘোষ বা ভোলা বাবুকে জানেন না এরকম কেউ বোধহয় নেই।

আমাদের তৎকালীন হেড পীযূষ সোম সাহেবের মতন তাঁর হয়ত খ্যাতি/glamour ছিল না, কিন্ত ছাত্র মহলে তাঁর দাপট, সোম স্যারের থেকে কিছু কম ছিল না।

ভদ্রলোকের চেহারাটা কিন্ত সেই অর্থে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। ছোট্টখাট্ট গৌরবর্ন মানুষটিকে দেখে, মানুষটার প্রকৃত তল্ পাওয়া কিন্ত বেশ শক্ত।

ওনার তিনটি চেহারাগত বৈশিষ্ট্য ছিল (আমার মতে)।

১ ওরকম কাঁচা সোনার মতন রং বাঙ্গালীদের মধ্যে rare, বিশষতঃ পুরুষ মানুষের।

২ চক্ষু, ওরকম নীল চোখ আমাদের মধ্যে বিরল। ওনার চোখে (বিশেষ করে রেগে গেলে), একটা কাঠিন্য ও তীব্রতা দেখা দিত, যার ধাক্কায় অনেক ডাকাবুকো ছেলেকেও মাথা নামাতে দেখেছি (আমাদের এক সহপাঠী বলত নীলাক্ষ বিভীষিকা)।

৩ গলার স্বর, নাঃ, বজ্রকঠিন, বা জলদগম্ভীর একেবারেই নয়। বরং পাতলাই বলা চলে, কিন্ত সেই স্বরে, বিশষতঃ ক্ষিপ্ত হলে, এক ইস্পাত সম কাঠিন্য ধারন করত, যা পেট গুড় গুড় করার পক্ষে যথেষ্ট।

কোন অবাঞ্ছিত ঘটনায় রেগে গিয়ে, ওই ইস্পাত কঠিন কন্ঠে 'কি হয়েছে' বলে দাড়ালে কোন ছেলের সাহস ছিলনা আর কথা বাড়ানোর।

স্যারের তিনটে খ্যাতি (কিংবা কুখ্যাতি) ছিল।

প্রথম তাঁর নিয়মানুবর্তিতা। ঘড়ি ধরে ক্লাস নিতেন, কোনদিন এক মিনিটের জন্য লেট নয়, এবং আমাদের assignment জমা নেবার সময়ও এই সময় পালন, নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতেন। উনি যদি বলেন কাজ জমা দেবার দিন, 28 জুলাই বেলা দশটার মধ্যে, তার মানে বেলা দশটাই, দশটা পাঁচ নয়। তাহলে উনি আর কাজ জমাই নেবেন না। এক খুব শরীর খারাপ (that too certified by a doctor), বা বাড়িতে কেউ গত হয়েছে ছাড়া কোনো অজুহাতই ওনার কাছে গ্রহনযোগ্য ছিল না।

সময়ের কড়াকড়ি বোঝাতে আমরা অনেক সময় বলতাম BST (Bhola Ghosh Standard Time), অর্থাৎ যার কোন নড়চড় নেই।

পাশ করে পরে সিনিয়র হয়ে নিজের অধস্তন ছেলেদের যখন কাজ দিতাম, আমার নিজের কলেজের ছেলে হলে অনেক সময় বলতাম জমা দেবার তারিখটা কিন্ত BST। ওরা অনেকেই বুঝত। ফিক করে হেসে বলত, বুঝেছি স্যার, জমা দেবার তারিখ ফিকস্‌ড তাই তো?

আর খ্যাতি ছিল invigilation এর।

প্রত্যেক ক্লাসেই এবং বছরে কিছু মুষ্টিমেয় ছেলে থাকে যারা অসম্ভব দুঃসাহসী এবং পরীক্ষার যে আচরণ বিধি, তা অনায়াসে লঙঘনে পারদর্শী। তাদেরো দেখেছি পরীক্ষার আগে জোড়হস্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা রত, ভগবান আজ ভোলা বাবু যেন গার্ড না থাকেন।

না, কোন চিৎকার চ্যাঁচামেচি নেই। এসে শান্ত ভাবে খাতা ও প্রশ্নপত্র দেবেন। C-2-9 এর মতন বিশাল হলঘরে পরিক্ষা, দুই ইয়ার মিলিয়ে প্রায় শতাধিক ছেলে পরিক্ষা দিচ্ছে। কিন্ত পিন্ ফেললেও শব্দ হবে। ভোলা বাবু বসে আছেন আমরা লিখছি।

কিছু কাগজ দেখছেন আর মাঝে মাঝে, ওই ভয়ানক নীল চক্ষুদ্বয় আমাদের উপর সার্চলাইট এর মতন ঘুরছে।

হঠাৎ ভোলা বাবু উঠলেন ও অলস পায়ে হেঁটে চললেন হলের শেষ প্রান্তে। আশি বা নব্বই ফুট হবে (আমরাও লেখা থামিয়ে দেখছি কোন পাঁঠা জবাই হল), কোন এক লাষ্ট কিংবা তার আগের সাড়ির একটি ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই শানিত তড়বারির মতন ইস্পাত কঠিন গলায় শুধু তিনটি শব্দ প্রয়োগ করলেন। "সামনে চলে যাও"। অর্থাৎ প্রথম সাড়িতে, ওনার সামনে বসে বাকি পরীক্ষা দেবে। ছেলেটি দেখবেন মাথা নীচু করে শুর শুর করে সামনে গিয়ে বসল।
নিশ্চিত বলা যায়, এই শাসন অনর্থক নয়, ওই ছোঁড়া কিছু একটা বিচ্ছুপিনা করছিল, যা পরীক্ষার হলে অনুচিৎ।
ফেরার পথে হয়ত মাঝ হলঘরে আর একটি ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে শান্ত অথচ সেই হিমকঠিন কন্ঠে বললেন, "খাতাটাও সামনে, প্রশ্নপত্র ও সামনে, পেছনে ঘোরার কোন প্রয়োজন দেখিনা", এই বলে হাঁটা দিলেন। সে ছেলে দেখবেন তর্ক দুরে থাক, মাথা নিচু করে বসে আছে। আর ধরা পরলে তো হয়ে গেল। পরীক্ষা ওখানেই শেষ। ওই খাতায় আর কোন কালির আঁচর পরবে না।
এই একটা ব্যপারে আমরা ওনাকে ব্যপক ভয় পেতাম। ওনার এই হ্যাঁ তো হ্যাঁ না তো না। কারুর সাধ্য নেই তার থেকে ওনাকে সরায়।
ওনাকে কতটা সমীহ করতাম তার একটা উদাহরণ দি।
সালটা ২০০৭ অর্থাৎ পঁচিশ বছর বা তার কিছু বেশী, পাশ করে গেছি।
তখন দুবাই শহরে এক বহুজাতিক ইনজিনিয়ারিং সংস্থার সিভিলের প্রধান হয়ে কর্মরত। বহুজাতিক মানে সত্যিই তাই। প্রায় তিনশো ইনজিনিয়ার আমার অধিনস্থ। তার মধ্যে, ইংরেজ, রাশিয়ান, ফরাসি , ফিলিপিনো, ভারতীয় সবই আছে। আর ভারতীয় দের মধ্যে, প্রায় গোটা ৫০-৬০ বঙ্গসন্তান, হয় যাদবপুর, শিবপুর, বা IIT.
আমরা তখন নর্থ সী তে স্কটল্যান্ডের উপরে শেটল্যান্ড বলে এক দ্বীপে একটা বিশাল plant নির্মাণ করছিলাম।
যায়গাটা অত্যন্ত ভয়ংকর। যেমন ঠান্ডা, তেমনি কুয়াশা, হাওয়া আর বৃষ্টি।
বৃষ্টির সাথে আবার ছোট ছোট বরফের কুচি ছুড়ির মতন আঘাত করে। Protection ছাড়া পনেরো মিনিট ঘুরলে, মুখ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে যাবে।
আমরা তাই ঠিক করেছিলাম এমন ইঞ্জীনিয়ারিং করব, যাতে site এ খুব কম সময় ব্যয় করতে হয়। আমরা ইঞ্জীনিয়ারিং দুবাইতে করব, steel fabrication Factory তে হবে এবং তৈরী অবস্থাতেই part by part module গুলো জাহাজে করে দ্বীপ এ নিয়ে গিয়ে erection করা হবে।
কারিগরি পরিভাষায় একে বলে modular structure design. Steel fabrication এর জন্য এক কুয়েতি সংস্থাকে বরাৎ দেওয়া হয়। আমার এতে আপত্তি ছিল , কারণ এই কাজের জন্যে যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দরকার আমার মনে হয় তা ওদের কম ছিল। modular structure fabricate করা সোজা নয়, প্রভূত দক্ষতার প্রয়োজন। কিন্তু অনেক বড় contract, প্রায় ২৫০০০ টন স্টিলএর কাজ, জানি না উপর মহলে কোন টাকার লেনদেন হয়েছিল কিনা। মোদ্দা কথা, আমার কথায় কর্ণপাত না করে ওদেরই বরাৎ দেওয়া হয়।কাজ শুরু হবার ৪ মাস বাদেই যা ভয় পেয়েছিলাম তাই হল। ওদের বিশাল মেল , তোমরা ভীষণ জটিল connection design করেছ। এরকম অদ্ভূত connection আমরা দেখিনি (স্বাভাবিক, actually ওরা কখনও off shore type modular structure fabricate করেনি। হয় design সরলীকরণ কর, নয় সময় বেশী লাগবে এবং পয়সাও (অর্থাৎ extra claim)।
সময় তো Bhola Ghosh Standard time - কোন প্রশ্ন নেই, delay penalty তে ফাঁসব। আমাদের বড় কর্তার পরিষ্কার হুকুম, ওদের LSTK (Lump Sum Turn Key) contract, পয়সা দেওয়া যাবে না। তাহলে কি উপায়?

আলোচনা করে ঠিক হল কিছু অল্প ক্ষেত্রে ছাড় ও সরলীকরণ করা যেতে পারে, বাকি case এ একেবারেই নয়। আমরা ওদের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কিছু expert welder ও erector পাঠাব ওদের সাহায্যের জন্যে।

Connection গুলো পরিকল্পনা করেছিলাম আমি, এক ইংলিশ ইনজিনিয়ার David Leake ও সত্যদা।

সত্যদা আমার অধিনস্থ হলেও আমার থেকে সিনিয়র এবং যাদবপুর সিভিল (৭৬/৭৭)।

David তখন ছুটিতে দেশে। অতএব সত্যদাকে বগলে করে আমি ছুটলাম কুয়েৎ, ব্যপারটা সমাধান করতে।

প্লেন থেকে নেবে ওদের General Manager এক স্কটিস সাহেব নাম ম্যাকগ্র, (তাকে আগে কখন চোখে দেখিনি) , তাকে ফোন করে বললাম, আমরা এসে গেছি। তখন সকাল নটা হবে।

উনি বললেন No problem, Airport এর বাইরে নাম লেখা Plackard নিয়ে লোক অপেক্ষা করছে আমাদের নিয়ে যেতে। Airport থেকে বেরিয়ে পেয়ে গেলাম তাকে। সোজা গাড়িতে তুলে ওদের আফিস কাম Factory তে আমরা হাজির।

গাড়ি থেকে নাবতেই এক মালায়ালি ইনজিনিয়ার দন্ত বিকশিত করে Welcome Sir বলে আপ্যায়ন করল (হাজার হোক আমরা client Party), তারপর ম্যাকগ্র সাহেবের ঘর দেখিয়ে দিল।

নক্ করতেই এক ভীষণ সাহেবী উচ্চারণে কেউ ভিতর থেকে বলল come in aye!

ঘরে ঢুকে দেখি এক সাহেব আমাদের দিকে পেছন ফিরে computer এ কর্মরত। আমাদের ঢোকার শব্দ পেয়ে revolving chair টা ঘুড়িয়ে আমাদের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করলেন,

Mr Chowdhury and Mr. Basu, I believe?(বাসু সত্যদার পদবী)।

আমি নির্বাক ও অবাক............

কি সর্বনাশ এ যেন স্বয়ং ভোলা বাবু বসে!! He is an absolute doppelganger!! একেবারে যময !!!

কোন উত্তর দেবার আগে সত্যদাকে একবার আড়চোখে দেখলাম।

চশমার লেন্স দিয়ে চোখ বিস্ময় ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, মুখ আধখোলা হা।

সাহেবের প্রশ্নে প্রায় হাত তুলে Present Sir, বলে বসেন আরকি!

আমাদের ওই হতবভম্ব চেহারা সাহেবের চোখ এড়ায় নি।

কাজেই আবার প্রশ্ন :

What's up gentlemen, something wrong, you both look singularly dazed.

সত্যদার থেকে বয়সে ছোট বলেই বোধহয় আগে ধাতে ফিরলাম।

No it's ok, you know its pretty shiny out there, just got a bit dazed coming in from bright light, Chowdhury here বলে ঝপ করে সামনের চেয়ারে বসে পড়লাম।

সত্যদা তখনও ঘোরে এবং দাঁড়িয়ে।

সাহেব আবার বললেন Sit down Mr Basu.

সত্য দা এবার- না, ইয়ে মানে....Thanks বলে বসে রুমাল বার করে ঘাম মুছতে লাগলেন।

এরপর আলোচনা কি হল তার বিবরণ নিস্প্রয়োজন।

সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের drawing office এর দিকে হেঁটে যেতে যেতে সত্য দা ফিস ফিস করে বললেন, কি সাংঘাতিক! আমার তো বুকটা ধ্বক্ করে উঠে ছিল, ভোলা বাবু এখানে কোথা থেকে এলেন? কি ভয়ানক ব্যপার হত বল তো ভাই।

আমি সায় দিতে গিয়েও হেসে ফেললাম। আজ একজন পচিশ বছর ও আর একজন ত্রিশ বছর কলেজ ছেড়েছি। আজও ভোলাবাবুর নামে দুই পক্ককেশ ইঞ্জীনিয়ারের পাৎলুন হলুদ।

** সত্য দা নামটা কাল্পনিক। যিনি ছিলেন তার অনুমতি নিতে পারিনি বলে আসল নামটা আর দিলাম না।

[2]

সালটা ১৯৮০, আমরা তখন প্রি ফাইনালে ইয়ার (চতুর্থ বৎসর) এর ছাত্র। ভোলাবাবু তখন আমাদের একটা বিষয় পড়াতেন -জিওডেটিক সার্ভে।

এই পরিসরে যারা সিভিল ইনজিনিয়ার আছেন , এই বস্তুটি কি?, তার ব্যখ্যা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। তার থেকেও বড় কথা, এর সাথে জড়িত সেই সব বেদনাময় ও রক্ত হিম করা স্মৃতি যা অনেকের আছে, এবং যা আজ বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত, তার পুনরুত্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখি না।

তবে দুর্গম সিভিল নামক পর্বত লঙ্ঘন করতে, যে কটি বিষয়কে আমরা গাঁট মনে করতাম - তার মধ্যে ইনিই সর্বশ্রী।

যারা সিভিল নন্, তাদের জন্য সংক্ষেপে বলি, অনেক বড় জায়গার সার্ভের জন্য (ধরুন গোটা বাংলা), এ বিদ্যে কাজে আসে।

বিষয়টি নিঃসন্দেহে কঠিন, জ্যোর্তিবিদ্যা নির্ভর অনুশীলন প্রবন ও গোলক ত্রিকোনমেতি নামক এক জটিল অংকে ভালো ব্যুৎপত্তী লাগে।

বিষয়টা শুধু জানলেই হয় না , প্রচুর অনুশীলন লাগে এবং সঙ্গে মনঃসংযোগ। একটু ফোকাস নষ্ট হলে, অংক ভুল হয়ে যাওয়ার প্রভুত সম্ভাবনা, এবং যখন বোঝা যাবে যে অংক ভুল হয়েছে, তখন তার আর সংশোধনের সময় নেই - বিশষ করে পরীক্ষার সময়। কাজেই পরীক্ষা যুদ্ধে এর হাতে ঘায়েলের সংখ্যা বেশ বেশি ছিল।

ডিসিপ্লিনের সিনিয়র দাদারাও সাবধান করে দিয়েছিলেন, সাবধান!! এটা একবারে পাশ করে যাবার চেষ্টা করবি, আঁটকে গেলে বার তিনেক ঘুরিয়ে ছাড়বে। এটা বাদে সব পাশ করে গেলি, কিন্ত্ত ডিগ্রীটি পাবিনা, এ গাঁট পেরোতে পারিসনি বলে।

প্রথমদিন ক্লাসে এসে ভোলাবাবুও একই কথা বলেছিলেন -

শোন বাবারা, শুধু আড্ডা আর ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ালে চলবে না। সময় দিতে হবে, পড়তে হবে, তা নাহলে কিন্তু পাশ করবে না।

এই বলে আমাদের দিকে পেছন ফিরে, হাতটাকে সোজা ও শক্ত করে চক দিয়ে এক অদ্ভুত কায়দায় পুরো বোর্ড জুড়ে, এক নিখুঁত বৃত্ত আঁকলেন।

This is celestial sphere. This is Zenith and this is Nadir. This is first point of Capricorn ইত্যাদি।

প্রথম ক্লাসেই মালুম পেলাম, উনি ঠিকই বলেছেন। এটা ঠিক, অন্য বিষয়ের মতন নয়, স্টেজে মারা যাবে না।

ক্লাস শেষ হতে স্যার কে ধরলাম।

স্যার কি বই পড়ব?

উনি বললেন- David Clarke vol-2, অথবা, Bannister and Raymond দেখতে পারো।

এই বলে চক, ডাস্টার, হাজিরা খাতা নিয়ে হাওয়া।

আমরাও ছুটলাম Library, বই তুলতে।

David Clarke উল্টেপাল্টে সুবিধে হল না। সব FPS System, আমরা তখন সব অংক SI unit এ করি। আর Clarke এর বইএর কপিও ছাত্রসংখ্যার থেকে কম।

হ্যা, Bannister and Raymond এর প্রচুর কপি আছে। আর SI unit ব্যবহার করেছে। অত এব, ওই বইটাই তোলা হল।

কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখি মহা সমস্যা!!

প্রচুর থিওরি আর d4f/dz4 কপচেছে, কিন্তু উদাহরন-মালায় একটা বা দুটো মাত্র অংক কষে দিয়েছে, আর প্রশ্নমালায় গোটা কুড়ি অংক দিয়েছে - সে কি শক্ত শক্ত অংক রে বাবা!!

ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায়, উত্তর মেলে না, গলদঘর্ম অবস্থা।
চার সহপাঠী, দেড় টাকা করে চাঁদা দিয়ে দুই প্যাকেট Wills সিগারেট কিনে ঢাকুড়িয়া তে শান্ত্বনুর বাড়িতে বসলাম গ্রুপে অংক করব বলে। বিকেল চারটে থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কসরৎ চলল, ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল, কিন্তু খুব বেশি এগুল না। মোট চারটে অংক হল। তায় দুটো অংকের উত্তর পাওয়া গেল না। কারণ উত্তরমালায় কেবল বেজোড় সংখ্যার উত্তর দেওয়া আছে। এরকম রোজই তখন ধোঁয়া বিপ্লব হচ্ছে, কিন্তু শ্রেণীশত্রু আর নিপাত যাচ্ছেনা।
এই করতে করতে প্রথম অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের সময় এসে গেল।
এখানে আমার সিনিয়র দাদাদের জ্ঞাতার্থে এই অভ্যন্তরীণ ও চলমান মূল্যায়নের কিছু ব্যখ্যা দিচ্ছি। এর গুরুত্ব আমাদের পাশ ফেলে কতটা ছিল, সেটা না বুঝলে এই পোষ্টের রসহানি হয়।

যা শুনেছি, আপনাদের সময় এসব ছিল না। বছরে দুবার গঙ্গাস্নান করতে হত, হাফ ইয়ারলি আর ফাইনাল। পাশ তো গল্প শেষ, আর ফেল, তো পরে সাপ্লি পরিক্ষা, না পারলে রিসাপ্লিতে বসো।
আর আমাদের ছিল নিত্য পূজো। পরীক্ষা লেগেই আছে এবং খারাপ করলে ভয়ানক চাপ।
প্রত্যেক বিষয় তিনটে পরীক্ষা হত (class test), ৪৫ নম্বরের।
ধরুন ফ্লুইড মেকানিক্স, আপনি তিনটে পরিক্ষা দিয়েছেন।
প্রথম দুটোয় পেয়েছেন ৪০/৪৫, ৪২/৪৫। শেষেরটা সুবিধে করতে পারলেন না, পেলেন ৩০/৪৫। আপনার ঐ বিষয়ে মূল্যায়ন হবে best two of three exam, অর্থাৎ আপনার গড় দাড়াল ৪১/৪৫।
হাজিরায় থাকত ৫ নম্বর। হাজিরা ৫০% এর নিচে থাকলে শূন্য, ৯৫-১০০% হলে ৫/৫ ইত্যাদি। ধরুন পেলেন ৩/৫। তাহলে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে আপনার নম্বর হল ৪১+৩=৪৪/৫০।
এবার সেমিষ্টার পরিক্ষা, ১০০ তে, খুব সুবিধা হল না। পেলেন ৭০/১০০। আর্ধেক করলে হল ৩৫/৫০। অতএব ফ্লুইডে আপনার নম্বর হল ৪৪+৩৫=৭৯/১০০।
পাশ নম্বর ৫০।
এই থেকে সহজেই অনুমেয় এই আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ফল ভালো করলে যেমন সেমিষ্টারে খারাপ করেও পাশ করে যাওয়া যায়, ফল খারাপ করলে সেমিষ্টারে প্রবল চাপ। team 36/4 and 275 to win এ ব্যথা, কি যে ব্যথা যে খেলেছে সেই যানে।
প্রথম পরীক্ষায় বসলাম , ও বাবা এ কি অংক রে !! ঠাওর করতেই ১৫ মিনিট গেল। একবার মনে হল খাতা জমা দিয়ে পালাই, পরে ভাবলাম কখন blank খাতা জমা দেইনি, চেষ্টা করা যাক।
খুঁটে(২), যা পারলাম করলাম। ৪০ মনিটের পরিক্ষা মূহুর্তে শেষ হয়ে গেল।
বিরস বদনে খাতা জমা দেবার সময় ভোলাবাবু একেবারে গলায় মধু ঢেলে জিজ্ঞাসা করলেন - পরীক্ষা কেমন হল ? বাবারা? ভালো হয়েছে তো?
কল্যান আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঠোঁটকাটা আর বাকচতুর, খাতা জমা দিতে দিতে, উত্তর দিল, সেটা স্যার আমাদের খাতা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন।
তিন/ চার দিন বাদে ফল বেরোল। কচুকাটা অবস্থা। মনোজ highest ৩০/৪৫, আমরা ২০ থেকে ২৫ এর মধ্যে, আর কিছু দূর্ভাগা ৫ থেকে ৯ এর মধ্যে।
কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে স্যার কে বললাম, "স্যার পরীক্ষাটা তো খুব খারাপ হয়ে গেল।"
স্যার তার সেই নীলাক্ষ কৃপাদৃষ্টি হেনে, হ য ব র ল এর সেই বিড়াল টার মতন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হেঁসে বললেন, "আরো পড়, মন দিয়ে পড়, সারাদিন আড্ডা আর ইয়ারকি দিয়ে বেড়ালে চলবে? (এটা বোধহয় ওনার বাক্যের মাত্রা ছিল)।
ব্যাজার মুখ করে বেরিয়ে এলাম। Department এর বাইরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের একটা ভাঙ্গা সাঁজোয়া গাড়ি ছিল। পাঁচ বন্ধু তার উপর বসে বিষণ্ন বদনে বিপদসংকুল ভবিষ্যতের কথা ভাবছি আর

হাতে হাতে সিগারেটের counter ঘুরছে। আমাদের সময় সিগারেট খাওয়া নিয়ে কলেজে এত কড়াকড়ি (ন্যকামি) ছিলনা।
কেউ কারোর সাথে কথা বলছিনা । যে যার দুর্ভাবনায় নিমগ্ন।
নাঃ তীরে এসে তরী ডুবল।
কি হবে? কোনদিন সাপ্লি পাইনি, এবার বোধহয় শেষরক্ষা হল না।
ফেল করলে first class hons ও। থাকবে না।
বাড়িতে মুখ দেখাব কি করে?.....

আমার পাসে বশে কল্যান,গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছিল। একটা টান দিয়ে আমার হাতে সিগারেট টা চালান দিয়ে হঠাৎ বলে উঠল ধুস্ সব গুল্।
আমরা সপ্রশ্নে তাকালাম। কি গুল্?
ভোলাবাবু চেপে যাচ্ছে বইএর নাম।
তার মানে? কি বলতে চাস?
কল্যান লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "লক্ষ কর, যে অংকটা ভোলাবাবু দিয়েছেন ওটা Bannister এ নেই।"
আমি একটু ভেবে বললাম না, "তা বোধহয় নেই, তো?"
তাহলে অংকটা এল কোথা থেকে? কল্যান প্রশ্ন রাখল।
শান্তনু বলল - কেন, Clarke এর বই তো হতে পারে।
উহুঃ, ওখানে সব FPS এ অংক, formula বদলে যাবে না?
তা বটে, তাহলে নিশ্চয় বানিয়ে দিয়েছে।
কল্যান আমার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল- অত্ত সোজা নয় বস্, এ অংক বানিয়ে, তার উত্তর আবার কষে বের করা..... অত সময় ভোলাবাবুর নেই।
Richard D'souza সাহেব মানুষ, হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল - What the f*$k,? Let us go to Bhola babu and ask him from where the hell did he get this bitch of a problem.? He must tell us the name of the book.
কল্যান হেঁসে বলল- Is it? যা চেষ্টা কর্। I bet Bhola babu will kick your ass blue.। পাকামি করিস না চুপ কর্।
Richard বেচারা সত্যিই চেপে গেল।
কল্যান তখন আপন মনে বলছে- তার মানে ভোলাবাবুর কাছে এমন একটা বই আছে, যার নাম উনি আমাদের বলছেন না, বা বললেন না। আমি সিওর, ঐ বইতে অনেক অংক কষে দিয়েছে। আর ওখান থেকেই উনি প্রবলেম সেট্ করেন।
এখন প্রশ্ন হল, এই বইটা কার লেখা?
সিনিয়র দাদাদের জিজ্ঞাসা করলে হয়না? আমি প্রশ্ন করলাম।
"মাক্রামি করিস না", কল্যান ধমক দিল। তাহলে এদ্দিনে জেনেই যেতাম। ওরাও Bannister and Raymond পড়েছে আর আমাদের মতনই বাঁশ খেয়েছে।
তাহলে? কি করা যায়!
কল্যান বলল - ভাবো, ভেবে বার কর কি করা যায়। সব আমি ভাবব নাকি?
কেউ কিছু সদুত্তর দিতে পারলাম না। সেদিনের মতন ভগ্ন-হৃদয়ে আমাদের পলিটব্যুরো মিটিং শেষ হল।

[3]

পরেরদিন কলেজ গিয়ে শুনি ক্লাস হবে না। JUTA র কিসব মোরচা, টোরচা আছে। ব্যাস, আমরা ছাড়া গরু।

একদল ছিল তাশুড়ে, তারা দৌড়ল সত্যেনদার ক্যনটিনে,

২৫ - আছি, ২৬ - আছি, pass double করতে।

আর একদল, তাদের আবার কলা, ললিত কলায়, প্রচুর আর্কষণ, তারা গেলেন Aminity Center. Richard সাহেবের অধিনায়কত্বে। তাদের আকর্ষণ চরিতার্থ করতে।

আর আমরা কয়েকজন, না ঘরকা না ঘাট্কা, চা ও সিগারেট সহযোগে সত্যেনদার ক্যনটিনের দাওয়ায় বসে আড্ডা মারার তাল করছি।

হঠাৎ দেখি কল্যান কলেজে ঢুকছে। আমাদের দেখে একগাল হেঁসে, সামনে এসে বলল - হয়েছে!

আমি বললাম - কি হয়েছে?

Plan, আমার মাথায় একটা plan এসেছে শোন্!! .....

ভোলাবাবু বসতেন চারতলায়।

লিফ্ট থেকে বেড়িয়ে, বাদিক ঘুরে আবার বাঁয়ে মোচর মেরে, ছয় পা গেলেই, বাঁ হাতে একটা L-shaped লম্বা corridor. প্রায় ১২০ ফিট লম্বা, তারপর ডানদিকে গেলে আর ত্রিশ ফিটের। শেষে ছিল আমাদের সার্ভে স্টোর।

ওই লম্বা corridor এর মাঝামাঝি (৬০ ফিট), ভোলাবাবুর ঘর। দরজা খোলা থাকলেও, সামনে চুলকাটার সেলুনের মতন একটা swing door আছে। আমরা ওই দরজার সামনে দিয়ে মাঝে মাঝে পা টিপে টিপে যেতে গিয়ে ওই swing gate এর এক চিলতে ফাঁক দিয়ে দেখতাম ভোলাবাবু কাজে নিমগ্ন।

কল্যান বলল - শোন্, পরশু আমাদের সার্ভে প্র্যাকটিকাল ক্লাস আছে, যখন স্টোর রূমে equipment আনতে যাবি, ঠিক তখন আমি স্যারের ঘরে একটা সোজা অংক নিয়ে ঢুকব, বলব স্যার পারছিনা দেখিয়ে দিন।

আর তোরা, তখন বাইরে একটা কিছু নিয়ে ঝগড়া শুরু করবি। প্রচুর চিল্লাবি, তার পর যা হবার কথা, সেই সুযোগাই আমার প্ল্যানটা execute করতে হবে।

শুনে আমরা প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে পরলাম। কখন কল্যান ঢুকবে, তার কতক্ষন বাদে আমরা চিৎকার শুরু করবো, কেউ জিজ্ঞেস করলে কেন এত শব্দ করেছিলাম , তাহলে, তার কি জবাব দেব এইসব নানা খুটি নাটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিলাম।

ব্যপারটা এতটাই সিরিয়াসলি নিয়ছিলাম যে পরেরদিন C-2-9 এ গিয়ে, কি ভাবে ডায়লগ দেব, কি বলব ইত্যাদি ইত্যাদি তার একটা/দুটো মহড়াও হল চুপি চুপি, আমার নির্দেশনায়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শুরু হল আমাদের যাত্রাপালা। আমি দাঁড়ালাম L লবির সংযোগস্থলে, যেখান থেকে কল্যান কে দেখতে পাচ্ছি খাতা হাতে রেডি (নিচু হয়ে swing door এর নীচ দিয়ে কি যেন দেখল, আর আমায় হাত নেড়ে জানাল সব ঠিক আছে)। ওদিকে বাকি ছেলেরা সার্ভে ঘরের সামনে রেডি।

মন্টুবাবু আমাদের সার্ভের টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট, এসে যন্ত্রপাতি দিতেই, অশোক আমায় চোখ টিপে জানাল ওরা রেডি। আমি আমার ডান হাত তুলে কল্যান কে ইশারা করলাম Get going । কল্যান দেখলাম কপালে হাত ঠেকিয়ে ইষ্টনাম স্মরণ করে স্যারের ঘরে ঢুকে গেল।

আমি ঠিক ঘড়ি ধরে ২০ সেকেন্ড বাদে, বাঁ হাতে ইশারা করলাম - চালু করো।

ব্যাস চালু হল ....

- আরে আরে, করিস কি, আমাদের theodolite নিচ্ছিস কেন? ওটা আমরা calibrate করে রেখেছি।

-- আমাদের আবার কি রে? তোর নাম লেখা আছে নাকি?

-- এই খবরদার!! আমার level staff এ হাত দিবিনা (এর মধ্যে আমিও সেই হট্টগোলে জুটে গেছি)।
শব্দ একটু বেশিই করে ফেলেছিলাম বোধহয়, তবে বেশিক্ষন নয়, মিনিট দুয়েক হবে।
স্যার এসে হাজির, 'কি ব্যপার এত চিৎকার কিসের?', স্যারের প্রশ্ন চাবুকের মতন আঁছড়ে পরল আমাদের উপর।
অর্ণব একটু ঢোক গিলে একটু তুতলে শুরু করল (শম্ভু মিত্র সে অভিনয় দেখলে যারপরনাই খুশি হতেন)
-- না মানে ইয়ে স্যার-
দেখুন না, এই theodolite টা আমরা আগের দিন ব্যালান্স করে গেছি,এটা দিয়ে কাজ করছিলাম----
-- ছি ছি ছি, তোমাদের লজ্জা করে না? আজ বাদে কাল ইনজিনিয়ার হয়ে পাশ করে বরোবে ,আর আজ এইরকম ছেলেমানুষের মতন ঝগড়া করছ?
কবে বড় হবে? সত্যি তোমাদের নিয়ে আর পারা যায় না!!
এই রকম নানা বাক্যবাণে আমাদের জর্জরিত করে, অবশেষে - যাও, নীচে গিয়ে কাজ করগে। একদম আর গোলমাল করবে না।
না, এইসব বাঁদড়ামির মত লঘুপাপে স্যার কখনও গুরুদন্ড দিতেন না।
আমরা সবাই তখন sorry sir, sorry sir করতে করতে পাসের সিড়ি দিয়ে নিচে নেবে গলাম।
যাত্রা তো উৎরে গেল, কিন্তু কল্যান কোথায়?
সেদিন আমাদের High voltage bldg সার্ভে করার কথা। Bldg এর পেছন দিকে (অর্থাৎ সিভিল Bldg. এর সামনের দিকে), যন্ত্রপাতি রেখে এদিক ওদিক করছি। কল্যানের জন্য উৎকণ্ঠাও হচ্ছে, ব্যটা ধরা পরে গেল না তো?
হঠাৎ দেখি বাবু Bldg থেকে বেরোচ্ছেন। আমাদের দেখে একগাল হাঁসি। একেবারে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার, যেন এইমাত্র পুরুকে বন্দি করে ফিরলেন।
খস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল
-- হয়েছে, নাম তার নটরাজন্।
আমরা ঘিরে ধরলাম, কল্যান শুরু করল :
তোদের হল্লা করার timing খুব ভাল ছিল, স্যার সবে অংকটা দেখছেন, তখনই তোরা বাওয়াল চালু করলি।
ভোলাবাবু ভীষণ চমকে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন - কি ব্যাপার এত গোলমাল কিসের?
আমি ন্যাকা সেজে বললাম -- জানি না তো!
উনি হন্তদন্ত হয়ে বেড়িয়ে গেলেন। আলমারি টা খোলাই ছিল, আমি আগে দেখে রেখেছিলাম (তখন বুঝলাম স্যার নিচু হয়ে কি যেন দেখছিলেন আমার ঢোকার আগে), উনি বেরিয়ে যেতেই আমি আলমারির ভেতরে উঁকি মারলাম। অনেক বই আর কাগজ। নিচের তাকে দেখি ২ টো সার্ভের বই রাখা। একটা David Clarke, আরেকটা হচ্ছে Advance Geodetic Survey by Natarajan, খুলে দেখি প্রচুর অংক কষে দিয়েছে। পরীক্ষায় যে দুটো চ্যাপ্টার ছিল, সেই চ্যাপটার দুটোর শেষে দেখলাম অনেক অঙ্ক, কষে দেওয়া আছে। আমার সন্দেহ ঠিক। উদাহরণ মালার তিন নম্বর অংকটা স্যার এবার দিয়েছিলেন পরীক্ষায়।
ব্যাস, আমি বইটাকে সযত্নে যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিলাম।
চেয়ারে গিয়ে চুপচাপ বসলাম।
স্যার ফিরে এসে তোদের হয়ে আমাকেও খানিকটা ঝাড়লেন।
-- তোমরা কি বলত? দুদিন বাদে পাশ করে বেরোবে, এখনও ছেলেমানুষি গেল না! কই দেখি কি অংক এনেছ দাও?
উনি খুব যত্ন করে অংকটা করছেন, আমার তো শালা মাথায় কিছুই ঢুকছেনা। খালি হ্যাঁ হ্যাঁ করছি।

অংক শেষ করে কাগজটা আমায় দিয়ে দিলেন। আমি পালিয়ে এলাম।
আমরা উল্লাসে ফেটে পড়লাম, operation 100% sucessful.
কে যেন বলল (বোধহয় তাপস) ,তাহলে চল শিগগিরী Study (Jadavpur Central Market) তে, বইটার অর্ডার দিয়ে আসি।
কল্যান খ্যাঁক করে উঠল। খবরদার যাবিনা। ওই লোকটা প্রায়ই Department আসে স্যারদের বই গছানোর জন্য।
যদি পচিশ ত্রিশ কপি অর্ডার হয়, ভাববে কলেজ বোধহয় এখন, এই বইটা follow করবে, নির্ঘাত library যাবে এই বইটা গছাতে, তারপর ভোলাবাবুর কানে যাবে, সব লিক্ হয়ে যাবে। ঐখানে যাওয়া চলবে না। তার থেকে চল, শনিবার college street 'রকমারি' থেকে বইটা কিনব।
দৌঁড়ালাম কলেজ street. মাল পাওয়া গেল (তখন শুনলাম ওটা BE college follow করে)।
আহা কি বই, প্রচুর অংক কষে দিয়েছে, প্রত্যেক টাইপের অংক একেবারে ধরে ধরে করে দিয়েছে। যে রকমটা আমরা চাই (Electrical এর থেরেজার বই এর মতন)।
এবার আমাদের বিপ্লব একদম ঝড়ের গতিতে ছুটল, যেন Comrade মাও সে তুং এর cultural purging, প্রায় সব অংক যা ছিল ওই বইতে, কষে ফেলা হল।
দ্বিতীয় আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন হল। সব অংক এবার জানা। স্যার বোর্ডে অংক লিখছেন, কল্যান বিড় বিড় করে বলছে, ছয় নম্বর chapter এর উদাহরন মালার ৪নং অংক। উত্তর হল, ১২৩.৬৮ কি মিঃ।
- আর Declination of sun হল 18 degree 16 min 23 sec, শান্তনু যোগ করল।
ফল বেরোতে ভোলা বাবু অবাক।
সবার নম্বর ৪২ এর উপর!!! কলম ঠেকানোর যায়গা নেই।
-- Strange!! তোমরা তো দারূণ পরীক্ষা দিয়েছ!
কল্যান একগাল হেসে চোখ কুঁচকে বলল,
-- তব্বে স্যার! শুধু সারাদিন আড্ডা আর ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ালে চলবে? আমরা পড়াশোনা করেছি!!
ভোলাবাবু চুপ!

ঘটনার আর বিশেষ বাকি নেই। শুধু একটা জিনিস না বললেই নয়, আমাদের ব্যাচ বোধহয় প্রথম, যারা জিওডেটিক সার্ভে সবাই পাশ করেছিল, কেউ সাপ্লি পায় নি।
Result দেখে সারা department তাজ্জব, বোধহয় ভোলাবাবুও।

আমাদের অমল বাবু স্যার

Indrajit Chowdhury

আমাদের হাইওয়ে ও রেল ইনজিনিয়ারিং পড়াতেন, প্রফেসর অমল কুমার সিনহা, আমরা বলতাম AKS. উত্তর কোলকাতার বাসিন্দা, শুনেছি রাজা নবকৃষ্ণ দেব স্ট্রিটে বাড়ি।

স্যারের চেহারাটা কিন্তু বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। ছিপছিপে, প্রায় ছয় ফিটের কাছে গৌরবর্ণ চেহারা। উনি যে উত্তর কোলকাতার কোন অভিজাত, বনেদি বংশোদ্ভূত, সেটা ওনার চাহারা দেখলেই বোঝা যেত। নির্বিবাদী মানুষটি ট্রেনে করে কলেজ আসতেন নিজের মতন ক্লাস নিতেন কোন সাতেপাঁচে থাকতেন না।

শুনেছি আমাদের কলেজ থেকেই BE করে Durham (UK) থেকে হাইওয়ে তে PG ডিপ্লোমা করেছিলেন। ডিপার্টমেন্ট এ উনিই একমাত্র হাইওয়ে র ব্যাপারে বাতি ধরার লোক এবং আমাদের মতন মুর্খ দের এ ব্যাপারে জ্ঞান বিতরনে পারদর্শি।

যে দুটো বই আমাদের পড়তে বলতেন, তা হল Highway Engineering by Sehgal and Bhanot and Railway Engineering by Rangawalla, আমার বইদুটো একেবারেই ভালো লাগতো না, খবর নিতে গিয়ে এর থেকেও দুটো ভাল বইএর সন্ধান আমি পেয়েছিলাম।

Class এ এসেই বলতেন, course is long time is short, you have to study fast. এই বলে বই থেকে খানিকটা গড় গড় করে পড়তেন, খানিকটা বোর্ডে লিখতেন।

আমরা খুব একটা মন দিতাম না, কারন সিনিয়র দাদারা যা উপদেশ দিয়েছিল তাতে মন দেবার বা পড়ার কোন দরকার ছিলো না।

এবিষয়ে, আমাদের আভ্যন্তরিন মূল্যায়নের দুদিন আগে উনি একটা রিক্যাপিচুলেশন ক্লাস নিতেন। সেখান বই ধরে কোন কোন সেকসন গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের দাগিয়ে দিতেন। কাজেই আমরা বুঝে যেতাম ওই গুলোর থেকেই প্রশ্ন হবে।

নাঃ, আমরা ওই চ্যাপ্টারগুলো মোটেই পড়ে/দেখে আসতাম না, দাদাদের নিষেধ ছিল।

ছেলেরা ঐ সেকসন গুলো, বন্ড সিটে যত্ন করে লিখে আনত (ওটাই উত্তরপত্র), তারপর পরীক্ষার প্রশ্ন অনুযায়ী সেই সেই পাতাগুলো স্টেপল করে নাম লিখে জমা দিলেই হল।

আর একটু খুলে বলি। ধরা যাক, এল Describe the utility, adaptability and sustainability অফ highway geometric design?

ওই utility হচ্ছে section 2.1, adaptability section 2.2 আর বাকিটা section 2.3, যা দাগান আছে। তাই আগে থেকে লেখাও আছে। Just ওই তিনটে প্রচ্ছদ স্টেপল করে জুড়ে দিলেই কাজ শেষ।

সিভিল ডিপার্টমেন্টএর এটা সবচেয়ে গুপ্তকথা, কিন্তু সর্বজন বিদিত। এ ট্র্যাডিশন বহু ব্যাচানুক্রমে চলেছে।

প্রথম মূল্যায়নের আগে আমি এক মূর্খামি করে বসলাম। পড়াশোনায় বিশাল কিছু ছিলাম না, আবার, হাঁদাগঙ্গারামও ছিলাম না। কোনদিন সাপ্লি পাই নি। ক্লাসের প্রথম দশজনের মধ্যে থাকলেই খুশি। ক্লাব ক্রিকেট খেলতাম, মাঝে মাঝে, রং মেখে সং সেজে বাদলদার (সরকার), সাথে মঞ্চেও নেবে পড়তাম। সিভিল পড়ি বলে একটু বেশীই স্নেহ পেয়েছি ওনার থেকে।

স্যারেরা অনেকে আমার এই সব কীর্ত্তিকলাপ জানতেন বলে সামান্য হলেও প্রশ্রয়ও পেয়ছি, সেটা আমার কাছে একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল। তাই কোন আচরণ বিধি লঙঘন করে তাদের বিরাগভাজন হব, সেটা আমার কাছে ভয়ংকর ব্যাপার ছিল।

কাজেই আমি বেঁকে বসলাম। না, আমি যা পারব তাই লিখব ওই স্টেপলার পরীক্ষা আমি দেবনা ।

এই নিয়ে আমার সহপাঠী কল্যান এর সাথে খানিকটা ঝগড়াও হয়ে গেল।

কেন দিবি না? কোন ধর্মরাজ তুই?

বোকামি করিস না ভাই, প্রথম পরীক্ষা খারাপ হলে হেব্বি চাপে পরে যাবি।
আর আমার এক কথা - আগে খারাপ হয় কিনা দেখি, তখন দেখা যাবে। আমি নিজেই লিখব।
কল্যান শেষ পর্যন্ত রেগে মেগে আমায় যা মরগা যা, বলে আরো কিছু চোস্ত গাল দিয়ে বাড়ি চলে গেল।
প্রথম ক্লাসটেস্ট এল। ৪০ মিনিটের পরীক্ষা, কুল্লে সময় পাওয়া যায় ৩০ থেকে ৩৩ মিনিট। প্রশ্ন কঠিন কিছু নয়, সেই দাগিয়ে দেওয়া chapter এর মধ্যেই। কিন্ত্ত ওইটুকু সময়ে কত আর লেখা যায়। বন্ড পেপারের পৃষ্ঠা চারেক হল। একটা ছবি আঁকতে দিয়েছিলেন। যে পেন দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিলাম সেটা দিয়ে যথা সম্ভব পরিষ্কার করে আঁকলাম (সময় ও কম)। মোটের উপর ভালোই দিলাম। পরীক্ষা শেষ হবার আগে স্যার একবার চেঁচিয়ে বললেন, time is nearly up.অমনি শুনলাম চারিদিকে কুটুস কুটুস করে আওয়াজ, সহপাঠীরা, স্টেপলার দিয়ে পাতা জুড়ছে।
কদিন পর পরীক্ষার ফল বেরল। সকলেই ৪৩-৪৪/৪৫, খালি আমি ৩০/৪৫। বেশ রাগ হল। এত খেটেখুটে পরীক্ষা দিলাম, মাত্র ত্রিশ পেলাম?
AKS কে গিয়ে বললাম --
স্যার এতকম পেলাম কেন? আমি কিছু ভুল লিখিনি।
এই নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে স্যারেরা কিন্তু অসম্ভব স্বচ্ছ ছিলেন।
হয়ত শক্ত প্রশ্ন করেছেন, বাঁশ খেয়েছি সেটা অন্য কথা, কিন্তু নম্বর দেবার ব্যপারে আন্যায্য নম্বর দিয়েছেন - না এরকম কক্ষণো দেখিনি।
কাজেই প্রশ্ন করতেই স্যার খাতা বার করে হাতে দিয়ে বললেন তুমি নিজেই দেখ কি লিখেছ। আমি তো ভালোই জানি। দেখলাম উত্তরের ওপর লেখা answer too short. , আর ছবির ওপর লেখা, OK, but expect better sketch.
এরপর কোন একটা ৪৩/৪৫ খাতা বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এবার তুমিই দেখ তোমার বন্ধু কিরকম লিখেছে।
উত্তরপত্র ষোল পাতা !!!
গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, কোন শব্দ কাটা নেই। একটা দুটো যায়গায় সামান্য, সেটাও আবার whitener দিয়ে সংশোধন করা। একেবারে গোবর জলে নিকোনো মাটির দাওয়ার মতন ঝকঝকে তকতকে।
আর ছবি? একেবারে সেই মান্না দের গান -
লাল নিল সবুজের মেলা বসেছে।
বিভিন্ন রংএর ফেল্টপেন দিয়ে একেবারে ঝিনচ্যাক্ স্কেচ।
ওটা ইনজিনিয়ারিং পরীক্ষার উওরপত্র না যামিনী রায়ের ছবির বিজ্ঞাপন, ঠাওর করা শক্ত!
তুমিই দেখ তোমার বন্ধু কিরকম লিখেছে।
আমার এরপর যে প্রশ্নটা করা উচিত ছিল, তা হল, স্যার, কেউ কি ৩০ মিনিটে ১৬ পাতা লিখতে পারে, আর ওইরকম ছবি আঁকতে পারে?
এটা কি সম্ভব?
কিন্তু আমি বলতে পারব না। তাহলে বন্ধুদের সাথে সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতা হয়। সে আমার দ্বারা মরে গেলেও হবেনা। তাই খানিক মাথা চুলকে, ঠিক আছে স্যার বুঝেছি বলে ব্যজার মুখ করে ওনার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।
কপাল খারাপ, বেরিয়েই একেবারে বাঘের মুখে।
কল্যান --
এই যে ধর্মপুত্তুর!! হয়েছে তো? শখ মিটেছে?
না, আমি লিখে আনব না। আমি নিজে লিখব, রাজা হরিশচন্দর আমার। কি লাভ হল? খামাকা পরীক্ষা টা খারাপ দিলি তো?

ঐইসব বলে খুব ঝাড় দিল, আমি চুপ। তারপর পরম মমতায় আমার গলা জড়িয়ে নরম গলায় বলল ছাড়! যা হয়েছে ভুলে যা। পরের দুটোয় আমাদের মতন চল কোন ব্যপার নয় বুঝলি। এসব পাগলামি করিস না।
এই বলে আমায় টানতে টানতে নিচে সত্যেন দার ওখানে নিয়ে গেল, এবং নিজের পয়সায় চা ও সিগারেট কিনে আমায় খাইয়ে, মন ভালো করার চেষ্টা করতে লাগল।
হ্যাঁ আমাদের বন্ধুত্ব টা এরকমই ছিল। শুধু নিজে ভালো করেই খান্ত থাকতাম না, কেউ খারাপ করে ফেললে, তার জন্য যৎপরনাস্তি উৎকন্ঠিত হতাম ও তাকে টেনে তুলতে সব রকম সচেষ্ট হতাম। The spirit survives till date।
আমিও তখন ভেবে দেখলাম, আমার এই অনাবশ্যক সততার কোন মূল্য নেই, মারই খাব, লাভ কিছু হবেনা মাঝখান থেকে রেজাল্ট ঝুলবে। কাজেই পরের বার থেকে আমিও যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার।
নাঃ আর কোন সমস্যা হয়নি।
এতবড় মুখবন্ধটা লিখলাম এই কারণে যে AKS কে নিয়ে একটি মজার ও অত্যন্ত খোড়াকের ব্যাপার হয়ছিল, এখন সে কথা।

অমলবাবুর হাইওয়ে
Indrajit Chowdhury

[১]

সেদিনটা ছিল সোমবার,। নভেম্বর মাস পড়ে গিয়েছে, কালি পুজো, ভাইফোঁটা সব শেষ। আশির দশকের গোরা। শহরে তখন এত দূষণ ছড়ায়নি। তাই, তখনই শীত গুটি গুটি পায়ে এসে হাজির। ভোর রাত্রে একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমাতে আরাম লাগে। সন্ধেবেলা, একটা হালকা হাতকাটা গরম জামা পরলে ভালো লাগে , যদিও মধ্যাহ্নে ভালোই গরম থাকে।
সেদিন বেলা এগরোটা হবে। আমি ও আমার সহপাঠী তাপস সেই ভাঙ্গা সাঁজোয়া গাড়িটির উপর বসে সিগারেট ফুকছিলাম। দশটা কুড়ির ক্লাস হয়ে গেছে, এগারোটা দশের ক্লাস সেদিন কোন একটা কারণে হয়নি, তারপরেই সোম (পিযুষ) স্যারের ক্লাস, দেরি করে ঢোকার জোটি নেই। কাজেই চটপট একটা সাদা কাঠি ফুকে ক্লাসে ফেরত যাব, এই ছিল অভিপ্রায়। তাপস, অমল স্যরের মতন উত্তর কলকাতার ছেলে। নারায়ণ গাঙ্গুলী সৃষ্ট সেই অমর চরিত্র টেনিদার পাড়ার অর্থাৎ পটলডাঙার ছেলে।
পরীক্ষায় গুচ্ছ গুচ্ছ নম্বর তুললে কি হবে, ওর মতন ফিচলে বুদ্ধি কল্যান ছাড়া আর কারোর ছিল না। ক্লাসে যত ক্যাচাল হত, এরা দুজনেই ছিল তার মাথা আবার ত্রাণকর্তা ও বটে। আরাম করে সিগারেট খাচ্ছিলাম, তাপস হঠাৎ বলল - ইন্দ্র সিগেরেট টা চাপ, স্যার আসছেন।
আমি চট্ করে ওটা হাতের তালুতে লুকিয়ে দেখি, AKS স্যার আসছেন। এ আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যপার!
গাড়িটা গেটের পাশেই পড়ে থাকত, সকলের যাওয়া আসার পথে, কোন না কোন স্যার যেতেই থাকতেন। তবে ওখানে আমাদের সিগারেট খাওয়া নিয়ে ওনারা কখন আপত্তি করেন নি।
স্যারেরা অনেকেই ধূমপান করতেন, নিজের অফিসে বসেই করতেন, এবং এ ব্যপারে ওনাদের একটা অব্যক্ত প্রশ্রয়ই বরং ছিল বলব।
হয়ত ভাবতেন, তাড়িয়ে দিলেতো অন্য যায়গায় গিয়ে বাঁদড়ামি করবে, তার থেকে যা ডেপোঁমি করে , চোখের সামনেই করুক, তাহলে মাত্রার মধ্যে থাকবে।

হাতের তালুতে সিগারেট লুকিয়ে দাড়িয়ে আছি, হাতে অল্প অল্প ছ্যাঁকা লাগছিল, তাই চট্ করে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলাম স্যার কদ্দুর। দেখলাম প্রায় এসে গেছেন। আমাদের কাছাকাছি এসে একবার মুখ তুলে আমাদের দেখলেন, বিশেষ করে তাপসকে, তারপর চট করে মাথাটা নাবিয়ে, অন্য দিনের থেকে একটু যেন দ্রুত পদেই ডিপার্টমেন্টে ঢুকে গেলেন।
সিগারেট টায় শেষ টান দিয়ে ফেলতে যাব, দেখি তাপস ওর সিগারেটটা ঠোঁট দিয়ে হিন্দি সিনেমার সেই ভিলেন প্রানের মতন ধরে, ঢুলু ঢুলু চোখ করে মিচকি মিচকি হাসছে। ওর ওই হাসি আমি জানি, নির্ঘাৎ মাথায় কোন বিটলেমি বুদ্ধি চেপেছে।
আমি বললাম - অ্যাই, ওরকম করে হাসছিস কেন রে? কি হয়েছে?
ও একটু চাপা গলাতেই বলল-
কাল একটা ব্যপার হয়েছে বুঝলি।
আমি না কাল হাতিবাগান বাজারে গিয়েছিলাম মাছ কিনতে (না খাবার মাছ নয়, লাল নীল আকোয়ারিয়ামের মাছ, ও পুষত)।
- গিয়ে দেখি AKS ও বাজারে গেছেন।
আমি বললাম- তা সে তো যেতেই পারেন, তো কি?
ও বলল না, সে ঠিক আছে, কিন্তু ওনার সঙ্গে না একটি মেয়ে ছিল, জানিনা ওনার নিজের মেয়ে না ভাইঝি টাইঝি কেউ।
কিন্তু কি বলব ইন্দ্র, ওঃ -একেবারে চাম্পি মেয়ে, যাকে বলে বীভৎস সুন্দর!!

এইখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, তাপসের ওই চাম্পি কথাটার মধ্যে কোন, অশিষ্টাচার বা অশালীন ইঙ্গিত খুজবেন না।
চাম্পি কথাটা আমরা ব্যবহার করতাম চ্যামপিয়ন কথাটার অপভ্রংশ হিসেবে।
কোন ছেলে বা মেয়ে যদি দেখতে সুন্দর হয়, লেখাপড়াতেও চৌকস , আবার গান, বাজনা, খেলাধুলাতেও ভালো, ভদ্র শালিন ব্যবহার, যাকে বলে সর্বশ্রী, এদেরকে আমরা চাম্পি ছেলে/মেয়ে বলতাম। কাজেই তাপসের এই বিশেষণে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমভ্রমের মিশ্রণ ছিল।
তবে হ্যাঁ, ওর ওই বীভৎস সুন্দর ব্যপারটা, নিঃসন্দেহে গবেষণার বিষয়!!
বীভৎস কি করে সুন্দর হয়, সেটা আমার জ্ঞানের বাইরে।
কিন্তু ঐধরনের অক্সিমোরন উদ্ভাবনে ওর জুড়ি কাউকে দেখিনি।
কারোকে একবার দেখে বলেছিল- উফ্ উৎকট রকম সুন্দর!!
সে যাই হোক, আমি প্রশ্ন করলাম
তারপর কি হল?
তারপর ? আমি ভাবলাম স্যারের সাথে ওটা কে রে? একটু সামনে গিয়ে দেখি।
ভাবলাম, স্যার কে গিয়ে একটা সেলাম ঠুকে "গুড মর্নিং স্যার" করি। কলা বেচাও হবে আবার রথ দেখাও হবে।
কিন্তু বুঝলি, কপাল খারাপ। সবে দুপা এগিয়েছি, স্যার ঘাঁড় ঘূড়িয়ে আমায় দেখে ফেলেছেন!!
তারপর?
তারপর আর কি?
স্যার ঝট্ করে মুখটা ঘুরিয়ে মেয়েটাকে বললেন, চল চল এখন এইসব চুড়ি টুড়ি দেখতে হবে না।
এই বলে মেয়েটিকে প্রায় বগলদাবা করে ঝাঁ করে কেটে পড়লেন।
তা তুই কি করলি তখন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।
কি আর করব? ক্যালানের মতন একটু দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর মাছের দোকান গেলাম।
দারুণ মিস্ হল রে, অসহ্য রকম ভালো দেখতে (আবার অক্সিমোরন) !!

তাপসের কথায় অবিশ্বাস্য কিছু ছিল না। উত্তর কলকাতার বনেদী বংশের খানদানী সুন্দরীদের সম্বন্ধে আমার সামান্য অভিজ্ঞতা ছিল কাজেই ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে বলে আমার একেবারেই মনে হয়নি। যাইহোক, স্যারেদের ব্যপার, তাই ওকে সাবধান করে দিলাম।
যা হয়েছে, হয়েছে, আর খোঁচা খুঁচি করিসনা। তোকে বিশ্বাস নেই।
স্যরের পাড়ায় গিয়ে আবার ঘোরাঘুরি করে মোরনা যেন!!
প্রফেসর সোম জানতে পাড়লে কিন্ত্ত চামড়া গুটিয়ে রেখে দেবেন। এত ভালোবেসে ফেলবেন না, যে দশ বছরের আগে আর ছাড়বেন না।
তাপস মাথা ঝাকিয়ে বলল- দূর!! পাগল নাকি, ওইসব কেউ করে নাকি? তবে, সেদিন স্যার আমায় দেখে যেরকম হাঁকপাঁক করে পালালো না, তাতে, একটা মৎলব মাথায় এসেছে, দেখনা স্যারকে কিরকম একটু ল্যাজে খেলাই।
আমি বললাম দেখো বাপু ল্যাজে খেলাতে গিয়ে তোমার নিজের ল্যাজে আগুন লেগে লংকাকান্ড যেন না হয় সেটা খেয়াল রেখো।
ও হেসে জবাব দিল - কিস্‌সু হবেনা! দেখনা।

[২]

আমরা যখন,course is long and time is short করছি, আর ক্লাস টেস্টে রং বেরংয়ের ফেল্ট পেনের বাপান্ত করছি, সেই সেমেস্টারে, আমাদের আর একটা বিষয় পড়তে হত।
সেটার নাম হচ্ছে Building Planning and estimation ।
এখন ফিরে তাকালে, জিনিসটা অতি সাধারণ মনে হ্য। তখন কিন্তু বেশ আকর্ষণীয় লাগত, অন্তত আমার কাছে।
এটা সেসনল কেন্দ্রিক বিষয় ছিল।
দুজন সিনিয়র ও দুজন জুনিয়র টিচর আমাদের কাজের দেখাশোনা করতেন।
এঁরা হলেন AKS, প্রফেসর অলোক দে, আর জুনিয়র দের মধ্যে ছিলেন অমল মিশ্র স্যার, আর আরেকজন কে, ঠিক মনে নেই। খুব সম্ভবত ফাল্‌মুনি দা (ভট্টাচার্য), তখন সবে কলেজে যোগ দিয়েছন।
স্যারেরা আমাদের প্রত্যেককে আলাদা করে একটি ফ্লোর এরিয়া দিতেন, দিয়ে বাড়ির নক্সা বানাতে দিতেন।
কারোর দুটো শোবার ঘর, দুটো বাথরুম, রান্না ঘর, বারান্দা ইত্যাদি। কারোর বাকি সব ঠিক কিন্ত্ত অধিকন্তু ঠাকুর ঘর।
আসলে স্যারেরা চেষ্টা করতেন কাজটা প্রত্যেকের যথাসম্ভব আলাদা হতে, যাতে আমরা নিজে থেকে করার চেষ্টা করি (কাঁচ না মারা যায়)।
আমরা প্রথমে একটা A4 size কাগজে একটা রাফ স্কেচ করে, আনুমানিক মাপ দিয়ে স্যারেদের দেখাতাম। ওঁরা সেটা দেখে কিছু মন্তব্য করতেন।
আমরা সেই মন্তব্য অনুযায়ী কিছু সংশোধন বা পরিবর্তন করে আবার দেখাতাম। সেবার সামান্য কিছু সংশোধন হয়ত এল। এইবার যেহেতু নক্সাটা চুড়ান্ত রূপ নিয়েছে, স্যারেরা অনুমতি দিতেন A1সাইজ ড্রয়িং শিটে সেটা আঁকতে এবং সেই ড্রয়িং অনুযায়ী কত ইঁট, বালি, সিমেন্ট লাগবে তার হিসেব জমা দিতে। আমার ব্যাপারটা বেশ ভালোই লাগত, বেশ একটা সিভিল সিভিল গন্ধ ছিল।
প্রথম প্রথম জমা দিলে স্যারেরা যে মন্তব্য গুলো করতেন সেগুলো বেশ মজার ছিল। হয়ত ইচ্ছে করেই ওরকম মন্তব্য গুলো করতেন যাতে ভুলগুলো মনে থাকে , এবং ভবিষ্যতে আর না হয়।
কেউ ধরূন রান্নাঘরটা প্রয়োজনাতিরিক্ত বড় করে ফেলেছে, তো কমেন্ট এল -
তোমার রান্নাঘর তো মোহনবাগান মাঠ ভাই, বলি IFA শীল্ড ফাইনাল হবে? নাকি?

কারোর বাথরুম খুব সরু হয়ে গেছে, তো কমেন্ট এল- হ্যাঁ হে, স্নান করতে গেলে তো কনুই ছেঁচে যাবে যে? বা ঠাকুর ঘর তো সংঘশ্রীর পুজো মন্ডপ ইত্যাদি।
ওনারা কিন্তু উত্তরটা বলতেন না, আমরাই কোড ঘেঁটে, Architecture এর সহপাঠী দের সাথে আলোচনা করে উত্তরটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতাম তাতে আমাদের শেখাটা ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে পোক্ত শেখা হত।
আমার কাজটার দেখাশোনা করছিলেন AKS স্যার। তার আগে দুবার আলোচনা হয়ে গেছে। সামনে শীতের অল্প কদিন ছুটি, তার আগে কাজ জমা দিতে হবে।
আমার কাজ ও হিসেব শেষ। বগলে রোল করা ড্রয়িং সিট, আর হাতে estimate এর কাগজ নিয়ে AKS এর ঘরে ঢুকছি কাজ জমা দেব বলে।
তাপস কখন আমার পিছন পিছন ঘরে ঢুকেছে আমি খেয়াল করিনি (ওর অন্য গ্রূপ)।
আমায় দেখেই স্যার বলে উঠলেন -
কাজ জমা দেবে? যাও ওই টেবিলে রেখে দাও, বলে ঘরের কোনে একটা টেবিল দেখিয়ে দিলেন।
আমি টেবিলে কাগজ জমা দিতে দিতে শুনছি উনি কাউকে বলছেন - হ্যাঁ বল, তোমার কি চাই?
ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখি তাপস ভিজে বেড়ালের মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।
স্যার দুমিনিট সময় দিতে পারবেন, একটা advice নেবার ছিল।
বল?
হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম কি, এইযে আপনি Roads পড়াচ্ছেন না স্যার, আমার দারুন interesting লাগছে, বিশষতঃ highway geometric design। অনেক ভাববার ব্যপার আছে।
স্যার- ইয়ে, হ্যাঁ সে তো আছেই।
হ্যাঁ স্যার, যত পড়ছি তত ভালো লাগছে, আপনার পড়ানোর style ও ফাটাফাটি।
স্যার আর কি বলবেন? গ্যাস দিলে দেবতারাও তুষ্ট হন, কুত মানবঃ।
তাই বুঝলেন স্যার, আমি ভাবছি, এই হাইওয়ে নিয়ে ME করব।
সে তো খুব ভালো কথা ।
হ্যাঁ স্যার, সেই জন্যই তো ব্যপারটা in depth বোঝার চেষ্টা করছি, কিন্তু স্যার একটা মুশকিল হল যে - তাপশ মুখটা খুব করুণ করে বলে।
কি মুশকিল?
আমাদের কলেজে তো হাইওয়েতে ME পড়ান হয় না।
তাই বলছিলাম স্যার, এই হাইওয়ে নিয়ে কোথায় ভালো ME পড়ান হয় যদি একটু বলে দেন -
তা BE কলেজ দেখতে পার, ওরা নতুন হাইওয়েতে ME চালু করেছে।
তাছাড়া IIT তো আছেই, খড়্গপুরে Prof. B.B. Pandey কে চিঠি লিখে দেখতে পার।
IIT? সে তো অনেক হাই ফাই ব্যাপার স্যার - তাপস মুখটা করুণ করে বলে।
আমি কি পারব?
কেন পারবেনা? পড়াশোনা মন দিয়ে কর, তাহলেই পারবে - স্যরের প্রফেসরোচীত উপদেশ।
হ্যাঁ স্যার, সে ত পড়ছি, কিন্তু স্যার কোথাও আটকে গেলে, বা বুঝতে অসুবিধা হলে আপনি যদি একটু হেল্প্ - তাপস চুপ করে যায়।
ছাত্র পড়বে বলে সাহায্য চাইছে, কোন শিক্ষক আর না বলবেন, তাই স্যারও না করেন কি করে, কাজেই -
তা বেশতো যদি কিছু আটকে যায়, এস দেখিয়ে দেব খন্।
ধন্যবাদ স্যার, - বলে তাপস এমন একটা মুখ করল যেন মাথা থেকে গন্ধমাদন পর্বত নেমে গেল।
কিন্ত স্যার আপনি সময় দিতে পারবেন কি?
স্যার একটু অবাকই , কেন? সময় -

না মানে বলছিলাম আপনি ব্যাস্ত থাকেন তো, ক্লাশের বাইরেও কত কাজ ধরুন মিটিং থাকে , খাতা চেক থাকে -
আমার কিন্তু খটকা লাগল। স্যার বজ্জাতি করছেন না তো?
তাপস বলে চলেছে- তাছাড়া ধরুন দুজনকেই একসাথে সময় বের করতে হবে। কিন্তু সেটা মুশকিল নয় কি?
আপনি যখন একটু free, তখন হয়ত আমার ক্লাস, বা পরীক্ষা, আবার আমার যখন একটু ফাঁক আপনি তখন, মিটিং ইত্যাদিতে ব্যস্ত। তাই বলছিলাম কি, আমি তো স্যার আপনার বাড়ির কাছেই পটলডাঙ্গা তে থাকি, তা শনিবার বা রবিবার যদি একটু সময় দেন, আপনার বাড়ি গিয়ে doubt গুলো পরিষ্কার করে নিতে পারি। বাড়িতে তো নিরিবিলি তে পড়াটাও ভালো হয়।
এই প্রস্তাবে স্যার একেবারে আঁক করে উঠলেন।
আ্যাঁ!! বাড়িতে??????
না না না, বাড়িতে নয়, বাড়িতে নয়, যা আলচনা সব - সব এখানে মানে, কলেজে হবে।
তাপস খুব শান্ত ভাবে বলে যাচ্ছে, স্যার আমার কিন্তু মনে হয় বাড়িই ভালো। আপনি হয়ত কিছু বোঝাচ্ছেন আমায় এখানে, কেউ assignment জমা দিতে এল, কেউ মিটিং করতে ডাকল, আরো কত কি, তার থেকে বাড়ি ভালো হত না?

এইবার আমি ব্যপারটা বুঝেছি সব ওর বান্ডেলবাজী।
স্যার কিছুতেই ওকে বাড়ি যেতে দেবেন না, আর তাপস বাড়ি যাবেই।
এদিকে আমার পেটে ছিপি খোলা সোডা বোতলের মতন হাসি উঠে আসছে হাসতেও পারছি, না আবার কৌতূহল টা এতটাই চেপে বসেছে যে যেতেও পা সড়ছে না।
একজন ভীষণ উত্তেজিত, আর একজন ততটাই শীতল। এরকম তরজা জীবনে খুব কম দেখেছি।
হঠাৎ স্যরের খেয়াল পড়ল আমি দাঁড়িয়ে সব শুনছি। ওনার হয়ত মনে হল একজন ছাত্রের সামনে আর একজন ছাত্র কে এভাবে না করাটা বোধহয় ওনার ইমেজকে খানিকটা মসীলিপ্ত করতে পারে। তাই স্যার তখন একটা মধ্যপন্থা নিলেন।
বললেন-
ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি পড়া চালু তো কর, পরে আটকে গেলে দেখা যাবে। এখন বাড়িতে রং, টং হচ্ছে, এখন সুবিধা হবেনা, তোমায় পরে বলব।
অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার বলে, তাপস কেটে পরল। আমিও - স্যার যাচ্ছি, বলে বেড়িয়ে এলাম।
বেড়িয়েই ওকে চেপে ধরলাম।
এই ব্যাটা, তোর মতলব কি রে?
তুই কি স্যারের বাড়ি যাবার তাল্ করছিস নাকি?
পাগল নাকি! স্যারকে স্রেফ ল্যাজে খেলাচ্ছিলাম। দেখলি না বাড়ি যাবার নাম শুনে ভুত দেখার মতন চমকে উঠলেন। দেখ্ না কিরকম চমকাই।
আমি বললাম ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যাচ্ছেনা?
ধর, যদি রাজী হয়ে যেতেন, আর বলতেন আচ্ছা এসো, তখন তুই কি করতিস?
তাপস একটু গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কোন চান্স নেই বস্ , সেদিন যেভাবে বাজারে হাওয়া হয়ে গেলেন, আমার হাজার বছরেও বাড়ি যাবার অনুমতি মিলবে না জানবি। সে আমি যতই চেষ্টা করিনা কেন।

এরপর শীতের অবকাশ পরে গেল, কাজেই ব্যাপারটা তখনকার মত থিতিয়ে গেল।
নতুন বছর কলেজ খুলল। জানুয়ারি মাস, সেবার জব্বর ঠান্ডা পড়েছে।

[৩]

আমাদের যথারীতি সেই সাঁজোয়া গাড়ির ওখানে গজেল্লা চলছে।
হঠাৎ দেখি তাপস সিগারেট ফেলে দিয়ে, রুমালে মুখ টুখ মুছে একেবারে সুবোধ ছেলে।
কি ব্যপার না AKS আসছেন।!
কাছে আসতেই একেবারে কান এঁঠো করা হাসি দিয়ে তাপস -
গুড মরনিং স্যার, ভালো আছেন?
স্যার একটা গলা দিয়ে ঘড় ঘড় করে আওয়াজ করলেন, যার অনেক রকম মানে হয়।
গুড মরনিং, সেরেছে রে!, আবার তুমি!!
হেঁ হেঁ, তা বাড়ি রং, টং হল? স্যার কিন্তু বেশ রোগা হয়ে গেছেন, খুব খাটনি গেল না।
স্যার চুপ!! কিন্তু চোখে মুখে একটা ভয়ানক অসোয়াস্তি!
বুঝলেন স্যার তাপস শুরু করল। ব্রীজের যে approach flyover হয়না, তার geometric design নিয়ে পড়ছি এখন। সুপার এলিভিসনের সঙ্গে আবার horizontal transition curve, ওঃ ব্যাপারটা কিন্ত ভারী interesting, পড়ছি এখন কিন্তু স্যার ওই traffic loading এর ব্যপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না (ও যে কি সব বলছে আমরাও বুঝিনি)।
তা স্যার।এখন তো বাড়ি রং হয়ে গেছে, এই শনিবার যদি একটু সময় দেন তাহলে?
এতোগুলো ছেলের সামনে স্যার না করেন কি করে?
উনি একটু কায়দা করলেন।
বললেন - এখনই এসনা আমার অফিসে, এখন একটু ফাঁকা আছি, discussion হতে পারে।
কোথায় খাপ খুলেছেন শিবাজি, এ পলাশী!!
তাপসের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
এখন? সে তো খুব ভালো হয় স্যার, তাহলে যাই আপনার সাথে?
বলে এক পা গিয়েই যেন মনে পরে গেল তাই বলল,
ওহ স্যার, ভুলেই গেছিলাম, এর পরেই তো সোম স্যারের ক্লাস। উনি আজকে বলেছেন একটা নতুন chapter, strain energy না কি পড়াবেন, সে নাকি স্যার ভীষণ শক্ত! গোড়া থেকে ক্লাস না করলে বুঝতেই পারব না, এক্কেবাড়ে দাঁড়িয়ে ফেল!
না স্যার, তার থেকে বাড়িই ভালো। তাহলে ঐ কথাই রইল, এই শনিবার--
স্যারের মুখ তখন আরেক সিংহের (তপন), বানানো ছবির হিরোর মুখের মতন। "মাষ্টারমশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি"।
প্রচন্ড বিব্রত মুখ।
না , হ্যাঁ, ইয়ে মানে ঠিক, সেদিন --
ও হ্যাঁ তাইত, আমার খেয়ালই ছিল না। আমি তো শনিবার থাকছি না!
ওঃ থাকছেন না?
না, ঐ কি বলে সেদিন আমি , কোন্নগর, হ্যাঁ কোন্নগর যাব। শালার ছেলের বিয়ে। তো সেই সোমবার ফিরব।
ওহো, কোন্নগর যাবেন বিয়ে? ঠিক আছে স্যার তাহলে পরেই হবে। আত্মীয়র বিয়ে বলে কথা - তাপসের গলায় কিঞ্চিৎ হতাশা।
আর স্যারের মুখ? অবশ্যম্ভাবী ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষে পেলে, মানুষের মুখ কিরকম হয় সেদিন জেনেছিলাম। এক্কেবারে নক্ষে কর রঘুবীর।
স্যার আর কথা না বাড়িয়ে সোজা ডিপার্টমেন্ট এ।
পিছন থেকে তাপসের স্বস্থি বচন - সাবধানে যাবেন স্যার। কোন্নগর বেশ দুর আছে।
স্যার চলে যেতেই দেখি খ্যা খ্যা করে প্রচণ্ড হাসতে শুরু করল।

আমি বললাম, কি হল? এত হাসি কেন?
অতি কষ্টে হাসি বন্ধকরে চোখ টোখ মুছে আমায় বলল হাসব না?
তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল - তুই তো আবার সাহেব, christmas cake ছাড়া কিছুই খাস না। আমরা বাপু নর্থ কলকাতার ছেলে, মিষ্টি খেতে ভালোবাসি।বাড়িতেই তৈরি হয়।
ভারি রাগ হল। বললাম -
যাচ্চলে এর মধ্যে মিষ্টি কোথা থেকে এল। তাছাড়া তোকে কে বলল আমি কেক ছাড়া আর কোন মিষ্টি খাইনা।
এর মধ্যে কি মিষ্টি খেলি শুনি?
আমি বললাম এইতো মা দুদিন আগে পিঠে বানিয়েছিলেন খেলাম।
Idiot, মাসিমা পিঠে বানালেন আর তুই দুটো আমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারলি না? কি সেলফিস রে তুই!
বাড়িতে আয়, কত খাবি খাস!
এবার বলত সাহেব, পিঠে কখন খায়?
পিঠে কখন খায়ে মানে? যখন হয়, তখনই খায়।
ধ্যাৎ , এই জন্য তো তোকে সাহেব বলি। আরে পিঠে কোন মাসে খায়?
আমি বললাম এই শীতকালে এই সময় খায়!
তাপস আরো চেপে ধরে কোন মাস বল?
ঐ জানুয়ারি হবে।
ও বলল ধ্যাৎ ইংরেজী তে কে জানতে চেয়েছে, বাংলায় বল্?
আমি - এই দাঁড়া। এই তো বোধহয় পৌষ সংক্রান্তি আসছে, হ্যাঁ, এখন তো পৌষ মাস চলছে!
Right! তাপস বলল।
আমি বললাম, তো?
তাপস ফ্যাক করে হেসে আমায় বলল, idiot, বাঙ্গালীর পৌষ মাসে বিয়ে হয়?
বোঝ কারবার!
আমি তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করলাম হ্যাঁরে, স্যরকে ওই সব approach flyover, তার transition curve, ওসব কি বলছিলি?
ও বলল - তার আমি কি জানি ছাই, কদিন আগে The Telegraph কাগজে 2nd Hooghly bridge, নিয়ে একটা লেখা বেরিয়েছিল (তখন বিদ্যাসাগর সেতু তৈরী হয়নি), লেখাটা পড়েছিলাম, বিশষণ গুলো ঐখান থেকে ঝেড়ে দিয়ছি।
কি সাহস ভাবো!!
আবার কদিন চূপচাপ। শীত বিদায় নেব নেব করছে, একদিন Soil Lab শেষ ক্লাস করে হল্লা করতে করতে, বেরিয়েছি, সামনেই AKS। পাস কাটিয়ে পালাবার তালে ছিলেন, কিন্তু হলনা।
তাপস একদম 32 all out.
এইযে স্যার, ল্যাব করে বেরোলাম! (ফালতু খেজুর)।
স্যার, এখন না ওই পেভমেন্ট ব্যাপারটা বুঝছিলাম, ওই রিজিড, ফ্লেক্সিবল কিসব। অংকগুলো কিছুই বোঝা গেল না।
তা সামনের রবিবার যদি স্যার একটু সময় দেন তাহলে -
স্যারের অবস্থা তখন কাঁদিনি মা, মুখই এমনি।
সে যাহোক আগেরবারের মতনই জানা গেল, এবারে ওনার লিলুয়া নিবাসী রাঙ্গা পিসিমা কলতলায় পরে কোমরে আঘাত পেয়েছেন, এখুনি স্যারকে যেতে হবে কাজেই..... বলে দৌড়ে চলে গেলেন।
তাপশ কপালে আঙ্গুল ছুয়ে বলল, ধন্য রাঙ্গা পিসিমা, দেখ্গে হয়ত দশ বছর আগে সগ্গে গেছেন।

আমি বললাম, তুই কিন্তু স্যারকে পুরো terrorize করে রেখেছিস।
তোকে দেখে যেরকম চমকান্, কোনদিন না অসুস্থ হয়ে পরেন! সেটা কি ঠিক হবে?
তাপস হঠাৎ খুব সিরিয়স হয়ে বলল - আচ্ছা সেদিন ওনাকে বাজারে ওরকম হাঁকপাঁক করে পালাতে কে বলেছিল?
আমি না হয় একটু দেখলাম ই, কি ক্ষতি হত? হেব্বী ঘ্যাম না? আমরা কি লাইনবাজ ছেলে নাকি?
তারপর একটু ভেবে বলল, ভাল চমকেছেন না?
তারপর নিজেই বলল, ঠিক হ্যায়, ছেড়েই দিলাম আর চমকাব না।
তাপস কিন্তু কথা রেখেছিল। আর কখনও স্যার কে বাড়ি যাবার প্রস্তাব দিয়ে বিব্রত করেনি।
এরপর স্যার দুএকবার সামনে পরে আঁতকে উঠেছেন ঠিকই, কিন্তু তাপস সদ্যবিচ্ছিন্ন প্রেমিকার প্রতি মানুষ যেমন উদাসীন থাকে, সেইরকম নির্লিপ্ত থাকত।
স্যারও আস্তে আস্তে একটু সহজ হলেন, হয়ত ভাবলেন ছাত্রের ঘাড় থেকে হাইওয়ের ভুতটা নেমেছে। তবুও বলা যায় না, তাই আমাদের দেখলে একটু সরে সরেই থাকতন।

তাপসের কাছেই শুনেছি, স্যারের বাড়ি থেকে বাগবাজারের পাগলা ঠাকুরের ঘাট খুব দুরে নয়। তাপসের জুজুবুড়ি ওনার ঘাড় থেকে নামার পর, ওই পাগলা ঠাকুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান করে, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে পাঁচ সিকের হরির লুঠ দিয়েছিলেন কিনা, সেটা অবস্য আমাদের জানা নেই।
সমাপ্ত

একজন '৭৫ ব্যাচের স্মৃতিতে যাদবপুর

অনুপ চৌধুরী

[1]

ছাত্র জীবনের শুরুর দিকের অর্থাৎ ১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে ১৯৬৮/৬৯ একটু পেছনে এসে , ফিরে দেখা যাক সেইদিনগুলো, স্কুল জীবন দিয়ে শুরু করা যাক ।
আমাদের সময় , অর্থাৎ ১১+৫ (HS +Engg), এখনকার মতো ১০+২+৪ নয়। তখন ক্লাস ১০ এ পড়ি , চুটিয়ে ক্রিকেট বল পেটাই , বৃস্টিতে ভিজে ফুটবল খেলি , গাছে উঠে পেয়ারা , আম পাড়ি , আমাদের বাড়ীর বাগানের (বাবার হাতে লাগানো ফলের গাছ) পেয়ারা, কামরাঙ্গা , কাঁচা মিঠে আমের গাছের ফল খায় নি (আম গাছ টা এখনও বেঁচে, উমপুন ভাঙতে পারেনি) এমন কেউ নেই পাড়ায় ।
পড়াশোনা টা হত , মায়ের হাতের ঠেঙ্গানি খেয়ে ,

Class 10 , এ Chemistry পড়তাম দীপঙ্কর দার কাছে , তখন PhD করছেন । ইনিই সেই যাদবপুরের অধ্যপক Dr Dipankar Chakrabarty, JU , Environment Science Division head ছিলেন, জলে Arsenic নিয়ে Sir এর awareness কেউ ভুলবে না । স্যার কে প্রণাম জানাই।

School এর বাকী বন্ধুদের সঙ্গে রমেশ বাবুর কোচিং এ যেতাম । রমেশ বাবু স্যার, Maths আর English পড়াতেন , আর Physics পড়াতেন রঞ্জিত দা । আমার physics & Maths এ interest দেখে, Joint Entrance দেওযার ব্যপার উনিই আমার মাথায় ঢুকিয়ে ছিলেন । তার আগে ওসব নিয়ে কোনোদিন ভাবিনি । রঞ্জিত দা মাঝে মাঝে Test নিতে শুরু করলেন আমার, আমিও মজা পেয়ে গেলাম । কঠিন অঙ্ক সলভ করতে পারলে , পুরস্কার পেতাম সিঙ্গারা। ফর্ম ফিলাপ থেকে শুরু করে, যাদবপুরের ফর্ম জমা দেওয়া, সব এনার জন্য, রঞ্জিত দা আজ আর বেঁচে নেই , প্রণাম জানাই।

আমাদের সময় জয়েন্ট এনট্রাস এর পরীক্ষা হত ৫০০ নম্বরের , Physics, Chemistry, English , ১০০ নম্বর করে , অঙ্ক ২০০ নম্বর , ২০ টা অঙ্ক করতে হত ।
(যদি ভুল লিখে থাকি, ঠিক মনে করিয়ে দেবেন কেউ) । পরীক্ষার সিট পড়েছিল হিন্দু স্কুলে, জানালা দিয়ে Presidency College দেখা যায় । বাকী পরীক্ষা গুলো মোটামুটি দিয়ে দিলাম । Maths পরীক্ষার আগে রঞ্জিত দা পই পই করে বলে দিয়েছিলেন, আগে ভাল করে প্রশ্ন
পত্র দেখবি, তারপর যেগুলো পারবি, সেই দিয়ে শুরু করবি, কোনো অঙ্ক আটকে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিবি , সময় নস্ট করবি না ।
আজ ও মনে আছে সেই উপদেশ। ২০ টার মধ্যে ১৮ টা অঙ্ক করেছিলাম , বোধহয় ওটাই ছিলো যাদবপুরে প্রবেশ এ Password.

আমাদের পাড়ায দুটো স্কুল এর মোটামুটি সুনাম ছিলো তখন, স্কুল থেকে ভাল ছাত্র বার হত বলে, মাস্টার মশাইরা কড়া ধাতের ছিলেন । Sir Nripendra Nath HS আর Gangapuri HS. আমার অনুজ সির্দাথ দত্ত গঙ্গাপুরী স্কুলএর ছাত্র ছিলো।

জযেন্ট এর রেজাল্ট বার হলো, যাদবপুর থেকে ডাক পেলাম , তখন Admission এর আগে একটা interview হতো। নির্দিস্ট দিনে গেলাম interview দিতে। Aurobindo Building এর একতলায় বাঁ দিকের বড় হল ঘরে। বেশ কয়েক জন Professor বসে আছেন, নমস্কার করে ঘরে প্রবেশ করলাম, বসতে বললেন একজন । টাক মাথা, ফর্সা, সুন্দর দেখতে, প্রথমেই প্রশ্ন , তুমি কেমিক্যাল পড়তে চাও? কেন?
এই প্রসঙ্গে বলি, যাদবপুরের ফর্ম ভরতির সময় লিখেছিলাম ১. কেমিক্যাল ২. মেটালার্জি (কেন লিখেছিলাম জানি না) ৩. ইলেকট্রিকাল ইন্জিনিযারিং।
মজার ব্যাপার মেকানিক্যল লিখি নি , লিখলে সম্ভবত পেয়ে যেতাম । সিভিল লিখি নি , তার কারণ বাবা PWD র Engineer ছিলেন, ভাদ্র মাসের দুপুরে পিচ ঢালা রাস্তায় Civil Engineer ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না, সুতরাং সিভিল বাদ।
ওনার প্রশ্নর উত্তরে জবাব দিলাম , আমার মামা Chemical Engineer, তাই কেমিক্যাল পড়তে চাই।
কি নাম তোমার মামার ? উত্তর। Dr Bimal Ch Dutta.
ও আচ্ছা, কেমিক্যাল না পেলে ইলেকট্রিক্যল পড়বে ?

যাদবপুর ছাড়া অন্য কোথাও পড়ব না , তাই মরিয়া হয়ে বললাম , হ্যাঁ স্যার , BE College এ apply করিনি কারণ, বাবার retirement হয়ে গিয়েছে তখন। তাই যাদবপুর ই একমাত্র ভরসা ।
কিছুদিন বাদে চিঠি এল, Electrical এ Admission এর, JU তে ভর্তি হয়ে গেলাম । ক্লাস শুর হওযার কদিন আগে, চিঠি দিয়ে জানানো হল আমায় কেমিক্যাল দেওয়া হয়েছে।
অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম যে, উনি ছিলেন Prof B.C Chandra , আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, আমার মামার এক বছরের সিনিয়র, আর মামা ছিলেন Prof Ram Narayan Mukherjee র ক্লাসমেট।

সালটা ১৯৭০ নকশাল আমলের সময়। তাই কেউ র‍্যাগিং করার চেস্টা করেনি আমাদের। মোট ৫০ জন কেমিক্যাল এ ভর্তি হল , যেন বিভিন্ন স্কুলএর ছাত্রদের মিলন মেলা, হিন্দু , হেয়ার , সাউথ পয়েন্ট, মিত্র , বালীগন্জ গরমেন্ট, আর.কে মিশন, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ .....আর আমাদের মতন সাধারন স্কুলের ছাত্র , মিলেমিশে সব একাকার। সব নদী , উপনদী , খাল বিল যাদবপুর নামক সমুদ্রে মিশে গেল ।
একটাই পরিচয় যাদবপুরের ছাত্র।

শুরু হল পথ চলা নতুন জীবনের ।

[2]

কিছু শুরুর দিকের ঘটনা লেখার চেষ্টা করছি ।

শুরু হল যাদবপুরের বিশাল সমুদ্রে ভেসে চলা আর নতুন বন্ধু দের সঙ্গে আলাপ করা ।

প্রথম দিন , আমার রোল নম্বর ৪৭ , আলাপ হল শেখর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে , রোল নম্বর ৪৮ , কুমারটুলির Cricketer , প্রথম ডিভিসন এর খিলাড়ি , সাগর ময় চ্যাটার্জী , রোগা , চশমা পড়া , ফর্সা সুন্দর দেখতে , নিউ আলিপুরে থাকে। আর ছিলো সুজয় ঘোষ , হাতে হাওইয়ান গীটার , আমাদের Rock Star.

প্রথম দিনের রোলকল , সব নাম আস্তে আস্তে জানা শুরু , তপন কর, ইংরাজী তে নাম নাম লিখতে গিয়ে T টা J হয়ে গিয়েছিলো , রোল কল হল 'জাপান কর'। সেই দিন থেকে 'তপন কর' হয়ে গেল 'জাপান কর', সুদর্শন ফর্সা, নিজের সম্পর্কে খুব সচেতন , রোদ এ দাঁড়াতো না পাছে রং কালো হয়ে যায় , অপর জন তপন সরকার , জাতীয় বাস্কেকটবল খেলোয়ার , দারুন গ্লেমার , The most Handsome Guy in our Batch . দুটো দেবু , তাই দেবু মিত্র হয়ে গেল DB , অপর জন দেবু বন্দোপধ্যায় । সাউথ পয়েন্ট স্কুলের একটা গ্রুপ ছিলো , দারুন মেধাবী একজন আশীস রায়, বলা যায় Most intelligent, বার্মা থেকে আসা একজনের নামকরণ করা দিল ....গামা। একজন বিদেশী ছাত্র ছিলো, Sri Lanka থেকে আসা , নাম Uppali Pathirana , রোল নং ৫১। এর কথা পড়ে বলবো ।

এক জনের কথা না বললেই নয় , কুনাল সেনগুপ্ত , মিত্র স্কুলের , নিপাট ভালো মানুষ , K C Nag মহাশয় এর ছাত্র , Human Computer (শকুন্তলা দেবীর মেল ভার্সান) , এবং আমার ল্যাবোরেটরির পার্টনার ।

সুমিত , ডিবি এবং উত্তম বাসু , তিন মুর্ত্তি, সুমিত মুখার্জী (বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট) যাদবপুর থানার Qtr এ থাকতো

আমাদের মাসলম্যান । হাতের গুলি ফুলিয়ে বলতো , কেউ আমাদের সঙ্গে লাগলে .....মনে রাখিস যাদবপুর থানার সামনে দিয়ে ফিরতে হবে ..... আমার আর এক ল্যবরেটারির পার্টনার ছিলো , উত্তম বাসু (ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল পার্টনার)

এই বার আসি, ৫১ জন ছাত্রদের দুটো group এ ভাগ করে দেওয়া হল , A1 & A2 .বাকী জীবন, আমাদের এই পরিচয় নিয়েই থাকতে হল ।

ও হো , আসল নাম টাই তো নিতে ভুলে গিয়েছি , আমাদের একমাত্র মহিলা সহ-পাঠিনী, রত্না দাশগুপ্ত , বেলতলা গার্লস এর ফাস্ট গার্ল । আমাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে রত্না , কোন দিন কোনো অভিযোগ করনি । ১৯৭০ এ মোট আট জন মেয়ে ইন্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছিলো , বেশির ভাগই Architecture এ । ১৯৭০ (pass out) এ অজপা সেন ,অনিতা বাসু ছিলেন, আর আমাদের পরের ব্যাচ এ ছিলো গীতা , তারপর শাশ্বতী । এরা ছিলো বলেই , পরে প্রচুর মেয়েরা কেমিক্যাল পড়তে আসে । Male Dominated Engg College গুলোতে, এরাই পথ প্রর্দশক , পরবর্ত্তী কালে , রত্না বা অন্যান্য মেয়েরা ইন্জিনিয়ারিং পড়তে উৎসাহ পায় এদের জন্যই ।

আমার এই কথাটা হয়তো অনেকের পছন্দ হবে না । এটা একান্তই আমার নিজস্ব মতামত ।

কদিন ক্লাস করার পর বুঝতে পারলাম , বিভিন্ন স্কুল থেকে কারা কারা এসেছে। সাউথ পয়েন্ট এর গামা, মেনন্ , দেবু (DB), আশীষ, প্রশান্ত , যাদবপুর বিদ্যাপীঠ এর সুজিত, আশীষ নাগ, প্রত্যুষ, বুয়া । মিত্র র অমিত ও কুনাল, বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট এর সুমিত ও অভিজিত দাস , এন্ড্রুজ স্কুল এর সুবোধ ও প্রদীপ মুখাজ্জী । RK Mission এর মানস দত্ত আর পৃথ্যিরাজ শুর (R). নব কুমার আসতো শিবপুর থেকে

,

North Calcutta র বিরাট গ্রুপ, ৯-৪২ এর শিয়ালদহ লোকাল এ আগমন ১০-২০ র ক্লাস করার জন্য । দেবু , বিকাশ, সমরেন্দ্র , মানস , শেখর, দীপক,অনুজ,শঙ্কর এবং আর ও অনেকে আসতো (এরা উত্তর কলকাতার স্কুল …সেন্ট পলস , কে কে হিন্দু একাডেমী ,মেট্রেপলিটন,পার্ক , স্কটিশ চার্চ , হেয়ার থেকে এসেছিলো) ,তুষার আর উজ্বল রায় ছিলো শৈলেন্দ্র সরকার স্কুল থেকে , বাকী রইলাম আমরা , Free Radicals , এখনকার ভাষায় নির্দল - কেউ যাদবপুর , কেউ বাঘাযতীন , রানীকুঠি , পল্লিশ্রী , কুঁদঘাট , গড়িয়া , নেতাজীনগর ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে সবাই আসতো ।

বাঘাযতীন গ্রুপ লিডার ছিলো প্রতূষ , একটা গড়িযাহাট গ্রুপ , আর ডিবি, সুমিত ও উত্তম । দু জন BSc পড়তে পড়তে (Mechanical এ ডিপ্লোমা করে সাধন নন্দী এসেছিলো কেমিক্যল পড়তে , ব্যারাকপুর থেকে আসতো সুপ্রতীম দাশগুপ্ত । বাকী কযেক জন Hostel এ থাকতো , আমরা যে যার মতো আসতাম । চেস্টা করলাম , কে কোন স্কুল থেকে পড়তে এসেছিলো আমাদের সঙ্গে (ভুল লিখলে , বন্ধুরা ঠিক করে দিও) , ৫০ বছর অগের Memory's থেকে ।

1 st Year এর ক্লাস হত তখন Integrated Engg Building এ (Beside Blue Earth Mc Shop) সমস্ত বিভাগের , সেই সুবাদে প্রায় অন্য Engineering branch এর অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেল । 1st সেমিস্টারে আমাদের বাংলা, ইংরাজী , ইতিহাস , ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ক্যলকুলাস …, মানে Non Engineering subject পড়তে হয়েছিলো , Arts College এর অনেক দিকপাল অধ্যাপক রা আমাদের ক্লাস নিতেন , আর আমরা ফাঁকি মারতাম (তখন বুঝতাম না , এখন বুঝি কাদের কাদের ক্লাস ফাঁকি দিতাম)

আমাদের ৫১ জন ছাত্রকে , ১ থেকে ২৫ - A1
রোল নম্বর অনুযায়ী , ২৬ থেকে ৫১ —A2
দু টো group এ ভাগ করা হল । বুঝলে গুরু , সেই
থেকে শুরু …..তুই ব্যাটা। A1 .....তুই ..A2 , সেই
পরিচয় আজ ও চলছে ….এবং চলবে।

আজকের পর্ব শেষ করবভ, একটা মজার ঘটনা দিয়ে , প্রশান্ত থাকতো লেক মার্কেট এর কাছে , সর্দার শঙ্কর রোড এ , কোন দিন ই ১০-২০ ক্লাস এটেন্ড করতে পারে না , ১১-১০ এ পৌঁছাত পরের ক্লাস এর সময় , হাঁফাতে হাঁফাতে , কি ব্যপার ? খোঁজ লাগাও , রহস্য টা কি ? জানা গেল , লেক মার্কেট থেকে হেঁটে রোজ হাজরা মোড় এ আসতো বাস ধরার জন্য। ফলত রোজ ক্লাস লেট । বাকী টা আর ফাঁস করলাম না, প্রশান্ত এখন Australia তে থাকে ,
শুনেছি, কাউকে কাউকে ফোন এ Rabindra সঙ্গীত শোনায় , ফিরে এলে আমায় পিটবে।

[3]

তখন 3 rd year student. আমি ছোট থেকেই খুব ভালো গাছে চড়তে পারতাম, বন্ধুরা সেটা জানতো। হঠাৎ একদিন পুকুর পারে আড্ডা মারতে মারতে বন্ধুরা বলে, নারকেল গাছে চড়তে পারবি? ডাব খাবো! Challenge accepted, বললাম পারবো। ব্যডমিন্টন খেলতাম বলে , হাফপ্যন্ট সঙ্গে থাকতো, একটা ছোটো গাছে উঠে পড়লাম , যেমন বলা তেমন কাজ , সেই শুরু ।
এর পর মাঝে মাঝেই , অফ পীরিযডে ডাব পারা চলতে লাগলো, অজয় ঘোষ (মনি) আমার পার্টনার, Blue Earth Machine Shop থেকে বাটালী নিয়ে আসতে, অভিজিৎ দাস (ওর বাবা Prof Das was in Charge, at that time , Blue Earth Mc Shop এর)

লোভ বাড়তে লাগল আমাদের , একদিন 2nd half এ , পুকুর পাড়ে Guest House , রেল লাইনের ধারে একটা গাছে উঠে প্রচুর ডাব পাড়ছি, গেস্ট হাউস এর বারান্দায় জমা করছে বন্ধুরা ।
আমি গাছের উপর থেকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখি নীচে কেউ নেই , কি ব্যাপার ? বুঝতে পারছি না।
নীচে নেমে বুঝলাম কি ব্যপার।
দুজন ষন্ডা মার্ক Security guard, নারকেল পাহাড়া দিচ্ছে, আর বীরপূঙ্গব বন্ধুরা সব ভ্যানিস ওখান থেকে।
বুঝলাম কপালে দুঃখ র'য়েছে।
ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার সাহেব ডেকেছেন ।
হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। হাফ প্যন্ট ছেড়ে ফুল প্যন্ট পড়ে নিলাম , যা হবাব হবে । আমার যাদবপুরে পড়া হয়ত এখানেই শেষ।
ঠিক করলাম , যা বলার সত্যি কথা বলব।
Dr P C V Mallick was Registrar and Food Technologist Prof Dr A N Basu was VC then.
After the Saddest incident of Prof Gopal Sen, he took the Chair .
মাথা নিচু করে ওনার সামনে দাঁড়ালাম,
কি নাম?, বললাম, কোন ডিপার্টমেন্ট ? Sir Chemical Engineering, কোন বছর? Sir 3rd year .
টেবিল থেকে মুখ তুলে বললেন .....
তোমাদের লজ্জা করে না, দু দিন বাদে পাশ করে ইন্জিনীয়র হয়ে বার হবে , আর এখন গাছে উঠে ডাব পাড়ছো ? জুনিয়ার ছেলেরা কি শিখবে ?
Sir , ভুল হয়ে গিয়েছে , আর করবো না । Sir Prof D K Dutta কে বলবেন না. রাগ করবেন ।
আমার কথায় এবার উনি হেসে ফেললেন। বললেন যাও , ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আর এই সব কোরোনা ।
বুক থেকে পাথর নেবে গেল, স্যার কে একটা প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম ।
এবার আমার পালা, মুখ গম্ভীর করে ফিরে এলাম , দেখি বন্ধুরা সব ডিপার্টমেন্ট এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে । আমাকে দেখেই সব বীরপূঙ্গবরা এগিয়ে এলো। জানতে চায় কি হলো ?
খুব গম্ভীর মুখ করে বললাম, স্যার জানতে চাইলো আর কে কে ছিলো আমার সঙ্গে ?
কি ...কি.. বললি তুই ?
সবার নাম। নামগুলো HOD Prof D K Dutta কে নাম দিয়ে দেবেন বলেছেন ।
সবার মুখ চূন ।
ডাব খাবে তোমরা সবাই , আর বাঁশ খাব আমি একা!
পরে অবশ্য , সত্যি কথাটা বলে দিয়েছিলাম।
তখন বয়স কম ছিলো, বড় হয়ে বুঝেছিলাম এই সব শিক্ষকদের মন সোনা দিয়ে মোড়া ছিলো , আমরা সত্যিই ভাগ্যবান ছিলাম ।
শেষ করলাম লেখা, খুব একটা ভালো আমি লিখতে পারি না, চেষ্টা করলাম ।

যে ঘটনার স্মৃতি আমাদের এখনও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই গোপাল বাবুর হত্যা ইতিহাসের সব চেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা, আমাদের সময়ই ঘটেছিলো ।

[4]

যাদবপুরের ছাত্র জীবন , মধুর অতীত । তখনকার কিছু ঘটনা লেখার চেস্টা করছি ।
আগের লেখার এত ভালো রেসপন্স পাব ভাবতেই পারিনি , তাই আগের লেখার রেশ ধরে আর ও একটু এগিয়ে যাই । যাদবপুরের সমস্ত মহিলা পড়ুয়ারা , বিশেষ করে তারা যারা সেই সময় সাহস করে ইন্জিনিয়ারিং পড়তে এগিয়ে এসেছিলেন , তারাই আসলে রাস্তা টা দেখিয়েছিলো ।

প্রথমেই ধন্যবাদ দেব , আমার এক প্রিয় দিদিকে অজপা সেন (১৯৭০) এবং একটু সিনিযর বন্ধুবর অসীম কে আমায় প্রচুর তথ্য জানাবার জন্য , রত্না এবং শাশ্বতী ও বেশ কিছু নতুন তথ্য জনিয়েছে । ৬০ এর দশকে অসম অয়েল (ডিগবয়) তে এবং এফ সি আই , Sindhri তে সম্ভবত একজন করে যাদবপুরের মহিলা কেমিক্যাল ইন্জিনীযর ছিলেন । মমতা দত্ত , দ্বিতীয় হয়েছিলেন ১৯৬৩ সালে, ওনার স্বামীর নাম ছিলো অসীম মুখাজ্জী (১৯৬২) ব্যাচের , সম্ভবত সত্বিকারের পথ প্রর্দশক ছিলেন ওনারাই , তারপর নজয়া পাঠক (১৯৭২) , নেপাল থেকে যাদবপুরে ক্যেমিক্যাল পড়তে এসেছিলেন । আমাদের পরের ব্যাচ এ গীতার সহপাঠী ছিলেন সুমিতা (১৯৭৬) , আর শাশ্বতীর সঙ্গে ছিলেন নন্দিতা (১৯৭৮), এবং তারপর আরও অনেকে ,
১৯৮০ সালের পর থেকে প্রচুর মেয়েরা আসতে থাকে , প্রথম প্রথম আর্কিটেক্ট, ইলেকট্রিক্যাল , কেমিক্যাল , তারপর সিভিল , মেকানিক্যাল এ তে আসতে লাগলো মেযেরা ।

ফিরে আসি আবার বন্ধুদের মধ্যে প্রথম বর্ষে । তখনকার সময় , প্রথম দু বছরে নিজেদের কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এ ক্লাস হত না । দিনের প্রথম ভাগে চার টে ক্লাস হত (১০-২০ থেকে ০১-৪০) , টিফিনের পর (২-১০ থেকে ৫-১০) প্রাকটিক্যাল ক্লাস । শনিবার হাফ ডে , ফুল মস্তি প্রথম বর্ষে NCC, NSS করা বাধ্যতামূলক ছিলো । আমরা বেশ কয়েকজন 4 Tech Air Wing NCC তে জয়েন করলাম , আমি , গামা , মেনন , প্রত্যুষ , অভিজিৎ দাশ এবং অন্য বিভাগের অনেকে , তপন (জাপান) কর গায়ে রোদ লাগাবে না , তাই NSS এ নাম লেখালো , আরও অনেকের সঙ্গে , বাকিরা NSS ও NCC র অন্য জায়গায় নাম লেখালো । আমি NCC খুবই সিরিয়াসলি করার চেস্টা করতাম ।
NCC Training আমায় অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে । আমরা পাঁচ জন NCC blue পেয়েছিলাম যাদবপুর থেকে ।
ফটোগ্রাফি ক্লাব লএ ভর্ত্তী হলাম , ওটা আমার নেশা এবং হবি ছিলো , সুতরাং সুযোগ টা কাজে লাগালাম পুরোদমে ,
Film Society র মেম্বার হয়ে গেলাম এবং সন্ধ্যার পর Indoor Stadiums এ আমার প্রিয় ব্যাডমিনটন খেলা শুরু করলাম । আমাদের কোচ ছিলেন মনোজ গুহ , প্রক্তন ভারতীয় খেলোয়ার ও কোচ । মানস দত্ত , হাবুল , মনোজ এরা টেবিল টেনিস খেলতো । মনোজ ক্রকেট ক্যপটেন ছিলো, তপন সরকার বাস্কেকটবল তুমি যদি চাও, যাদবপুর তোমায় প্রচুর সুযোগ দেবে ।
মুর এভিনিউ টু যাদবপুর সাইকেলে যেতাম বিজয়গড়ের ভিতরের রাস্তা দিয়ে । আমাদের পড়ার খরচ ছিলো ১৮০ টাকা বছরে, সম্ভবত সারা ভারতে, বিশ্বে এত কম টাকায় ইন্জিনিয়ারিং পড়া যায় না কোথাও , শুনেছি ২০০০ সাল অবধি এই ফীস্ ছিলো , ভাবা যায়?

৮ বি , বাস স্টান্ড এর কথা একটু বলা যাক এখনকার মতো ঝকঝকে ছিল না , ৮বি দোতলা বাসে সামনের সিট এ বসে মাত্র ৩০ পযসার বিনিময়ে সারা কলকাতা ভ্রমন করে হাওড়া যেতে ঘন্টা দুই লেগে যেত ,প্রচুর ঝুপরি দোকান ছিলো , আমাদের ,তখনকার দিনে Tiffin করার জন্য বরাদ্দ ছিলো এক টাকা । চা , ঘুগনি , পাঁউরুটি টোস্ট অথবা ডিম এর ওমলেট্ , পাঁউরুটি , এই মেনু রোজ , দু এক দিন আলাদা ,
খরচ পড়তে ৬০ / ৭০ পয়সা ,৩০ পয়সা বাঁচিয়ে রাখতাম । ৮ বি বাস টাই উঠে গেল , শুধু নাম টাই রয়ে গেল , একই কথা , ৯ নম্বর বাসের ক্ষেত্রে , বাস স্টান্ড পুরোপুরি হকার দের দখলে , এখনকার ছেলে মেয়েরা জানেই না , ওখান থেকে দোতলা বাসে করে যাদবপুর থেকে ডানলপ যাওয়া যেত এক সময় ।
আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন যাদবপুরের আশেপাশেই থাকতো । অজয় ঘোষ (মনি), আশীস নাগ , বুয়া ,পীজুষ ,বুয়া মানে (প্রবুদ্ধ দাশগুপ্ত) আর নিয়াজী (অশোক পাত্র) এদের মধ্যে বুয়া , প্যজস ,নিয়াজী আমাদের কথায় কথায়, চমকাতো , ৮বি বাস স্টান্ড এর পাশে এদের আড্ডার ঠেক ছিলো ,

চেম্বার এর ভয় দেখাতে সবাই কে , ফাঁকা বুলি র আওযাজ। অজয় আর প্যাজস এর চেহারা ছিল দেখবার মতো (বাংলা ফিল্ম এর চিন্ময় রায় , মডেল) জোরে হাওযা দিলে , চারতলার ক্লাশ রুমে এদের চেন দিয়ে বেঁধে রাখতে হত , পাছে উড়ে যায়।

প্রথম বর্ষে সেশেনল ছিলো , ইন্জিনিয়ারিং ড্রইং, এবং কারপেনট্রী (সোজা বাংলায় ছুতোরগিরীর ক্লাস) । ছুতোরগিরীটা আমি ভালই করতাম , আর জোগাড় হত পুরানো মাদার হাত সাফাই করে , ড্রইং ক্লাসে (হাতে টি ও সেট স্কোয়ার) নিয়ে যেতে হত , সেকসন , এলিভেসন , টপ ভিউ , সাইড ভিউ ...কি ঝামেলা রে বাবা, সার্কেল, যে সব থেকে ভাল আঁকতো তার থেকে কপি করা হত , নীট ফল , খানিক বাদে তার আঁকা সার্কেল বোর্ড থেকে খুলে নীচে পড়ে যেত ।

আমরা ড্রইং সরন্জাম কিনতাম , পেনসিল ,রাবার , FET store এ হারু দার কাছ থেকে ,হারু দাকে মনে আছে তো ? সদা হাস্যময় , ফর্সা , টাক মাথা মানুষ টিকে । H , HB, B পেনসিলের মানে কি তার আগে জানতাম না , B,B1 ,B2 মানে নরম শীষ্ আর H ,H1 ,H2 মানে শক্ত পেনসিল আমাদের নানা রকম লেটার সাইজ , লেখানো শুরু হল , আর সেশনাল জমার জন্য , লিখতে দেওয়া হল , Drawing is the Language for Engineers , লেটার সাইজে , লিখতে গিয়ে সবাই ঘেমে নেযে একাকার , কত যে পেনসিল শহিদ হল তার শেষ নেই , কয়েক দিন যুদ্ধের পর ,যখন লেখা শেষ হল , A 1 সাইজের শীট্ এর অবস্তা
দেখে মাথায় হাত । পেনশিলের গুঁড়োয় শীট পূরো কালো । উপায় ? অভিজ্ঞ সিনিয়র দের শরনাপন্ন হতে হল উপায় কি, না এক পেয়ালা চা আর চারমিনার ফিস্ দিয়ে । আদেশ হল , যা , ৮ বি বাস স্টান্ডের পাশ থকে দুটো কোয়াটার পাউন্ড লোকাল পাঁউরুটি কিনে নিয়ে আয় ।বুঝতে পারছি না , চা ,চারমিনার সঙ্গে পাঁউরুটি টোস্ট ? ফিস টা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না । যা বলছি তাই কর , প্রশ্ন করবি না ..,..
পাঁউরুটি কিনে আনলাম ।মাঝখান দিয়ে দু ভাগ কর , ...করলাম । যা , ড্রইং টা বোর্ড এ লাগা , ..., লাগালাম ড্রইং এর উপর পেনসিলের গুড়ো গুলো আস্ত আস্ত পাঁউরুটির ছোঁয়ায় উঠে আসতে লাগলো,পাঁউরুটির উপর, অবাক চোখে দেখতে লাগলাম পাঁউরুটির খেলা মনে হল টেনীদার ভাষায় চিৎকার করে বলেউঠি ডি লা গ্রান্ডী লা মেস্টফিলিস ইয়াক্ ইয়াক্ । আস্তে আস্তে, ড্রইং শীট হয়ে উঠলো ঝকঝকে সাদা পরিস্কার তার মাঝখানে ফুটে উঠলো লেখাটা :
DRAWING IS THE LANGUAGE FOR ENGINEERS .
সেশনেল এ ভালো নম্বর পাওয়া কে আটকায় ।

[5]
যাদবপুরের ছাত্র জীবন, বেদনা মিশ্রিত মধুর অতীত ।

কিছু ঘটনা লেখার চেষ্টা করছি মাত্র, '70 -75 সালের ঘটনা; আমি কোন ইতিহাস লিখছি না , আমরা ক্লাশের অনেকে মিলে একটা জিনিষ টিফিন করতাম মাঝে মাঝে , সেটা হল ঢাকাই পরোটা , মিস্টির দোকানে ১ টাকায় দুটো দিত (যতদুর মনে পড়ে) গোল হয়ে ফুলে থাকতে , সঙ্গে ছোলার ডাল অনেকটা দিত , পেট ভরে যেত ।
সত্যেনদার ক্যান্টিন ছাড়া , ওই সময়কার যাদবপুর ভাবা যায় না । দু নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করলেই ডান দিকে , ইলেকট্রিকাল বিল্ডিং এর উল্টো দিক। যত আড্ডা , রাজনীতি , নাটক , কবিতা , সিনেমা ...,. র আতুড়ঘর । শুনেছি মৃনাল সেন , ঋৃত্বিক ঘটক , তপন সিনহা , রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত র মতো ব্যক্তি রা মাঝে মাঝে আসতেন আড্ডা মারতে । আমি রুদ্রবাবু কে দেখেছি ওখানে । প্রথম বাংলা ব্যান্ড

মহীনের ঘোড়া গুলির অন্যতম জনক রঞ্জন ঘোষাল (মারা গিয়েছেন) , ইলেকট্রিকাল (১৯৭৬) এর ছাত্র ছিলেন , কিম্বদন্তী গায়ক হেমন্ত মূখার্জীও ইলেকট্রিকাল ইন্জিনীয়ারিং এর ছাত্র ছিলেন। হেমন্ত বাবু , রঞ্জন থেকে আধুনিক অনুপম রায় (২০০৩) , অনেকেই যাদবপুরের ছাত্র , বলতে চাইছি শুধু পড়াশোনা নয় , তার বাইরেও যাদবপুরের অবদান কম নয় । খেলাধূলার ক্ষেত্রেও অবদান কম ছিলো না। ফুটবলে ঝন্টু দাশগুপ্ত, বিমল চক্রবর্তী, প্রদীপ দত্ত, বাস্কেটবলে তপন সরকার , ব্যাডমিনটন্ এ লালটু গুহ , NCC তে All India Best Cadets & Aero-Modeler ছিলেন তপন বাগচী , কয়েকটা নাম নিলাম মাত্র আরও অনেকে রয়েছে তবে সব নাম মনে নেই আর ছিলো গর্ব করার মতো, Photo graphic Club , Film Society, Mountaineering Club ইত্যাদি ইত্যাদি।
ভাঙ্গাচোরা প্রজেকটারে গান্ধীভবনে বসে কত ভালো ভালো সিনেমা দেখেছি , By Cycle Thief, Battleship Potemkin

প্রথম বর্ষের শেষ দিকে (৩০.১২.১৯৭০) যাদবপুরের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্ক জনক ঘটনার সাক্ষীও আমরাই , শ্রদ্ধেয় উ পাচার্জ গোপাল সেন হত্যার ঘটনা আমাদের উঁচু মাথা হেঁট করে দিয়েছিলো , বিশ্ববিদ্যালয় এক বছরের উপর বন্ধ হয়ে যায় , প্রচুর ক্ষতি হয় আমাদের পড়াশোনার । সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় ৭২ থেকে ৭৬ পাশ আউট ব্যাচের। ৭৭ এর পর অবস্তা স্বভাবিক হয় , তবে আমাদের শিক্ষক রা আমাদের সব ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছিলেন ,যত্ন নিয়ে পড়িয়ে , প্রনাম জানাই তাঁদের কে । কোনো ঘাটতি ছিলো না তাঁদের পড়ানোর ব্যাপারে ।
এখনকার কজন ছাত্র জানেন যে প্রয়াত গোপাল সেন ছিলেন যাদবপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রডাকসন্ ইন্জিনিয়ারীং বিভাগের জনক!

দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস হত , অরবিন্দ ভবনের চার তলায় , তৃতীয় বর্ষ থেকে নিজেদের ডিপার্টমেন্ট এ ক্লাস করার অনুমতি পেলাম। আগেই বলেছি আমরা কয়েকজন NCC করতাম চুটিয়ে। আমি , প্রত্যুষ , তপন বাগচী , আলোক চৌধুরী (ফার্মাসী) কাস্মীর গিয়েছিলাম All India Training Camp এ । দারুন অভিজ্ঞতা , MI-8 , Helicopter এ , উপর থেকে ডাল লেক দেখার , তপন যথারীতি All India Best Aero Modelling Trophy পেল বেঙ্গল জোন থেকে । পরের বার Camp গেলাম উটাকমান্ড , এবার আমার সঙ্গী ছিলো অলোক চৌঘুরী । দারুন জায়গা। এই ক্যাম্প গুলো ২১ দিন/ ৩০ দিনের হত ।

তখনকার দিনে ছাত্রদের সরকারী বাসের কুপন দেওয়া হত অর্ধেক দামে , আমি রানীকুঠি থেকে গড়িয়া , গড়িয়া টু যাদবপুর কুপন পেতাম । ৪১/১ বাসে এলে কুপন বেঁচে যেত। আসলে আমাদের একটা গ্রুপ ছিলো , একসঙ্গে যাতাযাত করতাম । আমার কাছ থেকে গামা কুপন নিয়ে নিত , থাকতো মহানির্বান রোড এ । ১০ পয়সার কুপনে ৮বি বাসে চেপে গড়িয়াহাট অবধি যেত বাকি পথ হন্টন দিত, NCC ক্যাম্প এ যাবার জন্য , কি করে হাওড়া স্টেশন যাব জানতে চাওযায় সবার কাছে প্রচুর প্যাক খেয়েছিল। ।

Unit Operation Laboratory হত দ্বিতীয় হাফে , ভোলাবাবু , এন সি মুখার্জী একটা গ্রুপ (A 1) ক্লাস নিতেন, তাপস বাবু , পিনাকী বাবু অপর গ্রুপ (A 2) নিতেন , সেই সময় Pharmacy এবং Food Tech এর ছাত্ররা আমাদের সঙ্গে Unit Lab এ একসঙ্গে কাজ করত । খুব মজা হত
মাঝে মাঝে, দুজন পার্টনারের একজন হাজিরা দিয়ে ভ্যানিশ হয়ে যেত , নবীনা অথবা পদ্মশ্রী সিনেমা হলে , ম্যাটিনি শো তে।
Lab এ কাজ করত অপরজন পার্টনার, Lab report বানানোর সময় মাদার যোগার হত , আগের বছরের সিনিয়ার ছেলেদের। কাছ থেকে । জাপান , যার আসল নাম তপন কর ছিলো, মাদার থেকে

কপি করে রিপোর্ট বানানোর ওস্তাদ কারিগর , লাল, নীল, হলুদ , সবুজ পেন দিয়ে রিপোর্ট কে পূরো নতুন ভাবে পাল্টে দিত নিঁখুত হাতে, তার সঙ্গে সুন্দর হাতের লেখা। আর আমাদের রিপোর্ট ?
আরশোলা কে কালিতে ডুবিয়ে , পেপার এর উপর ছেড়ে দিলে যা হয় , সব থেকে বেশী নম্বর জাপান পেত। জাপান কর এর রূপচর্চার গল্প পরে একদিন শোনাবো।
শতাব্দী রায় নিতেন ফার্নেস ল্যাবেরেটরি ।

অন্য কলেজে যেটা বলা হত ক্লাস বাঙ্ক , যাদবপুরে সেটাই ছিলো মাস্ কাট, মানে পুরো ক্লাস হাওয়া তখন সবে আমরা কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ ক্লাস করার অনুমতি পেয়েছি , তৃতীয় বর্ষে , বিল্ডিং এ ঢোকার মুখে আড্ডা দিচ্ছি , বিকাশ, তপন , মানস , আশীস , দেবু , উজ্বল .....মানে যারা একটা চারমিনার ভাগ করে টান মারতো - এমন সময় দেখে মনে হল আমাদের থেকে সিনিযর, হ্যান্ডসাম দেখতে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন , হঠাৎ তপন সরকার বলে বসল দেশলাই আছে ? উনি ওদেশলাই বার করে দিলেন , তপন সিগারেট ধরিয়ে বললো Thanks ..... উনি চলে গেলেন । তখনকার মতো গল্প শেষ।

সময় হয়ে গিয়েছে ক্লাসের করার ক্লাসে এসে বসেছি , টীচার পড়াতে ঢুকলেন , দেখি সেই ভদ্রলোক , আমাদের অবস্থা সসেমিরা , তখন কোথায় পালাই ?
উনি স্মার্টলি ক্লাস নিয়ে চলে গেলেন , IIT Kgp থেকে সবে এম টেক করে লেকচারার হয়ে জয়েন করেছেন কেমিক্যাল এ সুভাষ বাসু মহাশয় পরে আমাদের সঙ্গে ওনার দারুন বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো,স্যার থেকে সুভাষ দা হয়ে উঠেছিলেন আমাদের সবার বড় দাদার মত, এবার আরও একটা মজার ঘটনা জানাচ্ছি -
বহু দিন পরের ঘটনা , প্রায় ২৫/৩০ বছর পর , প্রফেসর সুভাষ বাসু নামী অধ্যাপক কেমিক্যালে ইন্জিনিয়ারিং এ আমাদের সেই রোগাপটকা বিকাশ , ১০০ কেজি ওজনের ভারিক্কি চেহারার, ভারত সরকারের নামকরা Scientist . দুর্গাপুর, এন আই টি তে আগমন Campus Recruitment এর জন্য । দুর্গাপুর রেল স্টেশন এ প্রফেসর বাসু বিকাশ কে রিসিভ করলেন , তখনও কেউ কাউকে চেনেন না , স্টেশন এর বাইরে রাখা গাড়ীতে উঠলেন দুজনে, NIT যাবার পথে , একটু এগিয়ে বিকাশ গাড়ী দাঁড় করাতে বল্ল সিগারেট কেনার জন্য , প্রফেসর বাসু বললেন , আপনি নামবেন কেন ? আমি এনে দিচ্ছি , কি ব্রান্ড আপনার ?
দুজনে সিগারেট ধরিয়ে গাড়ীতে উঠলেন , রাস্তায় যেতে যেতে এবার আলাপ পরিচয় শুরু। দু জন দু জনের পরিচয় জানার পর বিকাশের লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবার উপক্রম। পরে অবশ্য দুজনেই উপভোগ করেছিলেন ঘটনাটা ।

Dr Bikash Chakraborty , ভারত সরকারের উচ্চতম পদে অবস্থিত Scientists এবং Prof Subhas Bose - ছাত্র ও শিক্ষকের এই মেলবন্ধনএ, সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

একজন '৭৩ ব্যাচের ফার্মেসি জে.ইউ ভাইএর কলম থেকে
বীরেশ বিশ্বাস

কিছু মুখ , কিছু নাম এখনও মনের মনিকোঠায় ... আমি মাঝে মাঝে রম্য লিখি , তবে লেখক নই ।
যদি কেউ ভালবেসে পড়ে! আমি '73 Pharmacy batch.
আমি Main Hostel এর -- ওটাই আমার বড় পরিচয়। আমার এ কাহিনীর নাম থাক না

বিশুদাদার চাগরি গেছে

ধর্মতলা থেকে ভোলবো বাসে দুর্গাপুর যাচ্ছি ।
শক্তিগড় প্রথম ও শেষ ষ্টপেজ , একবারে right timing . বুড়ো বয়সের over acting bladder ফুলে ঢোল । মিষ্টির দোকানে বড় বড় অ্যালুমিনিয়াম এর গামলায় ভাসমান বেশ তাগড়াই মোটা সোটা ল্যাংচা। সেই ল্যাংচা সম্বৃদ্ধ গামলা গুলোর ফাঁক ফোকর দিয়ে , দোকানের পেছনে ইটালিয়ান বাথরুম। ওপেন থিয়েটারে সাঁড়ি সাঁড়ি সবাই ,খোলা ড্রেইনে ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন - গ্যামাক্সিন বা ন্যাফথালিনের গন্ধে ম ম চারিদিক।

ফোঁটানো গরম জলে ধোওয়া মাটির ভাঁড়ের চা য়ে চুমুক দিয়ে , আবার বাসে নিজের নির্দিষ্ট সীটে উঠতে যাব,
বাসের দরজার মুখেই বিশুদা , তার ঝাল মুড়ির পশার নিয়ে বসেছেন একটি বেতের কঞ্চির ফোল্ডিং টেবিলের উপর। আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন , আমি অবাক, "সে কি বিশুদা, তুমি- এখানে .....!!" আমার বাকরোধ " কি করব বল ! বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে তো বাঁচতে হবে ", যেটা বিশু দা বললেন , শুনে আমি থ, "আজকাল আর আমাকে কেউ পাত্তা দেয় না, আগে তো সেকেন্ড ক্লাশ ছিলাম, আর এখন তো আরও নীচে "
"মানে ?"
"মানে বুঝলি না ? তুই তো ক যুগ আগেই তোর নিজের দেশ ছেড়েছিস , ডলারের লোভে। আগে কোনদিনও সন্তোশী মা ঠাকুরের নাম শুনেছিস, শুনেছিস বিপত্তারিনী র ? বিশ্বকর্মা এখন ওদের থেকেও নীচে। এখন আর আমার পুজো আর কে করে! এখন লোকে পুজো করে তোর দেশের বিল গেইটস জ্যেঠুর , না হলে গোগুল চাচার । আমি তো এখন ফ্যাঁলনা, রে!", বিশুদার গলায় হতাশার সুর ।
আমি জিজ্ঞেশ করলাম, "বিশুদা তা তোমার যাদবপুর কি হ'ল , তোমার মেকানিকালের ওয়ার্কশপ, ডাকসাইটে ফোরম্যান? প্রথমে 'তুমি', তারপর 'তুই', কত আত্মিক সম্পর্ক ছিল তোমার সমস্ত ছাত্রদের সাথে!"
"দুর দুর ওসব লাটে উঠেছে । মেকানিকাল, সিভিল এমন কি শালা কেমিক্যাল পর্য্যন্ত, সব ব্যাটা এখন IT, তার জন্য যাদবপুর বা আই আই টি তেও যাবার দরকার নেই । ব্যাঙের ছাতার মত চারিদিকে এখন কালেজ - হরিদাস পুর , বাবা কামদেব পুর , নন্দী গ্রাম , ভৃঙ্গী গ্রাম ।"
"তা তুমি যাদবপুর ছাড়লে কেন ? "
"আমি কি আর সাধে ছেড়েছি ? তোদের হারীণ দা গত হবার পর , কলেজের ওয়ার্কশপে ফোরম্যানের কাজটা পেয়েছিলুম : আর তার সাথে লেডিস হোষ্টেলের মেয়েদের সাঁতার শেখানো --- লেকের জলে । কপালে সুখ সইল নারে ! হোষ্টেলের একটি মেয়ে , সে বজ্জাত মেয়েটি আবার কলেজের # me too মুভমেন্টের পান্ডি , আমার নামে নালিশ করল যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কেষ্টু বিষ্টু দের কাছে । আমার নাকি হাব ভাব ভাল নয়, যেখানে সেখানে সাঁতার শেখানোর বাহানা তে হাত দেই । কতৃপক্ষ আমার

বক্তব্য শোনার প্রয়োজন বোধ করলেন না, চাকরি টি গেলো , সমস্ত পশ্চিম বঙ্গ ঐ রসের গল্পে হৈ চৈ ! এর পর তোদের বিশুদাকে আর কেউ চাকরি দেয় ???"
দুই ঠোঙ্গা তোর বিশুদার ঝালমুরি নে রে ভাই ** ""

চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার গর্বের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আর ওয়ার্কশপে গিয়ে বিশুদার মত বিশেষজ্ঞ আর অভিজ্ঞের হাত ধরে লেদ-ড্রিল্লিং-মিলিং মেশিনের অন্তর্কাহিনী।

হাসা-বাঁশ
বীরেশ বিশ্বাস

বাঁশ নিয়ে বাঙ্গালীর obsession. বাঁশ খাওয়া , বাঁশ দেওয়া বা বাঁশ নেওয়া । বাঁশদ্রোনী জায়গাটির নাম করণের কারণ টি জানিনা। আবার দেখ বাঁশের ছোট সংস্করণ নিয়ে অর্থাৎ বাঁশী বাজিয়ে কৃষ্ণ প্রেম করতেন তার মামীমা রসাথে । "বাঁশী শুনে আর কাজ নাই " শচীন কত্তার গলায় ।
আবার সেই বড় বাঁশের ঝাড়ে ভুত পেত্নীরা নৃত্যও করেন (গুগাবাবা) এবং আবার বরও দ্যান !

পাটিগণিতে তেলতেলে বাঁশের অঙ্ক কষতে গিয়ে , ঘাম ছুটে যাবার জোগাড়। বানর তিন ফুট ওঠে তো এক ফুট পিছলে পড়ে । আছোলা বাঁশে শূলে চড়ানোর কথাও সবার জানা ।
আবার চৈনিক খাবারে বাঁশের কুঁড়িও ভক্ষন করছেন আপনি (Bamboo shoots).

সবকিছুরই exception আছে । একমাত্র ছোটবেলায় বাবা কাকার ক্লাবের সামনে পঙ্কজ ডেকরটরের বাঁশের আগমন দেখলেই মনটা নেঁচে উঠত। আকাশে বাতাসে দূর্গা পূজার গন্ধ ...
মোদ্দা কথা, বাঁশ শব্দটা মনে হলেই বাঁশ , মানে ভয় ভয় ভাব।
CoVid 19 পৃথিবীকে বাঁশ দিয়েছে, যদিও মুখোশের অন্তরালে ঐ বাঁশের ব্যাথা আপনি দেখতে পাবেন না । আমাকেও এই ব্যাথায় ভুগতে হয়েছিল বহু যুগ আগে ...

যাদবপুরে ডিগ্রীটি পাবার আগে, আমাদের মৌখিক পরীক্ষা তে (নাম Viva Voce) পাশ করতে হত - শুধু থিওরিতে পাশ দিলেই চলবে না। সে ছিল এক বিভীষিকা , পরীক্ষকরা শুধু অন্য department থেকেই নয় , অন্য প্রদেশের কলেজ থেকেও আসতেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন হাস্যময়, অর্থাৎ
"হাসা-বাঁশ"।
তা হাসা-বাঁশ স্যার কিন্তু যেন এক বিনয়ের অবতার , স্নেহ একেবারে উপচে উপচে পরছে। হেসে হেসে বাবা বাছা করে কথা বলতেন " তা বাবা তুমিই বল , তোমাকে কোন চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব?" যথারীতি ধ্যাড়ালাম।
"বাবা পারলে না তো বলতে ! তোমার নার্ভাস হবার কোন কারণ নেই , অনেকেই পারেনা প্রথম প্রশ্নের । তা বাবা আর একটা চ্যাপ্টারের নাম বল ?"
কাঁপতে কাঁপতে নিলাম একটা চ্যাপ্টারের নাম এবং সেটাও গেল।
"এটাও তো পারলে না দেখছি, বাপ আমার ! , আমি তো তোমায় তিনবারের বেশী জিজ্ঞেদ করতে পারিনা! এবার একটু চিন্তে বল।"
তক্ষনে প্যান্তুলান হলুদ হবার জোগার , শোলের গব্বর সিং এর কালিয়ার কথা মনে হল। মা কালীর নামে দিলাম ঠুকে থার্ড এবং শেষ চান্সের চ্যাপ্টারের নাম, জানি three strikes , out ।

" তা রতন আমার, পড়াশোনার ধারেকাছেও তোমার তো দেখছি কোন আনাগোনাই নেই । বাপ মা কে বাড়ীতে ফিরে কি বলবে ? "
মনে মনে আছোঁলা বাঁশের যন্ত্রনা অনুভব করে চলেছি .....! "তা বাবা পরের বছর ভাল করে প্রিপারেশন নিয়ে, তৈরী হয়ে এসো - আমি তো আছিই "।
অথ বাঁশ-বর্ণন।

Conversation Street

Swami Someswarananda Moharaj

&

Dr. Triguna Sen

Swami Someshwaranandaji
A very revered senior monk from the Ramkrishna Order, he is a Teacher , having delivered lots of workshops in Premier Management Institutes, corporate houses etc on Management through Practical Vedanta as elucidated in the Life of Swami Vivekananda, a prolific writer, and above all a very original thinker with the perfect blend of heart and mind. Swamiji loves working with young people in creating a transformational India, a self-reliant robust populace based on the eternal principles of Hindu culture and thought

- Diptarko Das Sharma

Dr. Triguna Sen
Early life - a freedom fighter, craving for the freedom of his country from Foreign Rule.

Middle life - a feedom fighter again, in the veil of a great Teacher, a true teacher of the highest order, craving freedom again, but with changed priority this time. Fought for emancipation of the young souls of India with real EDUCATION of the young minds, both technically and socially.

Retired life - totally retired soul from wordly life, devoted at the altar of spirituality, a dedicated desciple of Anondomoyee Maa in Kankhal Ashram.

- Dipak Sengupta

Swami Someswaranada Moharaj ***(SS)***
Triguna Sen, ***(TS)***

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ মহারাজের বয়ানে --

মুম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন। ওয়ার্লি শাখার পেছনে এক বস্তি। স্থানীয় ভাষায় ঝোপড়পট্টি। সেখানের বাসিন্দাদের সাথে মিটিঙে ছিলাম। এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে আরো দুজন। আমার নাম জিজ্ঞেস করে প্রণাম করার জন্য পা ছুঁতে গেলে তার হাত ধরে ফেললাম। বললাম, আপনি বয়স্ক মানুষ, পায়ে হাত দেবেননা।
পরিচয় জানতে চাইলে বললেন, আমার নাম ত্রিগুণা সেন। অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, যাদবপুর ...। হেসে উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, এক সময় ছিলাম সেখানে। তার হাত ধরে বলি, আশ্রমে চলুন, কথা হবে।
ঝোপড়পট্টির লোকদের মিটিং চালিয়ে যেতে বলে ত্রিগুণাবাবুকে নিয়ে গেলাম আশ্রমে। অনেক আলোচনা হয়েছিল তার সাথে সেদিন। তার কিছু অংশ।

(SS) - আমার খবর পেলেন কিভাবে?

(TS) - আপনার বই পড়েছি, মহারাজ। কাগজেও পড়ি প্রায়ই। মুম্বাই এসেছি একটা কাজে। খার আশ্রমে গিয়ে খবর পেলাম আপনি ওয়ার্লিতে। এসে শুনলাম, বস্তিতে গেছেন। তাই সেখানে গিয়ে আপনার খোঁজ।

(SS) - শুনেছি আপনি এখন আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে থাকেন। সাধন ভজন নিয়ে আছেন। সমাজ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে।

(TS) - ঠিক। শেষ জীবনটা এভাবেই আছি। বানপ্রস্থ বলতে পারেন।

(SS) - কিন্তু ত্রিগুণাবাবু, সমাজে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এখনো আপনার প্রয়োজন রয়েছে। আপনি কেন নিজেকে এভাবে সরিয়ে নিলেন?

(TS) - আপনিও তো নিজেকে ঐ রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়েছেন! ওখানের যুবসমাজ চায় আপনাকে।

(SS) - আমি তো প্রতি বছরই যাই। কলকাতা, দূর্গাপুর, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, বহরমপুর ...। অনেক যুব গ্রুপ কাজ করছে সেখানে।

(TS) - জানি। স্বামীজির প্রয়োজন আজ আরো বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি করুন। কিন্তু আমি এখন জীবনের শেষপ্রান্তে। ধ্যানের আনন্দে ডুবে থাকতে চাই। যৌবনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মায়ের দেখা পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এখন দেশের কাজে নিজেকে দাও। পরে তোমায় ডেকে নেওয়া হবে।

(SS) - আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি। স্বাধীনতা যুদ্ধে শিক্ষকেরা বড় অবদান রেখেছিলেন। আশুতোষ মুখার্জি, শ্যামাপ্রসাদ, অশ্বিনী দত্ত, সূর্য সেন, আপনি ...। কিন্তু পরে আর তা দেখা গেলনা কেন?

(TS) - স্বাধীনতার পর দেশের পরিস্থিতি বদলে গেল। আগে এক প্রত্যক্ষ শত্রু ছিল চোখের সামনে, বৃটিশ। কিন্তু পরে নতুন বাধা চলে এলো। দারিদ্র্য, মূল্যবোধের পরিবর্তন, রাজনীতি, অনিশ্চয়তা। আমরা শিক্ষকেরা বুঝতে পারলামনা কি করতে হবে। সরকারই সব করে দেবে, এই চিন্তা ছড়িয়ে গেল। সমাজ নেতৃত্ব থেকে শিক্ষকেরা সরে গেলেন।

(SS) - কিন্তু কিছু মানুষ পথ দেখিয়েছিলেন তখন।

(TS) - হ্যাঁ, লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সাথে আলাপ ছিল আমার। বিভিন্ন গ্রামে যুবকদের সমিতি গঠন করে তাদের দিয়ে গ্রাম উন্নয়ন করা। কয়েকটি গ্রামে তিনি আমায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলেন ঐ কাজগুলি। চেয়েছিলেন যাতে আমি ঐ কাজে তার সহযোগী হই। কিন্তু আমার মনে তখন একান্ত সাধনার ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, আপনাকে প্রশ্ন করি মহারাজ। আপনি বাঙালিদের জন্য আরো বেশি সময় দিচ্ছেননা কেন? ঐ রাজ্যের অব্স্থা তো দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

(SS) - আমি কোথায় কাজ করবো সেটা বেলুড়মঠ ঠিক করে দেয়। ছাত্রজীবনে ইচ্ছা হয়েছিল বাঙালিদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা। কিভাবে করতে হবে এ জানার জন্যে চিঠি দিলাম সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহাত্মাজীকে। উত্তর এলো, আগে নিজেকে তৈরি করো, পরে অন্যের কথা ভাববে। কিন্তু পরে দেখি যে নবজাগরণের বাঙালি পথিকৃতেরা জোর দিয়েছেন ভারতবোধের উপর। আরো পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করে এখন ভারতবোধটাই প্রধান আমার কাছে।

(TS) - এটা চিন্তার বিষয়, পাঞ্জাবী গুজরাটী তামিল যেভাবে এগিয়ে গেল, বাঙালিরা তা পারলোনা কেন? অত্যধিক উন্নাসিকতাই কি বাঙালির ত্রুটি?

(SS) - কর্মদক্ষতার অভাব ও প্রতিক্ষেত্রে রাজনীতি।

(TS) - স্বামীজির কর্মযোগই বাঙালির উন্নতির পথ। তাছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মানুষদের কাছে শেখা দরকার।

(SS) - এখন বলুন আপনার সাধনা নিয়ে।

(TS) - ভক্তি ও ধ্যান, এই দুটিই প্রধান আমার সাধনায়। আনন্দময়ী মা ভক্তির উপদেশ দিলেও তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তাই শঙ্করাচার্যের সাথে শ্রীচৈতন্যকে মেলাতে আমার অসুবিধা হয়না। আর এজন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসকে খুব কাছের লোক বলে মনে হয় যখন সাধনা করি। একা একা বসে জ্ঞানবিচার যেমন করি তেমনি ভজনও গাই। খুব আনন্দে আছি শেষ জীবনটা। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা আমার উপর।

END